ধর্ম্ম ও পূজাদিমীমাংসা।

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

কলিকাতা।

৮০ | ১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট
আর্য্যমিশন্ ইনষ্টিটিউশন্ হইতে
প্রকাশিত।

মেট্‌কাফ্ প্রেস্ : কলিকাতা।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ১৲ ৵৹ টাকা।

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবনমুচ্যতে।

ধর্ম্ম ও পূজাদিমীমাংসা।

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপ্রসাদাৎ

আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

মেট্‌কাফ প্রেস্

৫৬ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তি স্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥

যাবদ্বদ্ধো মরুদ্দেহে যাবচ্চিত্তং নিরাকুলম্।

যাবদ্দৃষ্টির্ভ্রুবোর্মধ্যে তাবৎ কালভয়ং কুতঃ।
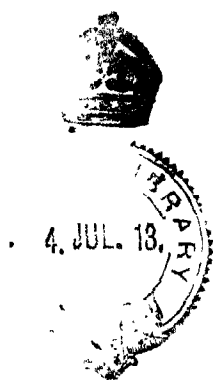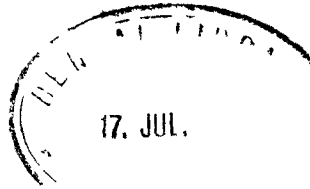
বিজ্ঞাপন।

গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥

স্বপ্নো জাগ্রদবস্থায়াং সুপ্তবদ্যোঽবতিষ্ঠতে।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসহীনশ্চ নিশ্চিতং মুক্ত এব সঃ॥
ইতি হঠপ্রদীপিকা।

দেশে ধর্ম্মবিভ্রাট্ ও তন্নিবন্ধন লোকের এত অভাব ও অশান্তি দৃষ্ট হওয়ায় ধর্ম্ম ও পূজাদিমীমাংসা নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিসে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ হয় তাহাই দেখান ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে যে সকল অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ লিখিত আছে, সেগুলি বুঝিয়া ঠিকভাবে করিতে হইলে যোগপথ অবলম্বন করা উচিত। যোগব্যতীত ঐ সকলের অনুষ্ঠান হইতেই পারে না। কেননা পূজাপদ্ধতি মন্ত্রসকলের মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম্ ইত্যাদি যে সকল ক্রিয়া

তৎসমুদায় যোগিব্যতীত অন্যের দ্বারা কখনই হইবার নহে। কাহারও সহিত ঝগ্‌ড়া বা বাগ্‌বিতণ্ডা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেননা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা কোনটীই ত্যাগ করিতে বলি না। আমাদের একমাত্র কথা এই যে, যিনি যাহা করিতেছেন তিনি যাহাতে তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে ঠিকভাবে করিতে পারেন, সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং আমরা আদ্যোপান্ত কেবল এইমাত্র দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, যে কার্য্যই হউক না কেন, তাহা যদি ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহার ফলও প্রকৃতরূপ হয় না। প্রকৃত ফল পাইতে হইলে কর্ম্ম-যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্রে মন স্থির করা কর্ত্তব্য। মনের সংযোগব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কার্য্যই ঠিক হয় না। সেই মন যদি নানা বিষয়ে রত থাকে, তাহা হইলে ভগবদারাধনা করে কে? কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মন ক্রমশঃ যতই স্থির হইয়া আইসে, ততই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে এবং জ্ঞানোদয়ে নিজে নিজেই ভালমন্দ ঠিক বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মে। তখন আর কাহারও কথায় বা পরামর্শে কোন কর্ম্ম ভাল বা মন্দ বলিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হয় না। সেই প্রকৃত জ্ঞান কি এবং অজ্ঞানই বা কাহাকে বলে, তাহা ভগবান্ গীতাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন, যথা—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

অর্থাৎ আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পরপীড়াত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তর্বহিঃশুচিতা, মনের স্থিরতা, এবং শরীরসংযম; বিষয়সকলে বৈরাগ্য, অহঙ্কাররাহিত্য এবং জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি; পুত্রদারাগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব; আমাতে অনন্যযোগ (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি) দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি এবং মনুষ্যসমাজে বিরাগ; আর আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন—এই অমানিত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; আর যাহা ইহা হইতে অন্যপ্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান।

উপরেও শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং হঠপ্রদীপিকা হইতে যে শ্লোকগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, শ্বাসকে জয় করা ব্যতীত জীবের সিদ্ধি বা মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় কিছুই নাই। লোকে কথায় যেমন বলে "সব শৃগালের একই রব", ভাষা যেরূপই হউক না কেন মহাত্মাদের কথা ও [illegible]

তেমনি এক বই দুই কখনই হইতে পারে না। যেখানে একের অধিক কথা বা ভাব সেই খানেই গোল।

অতএব আমাদের একমাত্র কথাই এই যে, যিনি যেরূপ ভাবে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, তিনি তাহা না ছাড়িয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুলাভের চেষ্টা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত প্রাণায়ামাদি যোগসাধন করুন। তাহা হইলে ক্রমশঃ উন্নতিসহকারে শাস্ত্রের এবং ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বা রহস্য নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন। তখন আর ধর্ম্ম লইয়া দলাদলি বা কোন প্রকার গণ্ডগোল করিতে হইবে না। কেবল মাত্র এক বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা কখনই হয় না।

অবশেষে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, কেহ যেন ইচ্ছামত এই পুস্তকের অংশবিশেষ পাঠ করিয়াই সমস্ত বিষয় বা ভাব অবগত হইবার আশা না করেন। সমুদায় বিষয় অবগত হইতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক। তবে যাঁহারা সময়াভাব বশতঃ বা অন্য কোন কারণে ইহার আদ্যোপান্ত পড়িতে না পারেন, তাহারা যেন অন্ততঃ ৫ম পৃষ্ঠা হইতে ৮ম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং ১৪৬শ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি হইতে ২৫৫শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারিবেন। অলমতিবিস্তরেণ ইতি—

আর্য্যমিশন্ ইনষ্টিটিউশন
১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
শ্রাবণ, সন ১৩০১ সাল। } প্রকাশকস্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
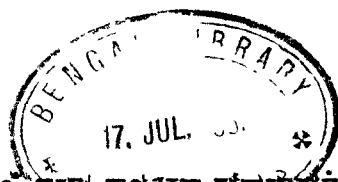
ধর্ম্ম ও পূজাদিমীমাংসা।

যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবজ্‌জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ॥
রাজযোগস্য মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধিগুরুবাক্যেন লভ্যতে॥
ইতি হঠপ্রদীপিকা।

ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্মের আবশ্যকতা আছে কি না, ইহা এক কালে আর্য্যেরাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কালবশে আজ তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে আজ আর্য্যভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের আজ আর সে গৌরব নাই—সে রূপ, সে শ্রী নাই; আছে কেবল চিতাধূম মাত্র। আর আছে আর্য্যধর্ম্ম-বিলোপকারী, আর্য্যসন্তানের মাংসলোলুপ, গৃধ্রশকুনিতুল্য আমার ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ঘোর বিকট চীৎকার। আকাশ ও চতুর্দ্দিক ঘনঘটাচ্ছন্ন; আমার রসশূন্য গগনভেদী বিকট চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু হায়! তাহাতে বৃষ্টিও নাই, সুবাতাসও নাই!! সুতরাং ফাঁকা গর্জ্জনে

শরীর ও মনের তৃপ্তি বা শান্তি হইতেছে না। শান্তি হইবেই বা কিরূপে? যখন চতুর্দ্দিকই অভাবরূপ মেঘে আবৃত, তখন আমার শান্তিবারির আশা করা বিড়ম্বনা নয় কি? যখন আমি অজ্ঞানরূপ মেঘে আচ্ছন্ন, তখন আমাতে ধর্ম্মের প্রকাশ সম্ভবে না। মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় আকাশে সূর্য্যের প্রকাশ যেমন অসম্ভব, অজ্ঞানসত্ত্বে ধর্ম্মের প্রকাশও তদ্রূপ অসম্ভব। তবে ধর্ম্ম কি? আমার ন্যায় অজ্ঞানী জীবের এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত নহে, বরং উহা করাই উচিত।

আজকাল নানারূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখে নানাপ্রকার ধর্ম্ম কথা শুনিয়া "কোন্‌টি ধর্ম্ম, কোন্‌টি অধর্ম্ম" তাহা ঠিক করা আমার ন্যায় জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন; কেননা পরস্পর পরস্পরের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের দলের পুষ্টিসাধন করিবার জন্য প্রায় সকলকেই ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হায় কি পরিতাপের বিষয়!! আমি ধর্ম্মপ্রচার করিতেছি, অথচ "ধর্ম্ম কি" তাহা জানি না!!! নিজে যে কিছুই বুঝি না তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেও পারি না, কেননা তাহা হইলে আমার দল থাকে না। সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি তাহা মিথ্যা এবং শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও নিজের কোঁট বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কূটতর্কের দ্বারা আপন মত সমর্থন করিয়া থাকি। কিন্তু একবার ইহা ভাবিনা যে ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ হইতে পারে না; যেখানে পৃথগ্‌ভাব সেই খানেই অধর্ম্ম। অধর্ম্মের বিপরীতই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ—ধৃ (পোষণ করা) + ম (প্রত্যয়)। যিনি সকল জীবকে পোষণ করেন তিনিই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক, কে সকল জীবকে পোষণ করে। যদি বলা যায় অন্নই

জীবসকলকে পোষণ করিতেছে, অতএব অন্নই আমাদের এক মাত্র ধর্ম্ম। ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একরূপ অন্নের দ্বারাত সকল জীবের পুষ্টিসাধন হয় না, যাহার যে বস্তুদ্বারা দেহের পোষণ হয় তাহার পক্ষে তাহাই অন্ন। যেমন গবাদি পশু হইতে মনুষ্যপর্য্যন্ত জীবের পক্ষে ক্ষেত্রজাত গোধূমাদি অন্ন হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য বালকের অন্ন দুগ্ধ, কারণ বালক দুগ্ধব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। মৎস্যাদির পক্ষে অন্যরূপ এবং কীট-পতঙ্গাদির পক্ষেও অন্যরূপ। আবার বায়ু জল মৃত্তিকা ভক্ষণেও অনেক জীবের দেহ পোষণ হইতে দেখা যায়। এরূপস্থলে যদি অন্নই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত পৃথক্ পৃথক্ হইল। উপরে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ হইতে পারে না। পৃথক্ হইলেই অধর্ম্ম হইবে। অতএব অন্নের পৃথক্ত্ব হেতু উহা অধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আর একটী এমন মহৎ বিষয় আছে যাহা বৃক্ষাদি হইতে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, শিবাদিদেবগণ ও প্রাণিমাত্রেই অবস্থিতি করিয়া সকল ভূতকেই পোষণ করিতেছে। তাহাই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ—তিনি সকল ঘটেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি জীবমাত্রেরই অভীষ্ট দেবতা। মণিমুক্তার মালার মধ্যে যেমন সূত্র থাকে, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ সূত্ররূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিয়া সমস্ত জীবকে পোষণ করিতেছেন। তিনিই সমস্ত জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মায়ং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সদা।
যে বিবিক্তা বিনিশ্বাসাঃ শান্তা ধ্যানপরায়ণাঃ॥

ইতি কাশীখণ্ড।

যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণা যে প্রাণাস্তে তদাত্মকাঃ।
প্রাণাঃ প্রাণবতাং জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতেষবস্থিতাঃ ॥
ইতি লিঙ্গপুরাণ।

সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ যবনদেহে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, ম্লেচ্ছ হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ান দেহেও তদ্রূপ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি দেহও নহেন, যবনও নহেন, ম্লেচ্ছ হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ানও নহেন; অথচ যখন যাহাতে থাকেন, তখন তিনি তাহাই, কিন্তু তাহা তিনি নহেন। তিনি বাদাতীত দ্বন্দ্বাতীত এবং সকল দলে থাকিয়াও সকল দলের অতীত। এই ধর্ম্মরূপী নারায়ণের নিকট কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, অথচ তিনি সকল সম্প্রদায়েই আছেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায় তাঁহাতে নাই—যেমন তিনি আমাতে আছেন, কিন্তু আমার মন তাঁহাতে নাই অর্থাৎ যেমন সকল দেহেই প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণের অস্তিত্বেই জীবের অস্তিত্ব, কিন্তু সেই প্রাণের প্রতি জীবের লক্ষ্য নাই; সুতরাং প্রাণে লক্ষ্য না থাকায় জীবের প্রাণে থাকা হইল না; সেইরূপ তিনি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সকল সম্প্রদায় তাঁহাতে ভুক্ত নহে। এই অভুক্ত সম্প্রদায় সকল ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিছুতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতেছে না। ক্ষুধা নিবারণ না হইলেও পোষণ কার্য্য সমাধা হয় না। সুতরাং ধর্ম্মরূপ অন্নাভাবে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিছুতেই মনের শান্তি নাই এবং শান্তির অভাবে দেহও ক্ষীণ হইতেছে। কারণ, মনের অসুখে দেহের অসুখ এবং দেহের অসুখে মনের অসুখ; সুতরাং কিছুতেই সুখ নাই। সেই সূত্ররূপী প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে আজ ধর্ম্মভূমি

আর্য্যাবর্ত্তের চারিদিকেই হাহাকার। তাই সেই আর্য্যবংশধরগণ আজ আমার ন্যায় অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়া একমুষ্টি উদরান্নের জন্য সামান্য কিঙ্কর অপেক্ষাও হেয় হইয়াছেন। হায় ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার সম্ভ্রমে, ধিক্ আমার গৌরবে, ধিক্ আমার ধর্ম্মপ্রচারে বা শাস্ত্র-আলোচনায় এবং ধিক্ আমার লেখনীধারণে। আমি যে লেখনী ধারণ করিয়া মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, বা দৈনিক পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে ধর্ম্মপ্রবন্ধ লিখিয়া থাকি, আমার সেই সাহসে বা উদ্যমে ধিক্ এবং ধিক্ আমার যশঃপ্রত্যাশায়। আমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, অন্তরে ধর্ম্মভাব নাই, আছে কেবল যশঃপ্রত্যাশা এবং অর্থলালসা। তাই ধর্ম্মের ভাণে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ছড়াছড়ি করিয়া থাকি। আমি লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিতেছি যে, স্ত্রীপুত্রধনরত্নাদি সংসারের যাবতীয় পদার্থ অনিত্য; এ সকল ত্যাগ করিয়া আচারবান্ হইয়া সত্যপ্রতিপালন ও ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর। কিন্তু আমি মুখে যাহা বলিতেছি, আমার কার্য্যে তাহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা কিছু বলি, তাহা নিজের স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালন ও সুখ ঐশ্বর্য্যের জন্য মাত্র। নচেৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কাণ্ডজ্ঞানই আমার নাই। যদি কেহ না দেখে বা না জানে, তাহা হইলে গোপনে সকল কার্য্যই করিয়া থাকি; অথচ লোকের কাছে সাধু, পরমহংস, পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতের রূপ ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। নাট্যাগারে নাট্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন অভিনয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছি এবং সকলকে বলিতেছি যে, তোমরা ধর্ম্মের জন্য সভাসমিতি করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ কর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্ম কি তাহা

আমার বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। আমি যাহা বলিতেছি তাহা কে না জানে? ধর্ম্মের দ্বারা যে জীবের মঙ্গল হইবে, ইহা ত অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু কিসে তাহা লাভ হইবে ইহা কে বলিয়া দেয়? এদিকে আমি স্বার্থের জন্য এবং দল রাখিবার জন্য "সন্ধ্যা কর" "পূজা কর" "জপ কর" ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ দিতেছি, অথচ এটী ভাবি না যে, এ সকল করায় কে? এই কথায় একটী গল্প মনে পড়িল।

এক দিবস হঠাৎ ইন্দুরের সমাজে মহা কোলাহল হইতেছে দেখিয়া, একটী প্রাচীন ইন্দুর আসিয়া সকল ইন্দুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমরা এত কোলাহল করিতেছ কেন?" তখন সকলে সেই প্রাচীন ইন্দুরের নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয়! বিড়ালের উপদ্রবে বোধ হয় আমরা কেহই আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না; যেহেতু বিড়ালগণ নিত্যই আমাদের বংশনাশ করিতেছে। অতএব ইহার একটা উপায় না হইলে এ যাত্রা আমাদের আর রক্ষা নাই।" তখন প্রাচীন ইন্দুর কহিল, অদ্য আর কোন কথায় কাজ নাই, কল্য সকলে মিলিয়া এক সভা করিয়া এই বিষয় আলোচনা করা যাইবে এবং শ্রেয়োলাভের উপায়ও স্থিরীকৃত হইবে। অতএব আজ সকলকে সংবাদ দাও যেন ঐ সভায় কল্য সকলে উপস্থিত হয়"। বৃদ্ধ ইন্দুরের পরামর্শমত পরদিন সকলেই সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া তাহাকেই সভাপতি করিল। নানা কথা আলোচনার পর প্রাচীন ইন্দুর কহিল যে, "তোমরা যে সকল কথা বলিলে তাহাতে বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে আমার বিবেচনায় এক সদুপায় আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা যদি বিড়ালের

গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই ঘণ্টার শব্দে বিড়ালের আগমন বুঝিতে পারিব, তখন আর আমাদের প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকিবে না"। এই কথা বলিবামাত্র সকলেই করতালির সহিত প্রাচীন ইন্দুরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অবশেষে যখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার সময় আসিল, তখন আর কেহই সাহস করিয়া ঘণ্টা বাঁধিতে অগ্রসর হয় না। সকলেই পরস্পর পরস্পরকে ঘণ্টা বাঁধিতে বলে, কিন্তু কে ঘণ্টা বাঁধিবে তাহার আর লোক পাওয়া যায় না। ঘণ্টা বাঁধিলে মঙ্গল হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘণ্টা বাঁধে কে ?

আমার ধর্ম্মপ্রচারও তদ্রূপ। মুখে যে সকল উপদেশ দিতেছি, ঐ সকল কার্য্য করায় কে ? কেবল মুখে বলিলে ত চলিবে না। আমি যাহা লোককে করিতে উপদেশ দিতেছি, অগ্রে কি দেখা উচিত নহে যে, ঐ সকল কার্য্য আমি নিজে জানি কি না এবং উহা দ্বারা আমি নিজে কি শান্তি পাইয়াছি? যদি কেহ আমার এই কথায় বলেন, "বাপু হে! তুমি যে বিষয় আমায় বলিতেছ, ভাল আমি না হয় তাহা করিতে অশক্ত, কিন্তু তুমি ঐ সকল কার্য্য করিয়া কি শান্তি পাইয়াছ ? তোমার কার্য্য দেখিয়া যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ইন্দ্রিয়ের দাস ব্যতীত তোমায় আর অন্য কি উপাধি দেওয়া যাইতে পারে ?" তাহা হইলে আমি তাহাকে কি উত্তর দিব ? পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহা কাহারও বলিবার যো নাই ; কারণ, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাস্ত্রদ্বেষী অহিন্দু ইত্যাকার শ্লেষ বাক্য বলিয়া, তীব্র বক্তৃতায় বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তাহাতে যে কাহার ক্ষতি হইতেছে তাহা একবারও দেখি না। বাস্তবিক আমি নিজেও

স্বার্থের জন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি এবং অযথা লোককে কটুকাটব্য বলিতেছি। আমি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিতেছি "পূজা কর" "জপ কর" "সন্ধ্যা কর" কিন্তু কি উপায়ে এই সকল কার্য্য করিতে হয় তাহা নিজেই জানিনা। পূজা-পদ্ধতিতে যে সকল কার্য্যের বিষয় লেখা আছে, তাহা পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিলেই কি আমার পূজা করা হইল? ইহাই যদি আমার পূজা হয়, তাহা হইলে এই পূজা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। কারণ, এইরূপ পূজার দ্বারা দেশে যাবতীয় অমঙ্গল ঘটনা হইতেছে। কেননা আমি গঙ্গাজল তামা তুলসী হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম পূজা করিব, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত তাহার কিছুই করিলাম না। শাস্ত্রে গঙ্গাকে পবিত্রসলিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সেই পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া পদে পদে সঙ্কল্প করিতেছি এবং পদে পদেই সেই সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতেছি। ইহাতে আমি ও আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ কি নরকস্থ হইতেছেন না? আমি এমনি কুলাঙ্গার জন্মিয়াছি যে, আমার কার্য্যের দোষে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ পর্য্যন্ত নরকস্থ হইতেছেন। আবার সেই নরক গুলজার করিবার জন্য সাধারণকেও আহ্বান করিতেছি। ইহা কি আমার কপটতা নয়? আমি নিজে যে বিষয় জানি না, তাহা শিক্ষা করিয়া প্রকৃতরূপে করিবার চেষ্টা না করিয়া অপরকে তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছি, ইহাই কি আমার ধর্ম্মপ্রচার? ডেঙ্গায় সাঁতার শিখিয়া জলে সাঁতার দিতে যাওয়ার ন্যায় কর্ম্মশূন্য অসার ধর্ম্ম-প্রচারে সাধারণের অনিষ্টব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ "পূজা কর" মুখে বলিলে হইবে না—পূজা করায় কে? পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে সকল বীজমন্ত্র আছে, তৎসমুদায় যোগপথ

অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুতেই অবগত হওয়া যায় না।
যোগীরাই কেবল ঐ সকল জানেন।

সুতরাং ঐ সকল পূজাবিধির প্রকৃত মর্ম্ম এখন আমাদের প্রায় কাহারও জানা নাই। উপস্থিত কালে যে সকল প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত দেখিলেও কষ্ট বোধ হয়, কেননা আমি পূজা করিতে জানিনা বলিয়া আমার দ্বারা উহা প্রকৃত রূপে সমাধা হয় না। অথচ আমি কখনই স্বীকার করিব না, যে আমি পূজা করিতে জানিনা; কারণ, এখনকার পূজা ব্যবসায়ে পরিণত; সুতরাং তাহা না করিলে আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য বাধ্য হইয়াও আমাকে বলিতে হয় যে, আমি পূজা করিতে জানি। আমি মুখে আপনাকে দশকর্ম্মান্বিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার কোন কর্ম্মেরই জ্ঞান নাই। আমি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও আমার দ্বারা পূজা হইতে পারে না। কারণ, দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও আমি সংযমী নহি। পূজাপদ্ধতিতে যে সকল মন্ত্র ক্রিয়াদি লিখিত আছে, তৎসমুদায় যিনি যোগপথ অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি কতকটা বুঝিতে পারেন—সম্যক বুঝিতে অক্ষম। আমাদের ন্যায় লোকের তাহা বুঝা বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের সাহায্যে পূজার মন্ত্র ও বিধি সকলের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। প্রকৃত বিষয় জানিতে হইলে, যিনি প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া নিজে করিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জানিতে হয়। নচেৎ নিজের বুদ্ধিতে বা ব্যাকরণাদির সাহায্যে উহা জানিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যেহেতু, পূজাপদ্ধতির মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি যে সকল গুরুতর বায়ুক্রিয়াদি সন্নিবেশিত

আছে, উপযুক্ত কর্ম্মিব্যতীত অন্যের দ্বারা কেবল কল্পনায় ঐ সকল কার্য্য কথনই সম্পন্ন হইতে পারে না। আজ কাল আমার ন্যায় যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত পূজাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহই প্রায় যোগপথাবলম্বী নহেন। সুতরাং আমরা তন্ত্র মন্ত্র কিছুই বুঝি না, কেবলমাত্র মুখে বলিয়া থাকি "আমি ব্রাহ্মণ" "আমি পণ্ডিত"। বাস্তবিক দেখিতে গেলে কার্য্যে আমাদের কিছুই নাই—না আছে ব্রাহ্মণের গুণ, না আছে পণ্ডিতের গুণ, কেবল ঘড়া গাড়ু বিদায়ের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত। কি পরিতাপের বিষয়!! এক কালে যে ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীপতিও করযোড়ে শঙ্কিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন, আজ কি না সেই বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণপুত্রেরা সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় লোকের দ্বারে দ্বারে অতি অকিঞ্চিৎকর দুই একটা পয়সা বা দুই একটা রজতমুদ্রার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন!!! ইহা কি আমার ঘৃণার বিষয় নহে? তথাপি আমি কোন্ মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিই? কই আমার ব্রাহ্মণের গুণ কোথায়? ব্রহ্মত্ব থাকিলে ত আমি ব্রাহ্মণ হইব?

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
ইতি গীতা।

এই সকল লক্ষণ যাঁহার আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমার তাহা কই? আমার শমদমাদি গুণ কোথায়, জ্ঞানই বা কই, বিজ্ঞানই বা কোথায়? যখন জ্ঞানই আমার নাই, তখন বিজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? আস্তিক্যটাই বা কই? বরং সময়ে সময়ে নাস্তিকতার ভাবই আমাতে লক্ষিত হয়।

তবে কি কেবল মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেই আমি ব্রাহ্মণ হইব? আমি পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু পণ্ডিতের গুণই বা আমাতে কি আছে? পণ্ডিত কাহাকে বলে? শাস্ত্রে পণ্ডিতের যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যায় না। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" অর্থাৎ সমদর্শী ব্যক্তিরাই পণ্ডিত। চাণক্য বলিয়াছেন—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

কই ইহার ত কোন গুণই প্রায় এখন দেখা যায় না। পণ্ডা শব্দের অর্থ সদসদ্বিবেকিনী বুদ্ধি। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসৎ। যে বুদ্ধির দ্বারা সেই সৎ বস্তু ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, তাহাই পণ্ডা এবং এই পণ্ডা যাঁহার আছে তিনিই পণ্ডিত। কই ইহাও ত আমার নাই, তবে আমি পণ্ডিত কিসে? ব্রাহ্মণত্ব বা পাণ্ডিত্য এ দুয়ের যখন কিছুই নাই, তখন আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেওয়া বাতুলতা নয় কি? শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ লেখা আছে আধুনিক আমার ন্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতে সে সকলের কিছুই দেখা যায় না। শাস্ত্রে বলে—

যোগস্তপোদমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

কই ইহারই বা কি আছে—যোগই বা কই, তপই বা কই, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান আস্তিকতাই বা কই—এক যোগের অভাবে সকল বিষয়েরই অভাব হইয়াছে। এক কালে যে ব্রাহ্মণেরা যোগবলে জ্ঞানের চরম সীমায় গিয়া

ছিলেন, আমরা সেই বংশসম্ভূত হইয়া যোগপথ উপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বরং যোগপথাবলম্বীদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকি। নিজেও করিব না, কাহাকে করিতেও দিব না, অথচ বলিয়া থাকি যে, আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী ও শাস্ত্র মানিয়া চলি। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
ইতি গীতা।

সুতরাং যোগী যে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না। আমরা যখন ভগবদ্‌বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, তখন আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কই? কেবল মুখে বলি শাস্ত্রে বিশ্বাস করি; কেননা তাহা না বলিলে ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং মুখে বলিতে হয় যে, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি। বাস্তবিক উহা আমার অন্তরের কথা নহে। অন্তরের কথা হইলে কার্য্যেও তাহা দেখা যাইত। যখন ভগবদ্‌বাক্যে আমার বিশ্বাস নাই, তখন আমার আস্তিকতা বা ভগবদ্‌ভক্তি এই সকলই যে মিথ্যা, কেবল বাহিরের—অন্তরের নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব যিনি যোগপথ অবলম্বন করেন নাই, তিনি বেদ উপনিষদ্ তন্ত্র মন্ত্রাদি কিছুই বুঝেন না। তন্ত্রে বা বেদ উপনিষদাদিতে যে সকল বীজ মন্ত্র আছে তৎসমুদায় কেবল মুখে উচ্চারণ করিলে কোন ফল হয় না। উদ্ভিদ্‌বীজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে যেমন বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ মন্ত্র সকলের মধ্যে ক্রিয়া সকল নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির বীজ হইতে যেমন বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া ফলে ফুলে

সুশোভিত হয়, তদ্রূপ তন্ত্রের বীজমন্ত্রসকল চৈতন্য হইলে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সুশোভিত হয়। শরীররূপ যন্ত্রের মধ্যে তন্ত্র রহিয়াছে। সেই তন্ত্রের মধ্যে দুইটী মার্গ আছে—আগম ও নিগম। সেই আগম নিগমের মধ্যেই মন্ত্র রহিয়াছে। স্থির প্রাণই মন্ত্র, কেননা এই স্থির প্রাণের দ্বারাই মনের পরিত্রাণ হয়। সেই স্থির প্রাণ অর্থাৎ আত্মাই গুরু—"আত্মা বৈ গুরুরেক:" ইতি কুলার্ণবতন্ত্র। শ্রুতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন—"প্রাণোহবৈ মাতা, প্রাণোহবৈ পিতা, প্রাণোহবৈ আচার্য্যঃ" ইতি শ্রুতি। তন্ত্রও এই কথা স্বীকার করেন। তন্ত্রে পার্ব্বতী মহাদেবকে মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করায় মহাদেব বলিয়াছিলেন :—

শিবাদিক্রিমিপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনম্।
নিশ্বাসঃ শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥

ইতি কুলার্ণবতন্ত্র।

অর্থাৎ শিবাদি ক্রিমিপর্য্যন্ত প্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বাস বহিতেছে তাহাই মন্ত্র। ইহার দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, একমাত্র প্রাণবায়ুই মন্ত্র। তন্ত্রে যে সকল বীজ মন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ের অক্ষরে অক্ষরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রাণবায়ুর বিবিধ ক্রিয়া নিহিত আছে। ষড়াম্নায়েও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই ক্রিয়া সকলই মন্ত্র। মনুষ্য ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমে প্রাণায়ামপরায়ণ এবং তৎপরে বায়ু স্থির হইলে মোক্ষপরায়ণ হইয়া ঐ বায়ুকে স্থিরত্বের শক্তির দ্বারা সাঙ্কেতিক স্থানে রাখিলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নই বীজ। যেমন ক্রীং = (ক = মস্তক; র = বহ্নিবীজ, চক্ষু;

ঈ=শক্তি ; ং=বিন্দু) স্থির বায়ুকে শক্তিপূর্ব্বক মস্তকে লইয়া গিয়া চক্ষুতে রাখিলে ওঁকারধ্বনি শুনা যায় ও বিন্দুকে স্থির-ভাবে দেখা যায়। সেই অব্যক্ত পরাশক্তিকে সহজে জানিবার উপায়সকল তন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। গুরুর অভাবে তন্ত্রের মন্ত্র ক্রিয়া সকল বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উপর্য্যুক্ত মন্ত্র-সকলকে যিনি ঘৃণা করেন তাঁহার পাপ ও নরক হয়। অতএব মন্ত্রকে ঘৃণা না করিয়া মন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

আমরা যে সকল প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। যোগীরা ছয় চক্রে ক্রমশঃ থাকিয়া যে যে মূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ দর্শন করেন, তৎসমুদায়ের প্রতি-মূর্ত্তির নাম প্রতিমা। সুতরাং সে সকলও মিথ্যা নহে, সে সকলকে প্রস্তর বা মৃত্তিকা বলিয়া ঘৃণা করায় পাপ আছে। কারণ মূলে প্রতিমাসকল শিলা বা মৃত্তিকা নহে। অল্পবুদ্ধি সাধকদিগের হিতের জন্য যোগীরা প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃতিপুরুষে সংযতচিত্ত হইয়া অব্যক্ত পরা-শক্তিতে যুক্তভাবে থাকার নাম পূজা। প্রকৃতি আদ্যা শক্তি, ভগবতী ; তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন। ভগবতীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন :—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপককারণম্॥
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে॥

অর্থাৎ আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়,

বাক্যের অতীত, আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি বিকল্পরহিত, আমার আদি নাই, আমি জ্ঞানানন্দস্বরূপ-বিগ্রহ, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আমরা যে দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকি তাহা পুত্তলিকাপূজা নহে, তাহা সেই অব্যক্ত পরাশক্তিরই পূজা। কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে উহা এক্ষণে পুত্তলিকাপূজায় পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা মিথ্যা নহে তবে অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ হইয়া থাকে, বিধিপূর্ব্বক হয় না—এই জন্য ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় যাহারা ভক্তি * ও শ্রদ্ধা * সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহারা (আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে) অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে। গীতাতে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, সংযতাত্মা তাঁহাকর্ত্তৃক প্রদত্ত ঐ সকল আমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

কিন্তু সংযতাত্মা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দিতে হইবে। সংযতাত্মা না হইলে প্রকৃত ভক্তি হয় না। সুতরাং যাহাতে

---

* গীতায় ১২শও ১৭শ অধ্যায়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে।

সংযতান্তঃকরণ হওয়া যায়, অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা উচিত, নচেৎ কিছুই হইবে না। বস্তুতঃ সংযতান্তঃকরণ হইতে না পারিলে কোন্ কার্য্যেই আমাদের অধিকার নাই। যিনি সংযতাত্মা, তিনি সকল কার্য্যেই সক্ষম হইতে পারেন, নতুবা পূজাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। প্রাণায়ামাদি যোগ-সাধনব্যতীত সংযতচিত্ত হইতে পারা যায় না। কার্য্য করিয়া সংযতচিত্ত না হইয়া কেবল মুখে "আমি সংযতচিত্ত হইয়াছি" বলা আমার ভুল। তাহাতে নিজের ও অপরের অনিষ্ট করা হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের এমনি ভ্রমধারণা হইয়া গিয়াছে যে, প্রাণায়ামাদি যোগসাধনদ্বারা উৎকট রোগ এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে এরূপ মনে করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা দুঃখের, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি!!! এতই ভ্রম যে এমন দুর্লভ যোগরত্নকে আমরা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। যোগাভ্যাসে উৎকট রোগগ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক, সহস্র সহস্র মনুষ্য যে তদ্দ্বারা উৎকট উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। তবে যোগাভ্যাসে রত হইয়া আমি যদি গুরুর উপদেশ মত না চলি এবং আপনাকে গুরু অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করি তাহা হইলে কখনই আমার অভীষ্ট ফল-লাভ হইতে পারে না। শরীরাভ্যন্তরে যে যে যন্ত্র আছে তৎসমুদায়ই একমাত্র প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিচালিত। এই প্রাণবায়ু শরীরের স্থানভেদে নানা আখ্যা ধারণ করিয়া দৈহিক ও মানসিক কার্য্য সকল সমাধা করিতেছে। সেই বায়ুর

বিকার হইলেই দৈহিক ও মানসিক কার্য্যের বিপর্য্যয় ঘটে এবং সেই বিপর্য্যয় হইতেই রোগ শোকাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস বা প্রাণকর্ম্ম ব্যতীত আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি তাহাতেই আমাদের শ্বাসক্ষয় ও বায়ুর কিছু না কিছু বিকার হইয়াই থাকে। কিন্তু প্রাণকর্ম্মের দ্বারা ঐ ক্ষয় নিবারিত ও বিকার রহিত হয়। গুরুর উপদেশ মত প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা যিনি যে পরিমাণে সেই ক্ষয় ও বিকার নিবারণ করিতে সক্ষম হন তিনি সেই পরিমাণেই দীর্ঘজীবন ও উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। যিনি তাহা না পারেন তিনি রোগ শোকাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। যোগাভ্যাসে রত না হইলে লোকের যে দশা হয় যোগাভ্যাসে রত হইলেও এরূপ ভ্রষ্ট ব্যক্তির সেই দশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি গুরুর উপদেশ মত কার্য্য করিয়া উৎকট উৎকট ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তখন যদ্দ্বারা বায়ুর বিকার নষ্ট হইয়া পীড়াদি আরোগ্য হয় তাহা হইতে কখনই কোন অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। সুতরাং যোগাভ্যাসে রত হইলেও আমার নিজের দোষে যদি রোগাদি বা মৃত্যু হয় তাহা হইলে যোগাভ্যাসকেই ঐ সকলের কারণ বলা আমার বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতা নয় কি? আমি নিজের বুদ্ধিতে গুরুর অমতে চলিয়া রোগগ্রস্ত হইলাম এবং তদুপদিষ্ট কার্য্যের রীতিমত অনুষ্ঠান না করিয়া তাহা সারাইতেও পারিলাম না ইহা আমার দোষ, না যোগাভ্যাসের দোষ? ইহাই যদি যোগাভ্যাসের দোষ হয় তাহা হইলে ত পীড়াদি হইলে কাহারও কোন ঔষধ সেবন করা

উচিত নহে ? কেননা অনেক স্থলে ত এক ঔষধের সর্ব্বত্র সমান গুণ দেখা যায় না। যে ঔষধে আমার উপকার হইল না, সেই ঔষধেই ঠিক আমার অনুরূপ পীড়ায় অপরের উপকার হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সেই ঔষধের সেই গুণ নাই বলা আমার পক্ষে বাতুলতা নয় কি ? ইহা যেমন সঙ্গত নহে যোগাভ্যাস করিলেই রোগ বা মৃত্যু হইবে এই ভয়ে সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত পরমপদপ্রাপ্তির এমন সহজ উপায়কে ভয়াবহ বলাও তদ্রূপ উপহাসকর। তবে উপযুক্ত কর্ম্মীর নিকট ইহার উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য ; নচেৎ পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা আছে। ইহা যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, বায়ুর সামান্য বিকার হইতে উৎপন্ন রোগাদি ইহার দ্বারা শান্তি হইতেছে তখন যে মহৎ বিকারে এই ভবরোগের উৎপত্তি তাহা যে ইহার দ্বারা অবশ্যই অপসারিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। সান্নিপাতিক বিকারে রোগী যেমন নানা প্রকার প্রলাপবাক্য বলিয়া থাকে অথচ নিজে জানে না যে সে প্রলাপ বকিতেছে তদ্রূপ আমরাও বায়ুর ঘোর বিকারে ভবরোগাক্রান্ত হইয়াও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছি না। সাধুদিগের সে বিকার নাই সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ে তাঁহাদের আসক্তিও নাই। একারণ তাঁহারা আমাদের সেই ভ্রম দেখিয়া তন্নিবারণের জন্য প্রাণায়ামাদিরূপ উপায়ও শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনই ভ্রমান্ধ ও ঘোর নারকী যে এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও প্রাণায়ামাদিরূপ সেই উৎকৃষ্ট যোগরত্নকে অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও প্রাণনাশক বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকি !!! যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রথমতঃ শারীরিক উন্নতি হয়। পরে ক্রমশঃ রোগ শোক

তাপ ভয়াদির নাশ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকে। তখন মন নির্ম্মল হইয়া দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইতে থাকে, এবং মন যতই স্বচ্ছ হয় ততই তাহাতে ব্রহ্মের সত্ত্বা প্রতিফলিত হইতে থাকে। তখন মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া জীবের স্থিরত্বপদ লাভ হয় এবং অপার আনন্দ সহকারে অমরত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মে লয় হয়। বস্তুতঃ প্রাণায়ামাদি যোগসাধন ব্যতীত ধারণা ধ্যান সমাধি লাভ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রাণায়ামের আবশ্যকতা নাই, কারণ, প্রাণায়াম বায়ুসাধন, উহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু শাস্ত্রাদি ও যুক্তি দেখিলে তাঁহারা সহজেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন।

শাস্ত্রে প্রাণায়াম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন এবং প্রাণায়ামই বা কাহাকে বলে এক্ষণে তাহারই বিচার করা যাউক। রুদ্রযামলে ১৫শ পটলে লিখিত আছে :—

প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশিতূলানলঃ॥
মহাপাতককোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানাদুষ্কর্ম্মপাতকম্।
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোঽভ্যাসযোগতঃ॥

অর্থাৎ প্রাণায়ামই মহা ধর্ম্ম, তাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সকল প্রকার পাপরাশিবিনাশক; ইহার দ্বারা কোটি কোটি মহাপাতক, কোটি কোটি দুষ্কর্ম্ম, এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপসকল ও নানা দুষ্কর্ম্মজনিত পাতক

ধ্বংস হয়; যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য।

প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্।
প্রাণায়ামাদ্বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী।
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ॥

ইতি যোগশাস্ত্রে।

অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা মনের শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, প্রাণায়ামসাধনের দ্বারা নানা প্রকার রোগের বিনাশ হয় ও পরমাত্মপ্রাপ্তির শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং মনের উন্মীলনী শক্তির বিকাশ হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া অপার আনন্দ হয়। প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তন্ত্রেও অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রাণায়াম দ্বারা কালকে জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন :—

ব্রহ্মাদয়োঽপি ত্রিদশাঃ পবনাভ্যাসতৎপরাঃ।
অভূবন্নন্তকভয়াত্তস্মাৎ পবনমভ্যসেৎ॥

—ইতি হঠপ্রদীপিকা।

উপনিষদেও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাণায়ামের দ্বারা সকল প্রকার দোষের এবং সকল প্রকার পাপেরও নাশ হয়—

প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
কিল্বিষং হি ক্ষয়ং নিত্যং স্থচিরঞ্চৈব চিন্তয়েৎ॥

—ইতি অমৃতবিন্দূপনিষৎ।

প্রাক্‌কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি ॥

মনু—২য় অ° ৭৫ শ্লোক।

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক আছে তৎসমুদায়েই প্রাণায়ামের বিধি আছে। এমন কি প্রাণায়াম ব্যতীত হিন্দুর কোন কার্য্যই হয় না। প্রাণায়াম সর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধুশ্রেণীর মধ্যেও প্রাণায়াম প্রচলিত আছে। গোরক্ষনাথ, নানক, তুলসীদাস, কবির প্রভৃতি জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও যে শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎসাধনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ঋষিরাও যে প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা জীবন্মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি শুকদেব, যাঁহার বাল্যকালেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল তাঁহাকেও রাজর্ষি জনকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রাণায়ামের দ্বারা স্বশরীরস্থ মেরুর শিখরে অর্থাৎ সুষুম্নার অভ্যন্তরে গিয়া সমাধিস্থ হইতে হইয়াছিল। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষুপ্রকরণে এই কথা লেখা আছে—

অনুশিষ্টঃ স ইত্যেবং জনকেন মহাত্মনা।
অতিষ্ঠৎ স শুকস্তূষ্ণীং স্বচ্ছে পরমবস্তুনি ॥
বীতশোকভয়ায়াসো নিরীহশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
জগাম শিখরং মেরোঃ সমাধ্যর্থমনিন্দিতম্ ॥

যোগবাশিষ্ট-মুমুক্ষুপ্রকরণ

অতএব সর্ব্ববাদি-সম্মত যে মত তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কোন একজন সামান্য মানবের মত শুনিয়া ঋষিদিগের মত অগ্রাহ্য করা বাতুলতা বই আর কিছুই নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ অপেক্ষা আমাদের ন্যায় সামান্য মানবের বুদ্ধি কি বেশি? তাহাও স্বীকার করিতে পারিতাম যদি আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাদের ন্যায় কার্য্য দেখাইতে পারিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়া আমরা ঐ সকলের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের প্রতি অযথা কটুভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি। তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে হইলে বুদ্ধিমান্ হওয়া চাই, নচেৎ বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের ও তাঁহাদের বুদ্ধিতে অনেক প্রভেদ। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের বুদ্ধি নাই—একথা বলা অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকিতেন এবং ব্রহ্মে যুক্ত থাকিয়াই সমস্ত করিতেন বা বলিতেন। সুতরাং তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্তই ব্রহ্মেরই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবাক্য অগ্রাহ্য করা অযুক্ত ব্যক্তির উচিত নহে। অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; কারণ মনের চঞ্চল অবস্থায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারে না। মন যুক্ত না হইলে (অর্থাৎ একে লাগিয়া না থাকিলে) কখন স্থির হয় না ও নানা বিষয়ে রত হয়। ইহা নিজে নিজে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। একারণ ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

অর্থাৎ অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই এবং ভাব (অর্থাৎ অবস্থা বিশেষ) নাই, যাহার ভাব নাই তাহার শান্তি কোথায়, এবং শান্তির অভাবে সুখ কোথায় ? যেমন একের অভাবে কিছুই থাকে না তদ্রূপ যুক্ত হইতে না পারিলে আত্মভাবনা ও শান্তি কিছুই থাকে না। অতএব অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অগ্রাহ্য এবং অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লইয়া চলিতে গেলে আমাদের পদে পদে বিপদে পড়িতে হইবে। বিপদের আর বাকিই বা কি আছে ? যাহা ঘটিয়াছে তাহা কি যথেষ্ট নয় নাই ? আর কেন বিপদ জড়াইয়া রাখি ; আর ভ্রমে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না। ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া কার্য্য করা উচিত। প্রাণায়াম সর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত এবং সকল সাধুগণও একবাক্যে প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন উৎকৃষ্ট রত্নকেও আমরা সামান্য বায়ুসাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি !!! প্রাণায়াম যে কি পদার্থ তাহা বুঝিবারও চেষ্টা নাই—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে !!!

বায়ুই যদি প্রাণ হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পরে দেহও বায়ুশূন্য হইত। কিন্তু প্রাণিগণ মরিয়া যাইলে দেখা যায় যে, মৃত দেহের মধ্যেও বায়ু থাকে ; কেন না মৃত দেহের মধ্যে বায়ু একেবারে না থাকিলে বাহিরের বায়ুর চাপ উহাকে চেপ্টাইয়া পাতলা করিয়া ফেলিত। আজ কালের বৈজ্ঞানিকেরাও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও এক কথা,—এই বায়ুই প্রাণ হইলে পম্পদ্বারা মৃত দেহের অভ্যন্তরে কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করাইয়াও ঐ শব দেহের চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারা যাইত। অতএব বাহিরের এই বায়ু যে প্রাণ নহে, তাহা

এই যুক্তির দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। এখন দেখা যাউক শাস্ত্রে প্রাণকে কি বলিয়াছেন—

প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান্ ঈশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা; প্রাণই সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সমস্ত জগৎই প্রাণময়। ঈশ্বর বলিয়াছেন—

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচো মনো বাচা বিলীয়তে॥

অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি, এবং মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি ও বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে। যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না অর্থাৎ যাহা শব্দেরও (শব্দকেও শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন) অতীত তাহাই অব্যক্ত। অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন সেই প্রাণই আত্মা—"আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" অর্থাৎ আত্মাই এক মাত্র গুরু। সেই গুরুই আমার প্রাণ—"আচার্য্যোহবৈ প্রাণঃ" ইতি শ্রুতি। এই সকল প্রমাণদ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণায়ামাভ্যাসী সাধকেরা সামান্য বায়ুর সাধন করেন না। তাঁহারা প্রাণের সাধন করায় আত্মারই সাধন করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে ইহা জীব মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য এবং ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে। গীতাতেও ভগবান্ একথা বলিয়াছেন;—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এক্ষণে দেখা যাউক পরধর্ম্ম কাহাকে বলে। আমরা হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্ম্মকেই পরধর্ম্ম বলিয়া থাকি। তদ্রূপ মুসলমানেরা মহম্মদের ধর্ম্ম ব্যতীত ও খ্রীষ্টিয়ানেরা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম্মকেই পরধর্ম্ম বলিয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদও ঘটিয়া থাকে। হায়! কি পরিতাপের বিষয়—ধর্ম্মও পৃথক্ হইয়া গিয়াছে!!! আমাদের শাস্ত্রে বলে—ভগবান্ জীব মাত্রেরই হৃদয়ে আছেন অর্থাৎ নারায়ণ প্রতি ঘটেই বিরাজমান। তবে মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানের ঘটে কি নারায়ণ নাই? যদি বলা যায় যে মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানের দেহে নারায়ণ নাই, কেবল হিন্দুর দেহেই আছেন, তাহা হইলে হয় শাস্ত্র ভুল, না হয় আমি অজ্ঞানী। বাস্তবিক শাস্ত্র কখনই ভুল হইতে পারে না; সাধন অভাবে প্রকৃত ভাব অবগত হইতে না পারায় অজ্ঞান বশতঃ আমারই ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদজ্ঞান হইতেছে। ধর্ম্ম কখন পৃথক্ হইতে পারে না তবে যে ভগবান্ গীতায় স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এই দুইটী কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ যদি এরূপ বুঝা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মই হিন্দুর স্বধর্ম্ম এবং তদ্ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম হিন্দুর পরধর্ম্ম তাহা হইলে ভগবানে দোষ অর্শে। আমরা ঐরূপ বলিলে দোষ হইতে পারে না; কিন্তু ভগবানের মুখে ইহা শোভা পায় না; কেননা ভগবানের সকলকে সমান চক্ষে দেখা উচিত; এবং সমান চক্ষে না দেখিলে তাঁহাকে পক্ষপাতিতা দোষে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং উহা কখনই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে

না। প্রকৃত পক্ষে "আপনার" ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক আপনি কে? এই হাড়মাসবিশিষ্ট দেহ আমি বা আপনি নহি। কারণ, আজ যদি আমার বা আপনার প্রাণ না থাকে তাহা হইলে আমি বা আপনি কোথায়? তখন দেহ পড়িয়া থাকিবে অথচ আমি বা আপনি থাকিব না। প্রাণই সেই আত্মা—আত্মার অস্তিত্বেই আমার বা আপনার অস্তিত্ব, আত্মা নাই ত আমি বা আপনিও নাই। সেই আত্মাই শ্বাস-রূপে সর্ব্বজীবে এবং বৃক্ষাদিতেও বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মার ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম কারণ "স্ব"—আত্মা বা আপনি। সুতরাং আত্মার ধর্ম্ম বা আপনার ধর্ম্মই জীবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। সেই আত্মার ধর্ম্মে রত থাকার নাম স্বধর্ম্ম পালন করা এবং তাহা-তেই রত থাকিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্তু পরধর্ম্ম সর্ব্বদা ভয়াবহ। পরধর্ম্মে সর্ব্বদা বিরত থাকা উচিত, কারণ, পরধর্ম্মে সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা আছে। সেই পরধর্ম্ম কি? আত্মাকে যাহারা জানিতে দেয় না তাহারাই পর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে ধর্ম্ম তাহাই পরধর্ম্ম। সুতরাং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইহাদের ধর্ম্মে আসক্তির সহিত রত হওয়া উচিত নয়। আসক্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রত হইলেই বিপদের আশঙ্কা আছে; সুতরাং উহা ভয়াবহ এবং সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ইহাই উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ।

অতএব শাস্ত্রাদি এবং যুক্তিদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রাণায়ামই মহাধর্ম্ম এবং ভগবৎসাধনের প্রধান উপায়। সুতরাং এই প্রাণায়াম জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাকেই

সহজ কর্ম্ম বলে। সহজ অর্থাৎ জন্মের সহিত যাহা পাওয়া যায়। আমরা একমাত্র প্রাণকেই জন্মের সহিত পাইয়াছি, সুতরাং প্রাণকর্ম্মই আমাদের সহজ কর্ম্ম। যদি বলা যায় যে, এই দেহও ত আমরা জন্মের সহিত পাইয়াছি তবে এই দেহের ধর্ম্ম আমাদের স্বধর্ম্ম নহে কেন? তাহার কারণ এই যে, প্রাণের অভাবে দেহের অস্তিত্ব থাকে না, দেহ পচিয়া যায়। অতএব প্রাণকর্ম্মই আমাদের সহজ কর্ম্ম যাহা আপনা আপনি হইতেছে। সেই প্রাণের বৃদ্ধি করার নামই প্রাণায়াম। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥

অর্থাৎ জন্মের সহিত যে কর্ম্ম পাওয়া গিয়াছে তাহা দোষযুক্ত হইলেও কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবে না, কারণ সকল কর্ম্মই আরম্ভ মুখে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় কোন না কোন দোষ যুক্ত থাকে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবলি "বিবর্ত্ত-বিলাস" নাক পুস্তকেও লেখা আছে—

সহজ সাধন সহজ ভজন ইহা ছাড়া কিছু নাই।
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ ঐক্যতা করিয়া মনে।

এক কালে শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, নিত্যানন্দ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব চূড়ামণিগণ সহজরূপ প্রাণায়ামের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া ঐ সহজ কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহার প্রচারের জন্য বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবন-ধাম হইতে নবদ্বীপ ধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কি

দুঃখের বিষয় কালে তাহা লোপ হইয়া কেবল বাক্যে পরিণত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই বিলাসিতায় পূর্ণ। সাধন নাই কেবল নাম আছে আর "ভেক" আছে। এই ভেকের জ্বালায় অস্থির, কেবল ডাক্ আছে, কাজ নাই। সুতরাং যেমন গুরু তেমনি চেলাও হইতেছে। তাহাতে চেলার দোষ কি? আমরা ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে নিজে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি, সুতরাং সে দোষ অন্যের নহে, আমাদের নিজের দোষেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। পরিণামে আরও যে কি হইবে তাহাই বা কে জানে? ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হয় না!!! কত কালে যে হইবে তাহারও ঠিক নাই। এখনও যদি আমরা আলস্য ও বিলসিতা ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ও সাধন আরম্ভ করি তাহা হইলে ভারতের পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় উদিত হইতে পারে এবং আমরাও যে আর্য্য সেই আর্য্য হইতে পারি। এখনও আমাদের আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বা লজ্জা হয় না? কি ছিলাম আর কি হইয়াছি!!! আর সহ্য হয় না, দুঃখে চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। আসুন্ একবার সকলে মিলিয়া আলস্য ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখাইবার চেষ্টা করি, সাধন আরম্ভ করি। উঠুন্ আর নিদ্রা যাইবেন না। এখনও এত দুরবস্থায় পা ছড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া আর ভাল দেখায় না। এক দিন ত পা ছড়াইয়া শয়ন করিতেই হইবে। যাহার সম্মুখে কাল লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান তাহার কি নিদ্রা যাওয়া উচিত, না সেই কালেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত? উঠুন্ আর নিদ্রা যাইবেন না। এখন সেই

কালেরই শরণাপন্ন হউন, সর্ব্বদা সেই কালের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহা হইলেই কালের হাত এড়াইয়া কালাতীত হইতে পারিবেন। সেই কালই আপনার প্রাণ। কারণ, মহাকাল ঘটস্থ হইয়া কাল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কাল শব্দে সময়। এই ঘটস্থ কালের সংখ্যা হইতে আমরা সময় পাইয়াছি নচেৎ মহাকাল অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই। এই সংখ্যা হইতেই সাংখ্য এবং ইহাই অজপা যাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে। আর এই কালেরই আদি অন্ত ও মধ্য শূন্য, কারণ, সেই অনন্ত কাল যখন ঘটস্থ হন নাই তখনও শূন্য অর্থাৎ ঘটের আদি ও অন্তে শূন্য। যাহার আদি ও অন্তে শূন্য তাহার মধ্যাবস্থাও শূন্য। এই কারণেই শাস্ত্রে কালরূপী প্রাণকে শূন্য বলিয়াছেন—"শূন্যধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ"। তিনিই রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন। যাহাতে তিনি সংহার না করেন তাহা করুন, জাগিয়া থাকুন আর ঘুমাইবেন না। জাগিয়া থাকিলে আর চুরি হইবে না, জাগ্রত ঘরে প্রায় চুরি হয় না। লক্ষ্যচ্যুত হইলেই চুরি হইবে, অতএব সাবধান হউন। যাহাতে সদা সর্ব্বদা আপনার প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহা করুন। যে অবস্থায় সদা আপনা আপনি প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহা সহজাবস্থা। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ এবং গুরূপদেশ ব্যতীত কথায় মিলে না। গুরুকৃপা বিনা ইহা পাইবার উপায়ান্তর নাই।—

দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥

ইতি হঠপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ সদ্গুরুর করুণা বিনা বিষয়াসক্তিত্যাগ হওয়া দুর্লভ, তত্ত্বদর্শনও দুর্লভ এবং সহজাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও দুর্লভ।

উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ যাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি কায়িক ও মানসিক কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ যোগীর স্বতই সহজাবস্থা উপস্থিত হয়। কবির সাহেব প্রভৃতি জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও " সহজ " সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

কবির সহজ হি ধুনি লাগি রহে, সেত এহত ঘট্ মাহি।
হৃদে হরি হরি হোং হ্যায়, মুখ কি হাজত নাহি ॥

অর্থাৎ সহজরূপ ধুনি এই শরীরের মধ্যেই লাগিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই আপনা আপনি হরি হরি হইতেছে, মুখে চীৎকার করিবার আবশ্যক নাই। ফলকথা, সহজ যে প্রাণ—যাহা আপনা আপনি চলিতেছে—তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া থাক তাহা হইলেই সব জানিতে পারিবে; তখন আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বস্তুতঃ শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা দেখিতে গেলে প্রাণায়াম যে ভগবৎসাধনের রাজপথ তাহার আর সন্দেহ নাই। যে পথে সকলেই যাইতে পারে, সকলেই যাইতে সক্ষম এবং সকলেরই সমান অধিকার আছে তাহাই রাজপথ। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাই রাজা এবং আত্মার পথই রাজপথ। সে পথে যাহার যাইতে ইচ্ছা সেইই যাইতে পারে। সেই আত্মাই প্রাণ এবং

প্রাণই আত্মা। সুতরাং সে পথে যাইতে কাহারও বাধা নাই, সকলেই সকল অবস্থাতেই যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়দিগের যে পথ তাহা রাজপথ নহে, কেননা তাহাতে সকলের সমান অধিকার নাই। মনে করুন আমি সূর্য্যের বা অগ্নির উপাসনা করিব, কিন্তু আমার দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু নাই। চক্ষুর অভাবে আমার সূর্য্যের বা অগ্নির রূপদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল না। তবে কল্পনায় হইতে পারে বটে, কিন্তু কল্পনা সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, কল্পনায় নিশ্চয় জ্ঞান হয় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ। অতএব যাহা অসম্পূর্ণ এবং যাহাতে সকলের অধিকার নাই তাহা কখনই রাজপথ হইতে পারে না। এইরূপ কর্ণের দ্বারা শব্দাদির উপাসনা করাও রাজপথ নহে; কেননা শ্রবণ শক্তির অভাবে শব্দাদির সাধন কথনই হইতে পারে না। সুতরাং ইহাও পরিত্যজ্য, যেহেতু ইহাতেও অনেক বাধা বিঘ্ন আছে ও সকলের সমান অধিকার নাই। তেমনি যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সাধন করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও বাক্‌শক্তির অভাব হইলে আর সাধন হইতে পারে না। কাজে কাজেই ইহাতেও বাধা বিঘ্ন থাকায় তাহাও সকলের পক্ষে সুপথ নহে। তদ্রূপ যাঁহারা ঘ্রাণের বা স্পর্শের দ্বারা মনের লয়সাধন করিয়া থাকেন তাঁহারাও ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা চর্ম্মরোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে মনের লয় করিতে অক্ষম হন। সুতরাং ইহাও রাজপথ নহে। রাজপথে ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব হইলেও যাওয়া যায়। তবে ইহাও বলিতে পারেন যে আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা শ্রব-

শেন্দ্রিয়ের অভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধন করিব; আমার ত একেবারে সকল শক্তিরই অভাব হইবে না, একের অভাবে অন্যের দ্বারা সাধন করিব তাহাতে আর ক্ষতি কি? একেবারে যে নাই এমত নহে। কারণ, রূপ দর্শন করে কে? চক্ষু কি দর্শন করে? কখনই না। চক্ষু দর্শনের দ্বারস্বরূপ, চক্ষুতে মনঃসংযোগ না হইলে দর্শন হয় না। তদ্রূপ কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনা। শব্দ শুনে কে? আমি শব্দ শুনিতে বসিলাম কিন্তু আমার মন ওদিকে হাট বাজার করিতে লাগিল। মনের স্বভাবই এই যে সে এক বস্তুতে কখনই স্থির থাকে না। অতএব অগ্রে মন স্থির কর তাহার পর দর্শন বা শ্রবণ করিও। মনের স্থিরতা ব্যতীত কিছুই হয় না। ব্যাকরণ-বোধ না থাকিলে যেমন সাহিত্য বা দর্শনাদি শাস্ত্রের কোন জ্ঞান জন্মে না তদ্রূপ মনের স্থিরতা ব্যতীত একেবারে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কোন কার্য্যই হয় না, ভ্রষ্ট হইতে হয়। একারণ ইন্দ্রিয়ের পথ রাজপথ নহে। না হয় স্বীকার করিলাম যে ইন্দ্রিয়ের পথও রাজপথ, কিন্তু মনে করুন্ একজন বোবা, যাহার বাক্-শক্তি ও শ্রবণশক্তি দুইই নাই—বোবা হইলেই বধির হয়—এবং তৎসঙ্গে বসন্ত রোগে তাহার চক্ষু নষ্ট হওয়ায় দর্শন-শক্তিরও অভাব হইয়াছে, নাসা রোগে তাহার ঘ্রাণ শক্তিও গিয়াছে, চর্ম্মরোগে সে স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না—এমন অবস্থায় এরূপ ব্যক্তির কি উপায় হইবে? তাহার কি সাধন হইবে না? সে কি প্রকারে সাধন করিবে? যদি বলা যায় যে এমন অবস্থাপন্ন পাপী ব্যক্তির সাধন না হওয়াই ভাল,

কেননা যাহার একেবারে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভাব হইয়াছে এমন মহাপাপীর উদ্ধার না হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত। এই বাক্য প্রয়োগ করা আমার ন্যায় লোকের পক্ষে শোভা পায় কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার চক্ষেত সকলেই সমান। আমার চক্ষে পাপাত্মা পুণ্যাত্মারূপ প্রভেদ থাকিতে পারে কিন্তু যিনি সর্ব্বত্রে অভেদজ্ঞানে সমদর্শন করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে একথা বলা কখনই শোভা পায় না। আরও বিশেষ আমাদের শাস্ত্রেই যখন দেখা যায় যে উৎকট উৎকট মহাপাপীও ভগবৎ সাধনদ্বারা উদ্ধার হইয়াছে তখন অবশ্যই এরূপ ব্যক্তিরও সাধনের উপায় আছে। সুতরাং সেই উপায়ই কেবল রাজপথ, ইন্দ্রিয়ের পথ রাজপথ নহে। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিরই অভাব হইয়াছে কিন্তু যে শক্তির দ্বারা সমস্ত জীব চালিত হইতেছে তাহার সে শক্তির ত অভাব হয় নাই। সে শক্তির অভাব হইলে সে ব্যক্তি মরিয়া যাইত। অতএব সেই শক্তির দ্বারা সে ব্যক্তি পরাশক্তির সাধন করিতে পারে। সেই শক্তিই আমাদের প্রাণ যাহা প্রত্যেক ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে। ইহা কেহই বলিতে পারেন না যে আমার প্রাণ নাই। প্রাণ সকলেরই আছে কিন্তু সেই প্রাণে কাহারও লক্ষ্য নাই। এই প্রাণের সাধন সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই হইতে পারে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি আছে প্রায় তাহার সকলগুলিতেই প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রকৃত উপদেষ্টার অভাবে সেই প্রাণায়ামের প্রকারভেদ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাণায়াম ব্যতীত হিন্দুর প্রায় কোন কর্ম্মই নাই। অতি সামান্য কর্ম্ম

আছে যাহাতে প্রাণায়াম নাই। বাস্তবিক প্রাণায়ামই যে রাজপথ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন উৎকৃষ্ট উপায়কেও লোকে ভ্রমে পড়িয়া সামান্য বায়ুসাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে যাহার দ্বারা আমরা সকল কাজ করিতেছি, যাহার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, যাহা না থাকিলে আমি নাই, দিনান্তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই প্রাণের প্রতি লক্ষ্য করি না। আজ যদি আমার প্রাণ না থাকে তাহা হইলে সাধনই বা কে করিবে এবং ঐশ্বর্য্যই বা কে ভোগ করিবে!!! আজ আমায় লোকে মান্য করিতেছে, আদর করিতেছে, আমার নিকট বসিতে ইচ্ছা করিতেছে, এবং আমিও ভাবিতেছি যে আমি একজন গণ্য মান্য লোক হইয়াছি, কিন্তু একবারও ভাবি না যে এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হইলে আমার আর কিছুই থাকিবে না, একবারও ভাবি না যে যাহারা এখন আমায় মান্য করিতেছে, এত আদর ও যত্ন করিতেছে, এক প্রাণের অভাবে তাহারাই আমায় ঘৃণা করিবে, কেহই আমায় স্পর্শ করিবে না। তখন আমি শবে পরিণত, একদিন সৎকার করিতে বিলম্ব হইলে আমার এই দেহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইবে। সুতরাং তখন আর কেহই আমার কাছে আসিবে না, সকলেই নাকে কাপড় দিয়া দূরে পলায়ন করিবে এবং বিষ্ঠা অপেক্ষাও আমায় ঘৃণা করিবে। তখন আমার মৃতদেহ বহন করিবার ভয়ে অনেকেই বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইবে। তখন স্ত্রীপুত্রবন্ধুবান্ধব কাহারও নিকট আমার আদর নাই, সকলেই আমাকে হতাদর করিবে। দেখুন্ এক্ প্রাণের অভাবে আমার কি দুর্দ্দশা!!!

এমন হিতকারী ও স্বার্থশূন্য বন্ধু আমাদের আর কে আছে!!! এমন নিঃস্বার্থ বন্ধুর প্রতি আমাদের অনেকেরই লক্ষ্য নাই বরং তাহার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছল্যই করিয়া থাকি। এই কি আমাদের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার!!! হায় আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ জগতে আর কে আছে!!! যাহার একমাত্র প্রাণই সম্বল, সেই প্রাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার কি এমন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? আমাদের জামার পকেটে একটী টাকা থাকিলে পনরবার তাহাতে লক্ষ্য করি পাছে টাকাটী পড়িয়া বা হারাইয়া যায়, কিন্তু একবার ভাবি না যে প্রাণ না থাকিলে ঐ টাকা কে ভোগ করিবে। টাকা থাকিলে সুখী হইব এই ভ্রমেই আমাদের টাকার প্রতি এত যত্ন! কিন্তু জগতে আজ পর্যান্ত কেবল টাকার দ্বারা কেহ কি কখনও সুখী হইয়াছেন? কেহই না। অনেকেরই ত টাকা আছে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ত সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাঁহারা সর্ব্বদাই শান্তিসুখে বঞ্চিত। অতুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে অথচ শরীর লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত যে ভোগ-বিলাসের জিনিস্ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই!!! তাহার উপর বিষয়চিন্তা তুষাগ্নির ন্যায় নিরন্তর অন্তঃশরীর দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা কষ্ট আর কি হইতে পারে!!! প্রাণের প্রতি লক্ষ্য না রাখাই এই কষ্টের একমাত্র কারণ। প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে এবং প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত শান্তি লাভ হয়, নতুবা কেবল ধনের দ্বারা প্রকৃত সুখ কখনই হয় না। প্রকৃত সুখলাভ করিতে হইলে নিজের মনকে প্রাণের

প্রতি রাখিতে হয় এবং সর্ব্বদা প্রাণের উপর লক্ষ্য রাখিতে, রাখিতে মন ও প্রাণ উভয়ই শীতল হয় এবং প্রকৃত সুখও অনুভব হয়। প্রাণের এই স্থিরাবস্থাই সাধুদিগের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান ; ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগের অন্য স্থান আর নাই। মহাত্মা কবিরও এই কথা বলিয়াছেন—

কবির অজপা সুমিরণ হোৎ হ্যায় কহো শন্ত কো হি ঠৌর।
কর জিহ্বা সুমিরণ করে এহ সব মন কি দৌড়॥

অর্থাৎ অজপা স্মরণই সাধুদিগের দাঁড়াইবার একমা স্থান, করের দ্বারা মালা জপ বা জিহ্বার দ্বারা নাম জপ করা এ সকল মনের দৌড় মাত্র, কাজ কিছুই হয় না।

কবির অজপা সুমিরণ হোৎ হ্যায় শূন্য মণ্ডল অবস্থান।
কর জিহ্বা তাঁহা না চলে মন পঙ্গুল তাহা জান॥

অর্থাৎ অজপা স্মরণের দ্বারা শূন্য মণ্ডলে অবস্থান হয়, কর ও জিহ্বা সেখানে যাইতে পারে না, খঞ্জ হইয়া যায়।

কবির মালা কাঠকি বহুৎজন করি ফের।
মালা ফের শ্বাস কি যাহে গাঁঠি নাহি সুমের॥

অর্থাৎ কাঠের মালাত অনেকেই ফিরাইয়া থাকে তাহাতে কিছুই হইবে না, শ্বাসের মালা ফিরাও যাহাতে সুমেরুর গাঁট নাই। মালার সংখ্যা যেখানে শেষ হয় সেই থানে একটী বড় মালা থাকে, সেই মালাটীকে সুমেরু কহে। কাঠের মালায় এই সুমেরু থাকে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে কবির সাহেবও প্রাণায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাণায়াম ব্যতীত জীবের যে অন্য উপায় নাই তাহাও তিনি বলিয়া

গিয়াছেন। সাধু গোরক্ষনাথ ও তুলসীদাস এবং গুরুনানক ইহাঁরাও যে অজপাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাণায়াম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ইহা যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া দেখা যাইতেছে তখন উহা না করিলে প্রত্যবায় আছে।

মনে করুন্ প্রাণ না হয় বায়ুই হইল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই বায়ুই প্রাণ হইলে তাহাই ত আমাদের জীবন, তাহার অস্তিত্বেই ত আমাদের অস্তিত্ব, তবে কেন তাহার সাধন না করি? বায়ুকেও ঘৃণা করা উচিত নহে, কেননা বায়ুও বড় সামান্য পদার্থ নহে। শাস্ত্রেই বা বায়ুকে কি বলিয়াছেন তাহাও দেখা যাউক।

বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ব্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং প্রভুর্ব্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে বায়ুসাধনও অকরণীয় নহে। অতএব প্রাণায়ামসাধন মানবমাত্রেরই করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রাদি অপর জাতি প্রাণায়ামাদি যোগসাধন করিতে পারে না, কারণ ব্রহ্মবিদ্যা শূদ্রাদির আলোচ্য নহে বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় শূদ্রাদিরা কি করিবে? প্রাণায়াম যোগসাধন করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময়ও এই কথা বলিয়াছেন:—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অর্থাৎ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে পাপযোনিই হউক্ কিংবা স্ত্রীলোকই হউক্ বা শূদ্র কিংবা বৈশ্যই হউক্ তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের এই কথার সহিত শাস্ত্রীয় অন্য বচনে—অনৈক্য হইতেছে। যথা :—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিতব্রাহ্মণ) ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহে। বাহ্যলক্ষ্যর অর্থে বস্তুতই এই বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলে উভয় বাক্যেরই একই অর্থ দেখা যায়। লিখিত আছে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানাত্তু ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ জন্মমাত্রে শূদ্র, তাহার পর সংস্কার হইলে দ্বিজ পদবাচ্য, তৎপরে বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রাহ্মণ বলা যায়। গৌতমসংহিতায়ও উক্ত আছে—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ যিনি ক্ষান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই ব্রাহ্মণ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে যতদিন ব্রাহ্মণপুত্রেরও ব্রহ্মজ্ঞান না হয় ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণপুত্র বা ব্রাহ্মণবংশে জাত এই মাত্র বলা যায়। "ব্রাহ্মণ" "ক্ষত্রিয়" "বৈশ্য" "শূদ্র" এই উপাধিগুলি গুণ ও কর্ম্মগত—বংশগত নহে। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি; তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। সুতরাং যিনি সাধনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তিনিই কেবল ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারেন। নচেৎ কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যদি তাহাই হয় তবে অন্যান্য বর্ণের মধ্যে যাহাদিগের যজ্ঞোপবীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই বা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হয় না কেন? বস্তুতঃ সাধন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে যিনি ব্রাহ্মণপুত্র তিনি যে শূদ্রাদি অপেক্ষা অধিক মাননীয় ও পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা ব্রাহ্মণপুত্রের সাধনমার্গ সহজেই লাভ হয় এবং তাঁহার পক্ষে সাধনও অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়। শূদ্রাদির কিছু বিলম্বে হয় এইমাত্র প্রভেদ। ব্রাহ্মণপুত্রকেও যেমন সাধনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় শূদ্রাদিরও তদ্রূপ। শূদ্রাদিরা যে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে এমত কখনই হইতে পারে না। শাস্ত্রেও যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে শূদ্রাদিরাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তখন এখনই বা তাহা না হইবে কেন? স্বয়ং বেদব্যাস, নারদ ও বিদুর, ইহারা দাসীপুত্র হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কবষ ঋষি, জাবাল ঋষি, এবং মাতঙ্গ ঋষি চণ্ডাল ছিলেন। বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। গার্গী আত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোক হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ইদানীন্তন সাধুদিগের মধ্যেও ঐরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগপথ অবলম্বনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নানক ও কবিরও তদ্রূপ। কবির জোলার গৃহে প্রতিপালিত হন কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার জন্মই জোলার গৃহে হইয়াছিল। তিনিও সদ্‌গুরু লাভ করিয়া সাধনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শূরদাস অতি নীচবংশে মুচির গৃহে জন্মিয়াও যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া মুক্তাবস্থা পাইয়াছিলেন। অতএব স্ত্রীশূদ্রাদিরাও প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উপাধি যে গুণ ও কর্ম্মগত—,বংশগত নহে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে—

"স্ত্রী-শূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

এই যে শাস্ত্রীয় বচন, ইহাই কি মিথ্যা? বাস্তবিক ইহাও মিথ্যা নহে। ইহার গূঢ়তাৎপর্য্য এই যে যখন জন্মমাত্রেই সকলেই শূদ্র তখন প্রণবদীক্ষা ত কাহারও হইতে পারে না। এজন্য সংস্কারদ্বারা দ্বিজ হইতে হয়। তাহার পর ক্রমে বেদপাঠদ্বারা বিপ্রপদবাচ্য এবং পরে ব্রহ্মজ্ঞানলাভদ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক সংস্কার কাহাকে বলে? আমাদের দেশে উপনয়ন বা গায়ত্রীদীক্ষা যাহা প্রচলিত আছে তাহাই সংস্কার। কিন্তু আজকাল উহা কেবল নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে, কাজে কিছুই নাই। এখন কেবল গাছ কতক সুতা গলায় ঝুলান হয় মাত্র, প্রকৃত উপনয়ন বা গায়ত্রীদীক্ষা আদৌ হয় না। কেবল মুখে বলা হয় মাত্র যে

সংস্কার হইল, কাজ কোথায়? সংস্কার শব্দের অর্থ জ্ঞান। সে জ্ঞান কল্পনা করিলে হইবে না, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ না হইলে সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। আজকাল উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে কোন সংস্কারই হয় না। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হইলে আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মের প্রার্থনা করিলে আচার্য্য যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে তিনি উপযুক্তকালে শিষ্যকে নিকটে আনয়ন করাইয়া শিষ্যের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। ইহাই প্রকৃত উপনয়ন বা সংস্কার। যিনি সেই তৃতীয় নেত্র দেখাইয়া দেন তিনিই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে। চক্ষুর বিষয় কল্পনা করিতে বলিলে হইবে না, তাহা দেখান চাই। শাস্ত্রেও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরুকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন, কেবল উপাধিধারী গুরুকে নহে।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া তৃতীয়চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। ঐরূপ গুরু আবশ্যক। উপনয়নের কার্য্য শেষ হইবার পরে তিনি শিষ্যকে গায়ত্রী ও প্রণবদীক্ষা দেন। ইহাই বেদপাঠ। নচেৎ বেদের মন্ত্র কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেই বেদপাঠ করা হয় না।—

ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

ন বেদং বেদইত্যাহু র্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যাবতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥
ন হোমং হোমইত্যাহুঃ সমাধৌ যত্তু হূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥
ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রকাশ। সেই পরাশক্তিই বেদমাতা গায়ত্রী এবং তাহারই দীক্ষার নাম গায়ত্রীদীক্ষা। সেই গায়ত্রী পক্ষীর ন্যায় কেবল মুখে আওড়াইলে হইবে না। ইহার সহিত যে কার্য্য আছে সেই কার্য্য না করিলে কিছুই হইবে না। প্রণব ওঁকার। এই শরীরকেই ওঁকার বলে এবং এই ওঁকাররূপ শরীরে যিনি রহিয়াছেন তিনিই বেদমাতা গায়ত্রী অর্থাৎ অজপা নামক গায়ত্রী।* সেই গায়ত্রীর উপাসনাই প্রাণায়াম, যথা—ওঁ ভূঃ (মূলাধার), ওঁ ভুবঃ (স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূল), ওঁ স্বঃ (মণিপুর-নাভিদেশ), ওঁ মহঃ (অনাহত-হৃদয়), ওঁ জনঃ (বিশুদ্ধ-কণ্ঠদেশ), ওঁ তপঃ (আজ্ঞাচক্র ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ), ওঁ সত্যং (সহস্রার—ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশ), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।* অর্থাৎ মূলাধারস্থ অপান বায়ুকে ক্রমান্বয়ে ষট্চক্র ভেদ করিয়া ভ্রূর ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে বিনা অবরোধে স্থির করিয়া রাখিলেই কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট অথচ কোমল জ্যোতি দর্শন হয়। ইহা সদ্গুরূপদেশগম্য এবং প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত কল্পনায় হয় না। প্রত্যক্ষ হইলেই

---

* গায়ত্রীতন্ত্র দেখ।

জানা হয় নতুবা জানা হয় না। কিন্তু বুঝাইয়া বলিবার জো নাই, কেননা সেই কোমল জ্যোতি দর্শনের পর যে অবস্থা তাহা সাধক কেবল নিজেই বোধ করিতে পারেন এবং তখন "জানি" বা "জানি না" এ দুইই থাকে না। বোবাকে সন্দেশ খাওয়াইলে সে যেমন সন্দেশ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না, তদ্রূপ যাহার সে অবস্থা হয়, তিনি তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারেন না। যাঁহার এরূপ অবস্থা হয় তিনিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, নতুবা কেবল গলায় সূত্রধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। গুরূপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠে এই সকল গুপ্ত বিষয় জানা যায় না বলিয়া ইহাকে গুরুমুখী বিদ্যা বলে। কেবল শাস্ত্রাদি দেখিয়া নিজের বুদ্ধিতে এই সকল কার্য্য করিতে গেলে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি এবং উৎকট ব্যাধি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই জন্য গুরূপদেশ ব্যতীত কাহারও ঐ সকল কার্য্য করা উচিত নয়। শাস্ত্রেও সেই জন্য উক্তরূপ শাসন বাক্য লিখিত আছে। নতুবা স্ত্রীশূদ্রাদিরা যে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না ঐ সকল শাসনবাক্যের কখনই এরূপ অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যাশ্চ শূদ্রাদ্যাবরজাতয়ঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সকলা স্তেষাং শান্তরূপাঃ সদা শুচিঃ॥
এষাং মধ্যে চ যা কাচিদাগত্য গুরুসন্নিধিম্।
প্রণম্য প্রার্থয়েজ্‌জ্ঞানং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্।
যদি ন দীয়তে তস্মৈ জ্ঞানং জ্ঞানবিশারদৈঃ।
তে জ্ঞাত্বা নরকং যান্তি গায়ত্রীরহিতাযথা।
ব্রহ্মজ্ঞানময়ং হেতদ্যাস্তি জাতিবিচারিণা॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতিগণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ যে কেহ গুরুর সমীপে আগমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে যদি জ্ঞানবিশারদ গুরু তাহাকে জ্ঞানদান না করেন তবে তিনি নরকগামী হন। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানময়—ইহাতে জাতি বিচার নাই। যখন পূর্ব্বাপর স্ত্রীশূদ্রাদিরা প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তখন এখনই বা কেন তাঁহারা উক্ত কার্য্যে অধিকারী না হইবেন বা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? অতএব তাঁহারা যে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন এবং করিলে কোন দোষ হয় না ইহা শাস্ত্র বা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। বরং যাহাতে সকলেই এই পথের পথিক হন তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিক সরল ভাবে দেখিতে গেলে শাস্ত্রীয় কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না, তবে নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য কূট অর্থের দ্বারা শাস্ত্রীয় মতের বিরোধ জন্মান অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহা কোন কাজের কথা নয়, কেননা তাহার দ্বারা কোন মীমাংসা হয় না, বরং যে ভ্রম সেই ভ্রমই থাকিয়া যায়। ইহাতে লাভ কি? মনে করুন, যদি দ্বিজবন্ধুগণ বেদের অধিকারী না হয়, তবে এখনকার দিনে বেদের অধিকারীই বা কে? দ্বিজ উপাধিধারিগণের মধ্যে দ্বিজবন্ধু নহেন কে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক এখনত প্রায় 'দ্বিজ' উপাধিধারীমাত্রেই দ্বিজবন্ধু। তাঁহারা যদি বেদের অধিকারী হইতে পারেন তবে স্ত্রী ও শূদ্রগণ কি দোষ করিল? দ্বিজবন্ধুভাবাপন্ন দ্বিজগণ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও শূদ্রগণকে যদি বেদের অধিকার হইতে

রক্ষিত করা হয়, তবে অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকল ত এককালে লোপ পাইবে। ইহাই কি উদ্দেশ্য ? যদি তাহা না হয়, তবে যদ্দ্বারা ভ্রম দূর হইয়া এই কথার মীমাংসা হয় এবং সত্য প্রকাশ হয় তাহাই কর্ত্তব্য।

আমরা সকলেই মালার ন্যায় একটী সূত্রে আবদ্ধ। এক্ষণে আমরা সেই সূত্র হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কে কোন পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই ! কষ্টের এক শেষ !! কোন বিষয়েরই ঠিকানা নাই। নানা দলেরও সৃষ্টি হইয়াছে, যথা,—কবিরপন্থী, নানকপন্থী, গোরক্ষপন্থী, দাদোপন্থী, রামাৎ, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য ইত্যাদি। এই সকল পথে পরস্পর মনের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং সময়ে সময়ে পরস্পর বিবাদ ও কাটাকাটি মারামারিই হইয়া থাকে। ইহাই কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ ?

মনে করুন যখন মহাত্মা কবির জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন কবিরপন্থী কোথায় ছিল ? অথবা মহাত্মা কবির কি নিজে বলিতেন যে "আমিই এই পথের আদি"। বোধ হয় কখনই তাহা বলিতেন না। কবির এমন অসাধু ছিলেন না যে নিজের মান নিজেই বাড়াইবেন। ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কবিরপন্থী কবিরের শিষ্যেরাই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ নানক গোরক্ষনাথ দাদো প্রভৃতি মহাত্মাদিগের শিষ্যেরাও স্ব স্ব গুরুর নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মারা যখন সংসার হইতে অপ্রকাশ হইলেন তখন তাঁহাদের কর্ম্মক্ষম উপযুক্ত শিষ্যেরাও গুরুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। কেবল

ভোজনক্ষম শিষ্যেরাই রহিয়া গেলেন, কারণ তাহাদের গুরুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা হয় নাই এবং তাহারা গুরুদত্ত কার্য্যও পায় নাই কেবল আড়ে আব্‌ডালে যাহা দেখিত তাহাই অনুকরণ করিত মাত্র। এইরূপ ভোজনক্ষম শিষ্যেরা মহাত্মাদিগের বাক্য বুঝিতে একেবারে অক্ষম, কেন না সাধুদিগের কথা বুঝিতে হইলে কর্ম্মক্ষম হওয়া আবশ্যক। কর্ম্মক্ষম না হইলে সাধুবাক্য বুঝা বড় কঠিন। সাধুদিগের প্রত্যেক কথাই ভাবে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাহারা অনুপযুক্ত তাহারা তাহা কিরূপে বুঝিবে? যাহাদের আত্মভাব নাই এবং সকল বিষয়েই অভাব, তাহাদের পক্ষে ভাবের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং তাহাদের দ্বারা অনিষ্টই হইতে লাগিল। পরস্পর মতভেদ এবং পরস্পর স্ব স্ব প্রধান। কেহই আর এখন শিষ্য নাই। সকলেই গুরু হইয়া উঠিল এবং নিজের নিজের মত আঁটিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ দলাদলি হইয়া উঠিল। যতদিন মহাসমুদ্রবৎ মহাত্মারা বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন কোন দল ছিল না। কারণ মহাসমুদ্রে কোন দল (পানাঝাঁজি বা পাটা বিশেষ) থাকে না। দল ডোবা পুষ্করিণীতেই থাকে। মহাসমুদ্রের অভাবে ডোবা পুষ্করিণী অনেক হইতে লাগিল এবং দলেরও অভাব রহিল না। দল হইলেই নাম ও রূপ চাই; নচেৎ পরস্পর চিনা কঠিন। সুতরাং স্ব স্ব গুরুর নামে নিজের নিজের দলের নাম হইল। পরিচ্ছদেরও রূপ-ভেদ হইয়া গেল। তাহাই ভেক এবং সেই ভেকের জ্বালায় সকল সম্প্রদায়ই অস্থির। কোন সম্প্রদায়েই শান্তি নাই। শান্তি হইবে কোথা হইতে? সাধন ব্যতীত শান্তি হইতেই

পারে না। সুতরাং গুরুর অভাবে সূত্রহারা হইয়া ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল এবং আর্য্যভূমি হইতে আর্য্যরত্নস্বরূপ মহাত্মা-দের অভাব হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল। যাঁহারা গুরূপদেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথচ গুরুর পশ্চাৎ গমন করিবার ক্ষমতা লাভ করেন নাই তাঁহারা কোন দলে না ঢুকিয়া নিবিড় কাননে গিরিগহ্বরে বা গৃহস্থাশ্রমে যিনি যেখানে রহিলেন তিনি সেই থানেই অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া গুরূপদেশ মত সাধন করিতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শিষ্যদিগের মধ্যে যদি কেহ কেহ উপদেশ পাইত এবং কেহ কেহ পাইত না তবে যাহারা উপ-দেশ পাইত না তাহাদিগকে কেমন করিয়া শিষ্য বলা যাইতে পারে? বস্তুতঃ তাহারা উপদিষ্ট শিষ্য নহে, কেবল উপদেশ-প্রার্থী মাত্র। সাধুদিগের সহিত উপদেশ প্রার্থী এরূপ অনেক লোক থাকে। তাহারা সাধুদিগের নাম করিয়া তৎশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াও থাকে। সুতরাং সাধারণের মনে সহ-জেই এরূপ ধারণা হয় যে ইহারা—অমুক সাধু বা অমুক ঋষির শিষ্য। এইরূপ শিষ্যেরা সাধুদিগের আশ্রমে থাকিয়া ভোজ-নাদি করিত এবং তাঁহাদিগের নিকট অনেক সময়ে অনেক প্রকার মৌখিক নৈতিক উপদেশও পাইত। সুতরাং তাহা-দিগকে শিষ্য বলায় দোষ কি? বিশেষ দোষ হইতেও পারে না। পরে গুরু যখন যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন তখন তাহাকেই প্রকৃত উপদেশ দিতেন এবং তিনিও সেই উপদেশ পাইয়া আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সাধন করিয়া

চলিতেন। যখন আর্য্যঋষি বা আর্য্য মহাত্মাগণ বর্ত্তমান ছিলেন তখন আর এরূপ নানা প্রকার পথ ছিলনা। তখন সকলেই একসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং সেই সূত্র দেখাইবার লোকও ছিল। সুতরাং তখন সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল এবং সেই ধর্ম্মই যথার্থ আর্য্যধর্ম্ম। ক্রমশঃ সেই আর্য্য-ধর্ম্মরূপ সুবর্ণরত্নে খাইদ মিশিয়া মিশিয়া এক্ষণে উহা কেবল খাইদেই পরিণত হইয়াছে। সেই খাইদ উড়াইতে না পারিলে খাটী সোণা বাহির হইবে না। প্রাচীনকালে আর্য্যসন্তানগণ যে সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন আমরা পুনরায় যদি সেই সূত্র ধরিতে পারি তাহা হইলেই ঐ খাইদ উড়িতে পারে নচেৎ নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক সেই সূত্র কি এবং কোথায়ই বা তাহা পাওয়া যায়। এই সূত্রই যে আমাদের প্রাণ* বেদ উপনিষৎ পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সূত্ররূপী ভগবান্ প্রত্যেক জীবে শ্বাসরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং সেই সূত্ররূপী নারায়ণকে অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের নিজ নিজ দেহের মধ্যে অন্বেষণ করা আবশ্যক। ভগবান্ যে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইবে না। প্রবাদ আছে যে মহর্ষি নারদ ত্রিতন্ত্রবিশিষ্ট বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতেন। সেই বীণাযন্ত্রটী কি? তাঁহার ন্যায় মহাত্মা যে সাধারণ লোকের মত কেবল এক সামান্য অলাবু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বীণাযন্ত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন ইহাই কি সম্ভব? কখনই নহে। এই শরীরই সেই বীণাযন্ত্র

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এবং ইহার মধ্যেই ঐ তন্ত্র আছে। সেই তন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় উহাকে ত্রিতন্ত্রী কহে এবং এই তিন তন্ত্রে স্বতই প্রণব ধ্বনি হইতেছে। প্রণব ওঁকার অর্থাৎ অ—উ—ম (ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর)। সুতরাং প্রণবের মধ্যেই বিষ্ণু অর্থাৎ "হরি" "হরি" ধ্বনি রহিয়াছে। নারদ সর্ব্বদাই সেই তন্ত্রে এইরূপ "হরি" "হরি" ধ্বনি করিতেন অর্থাৎ তাহাতেই মন লাগাইয়া ওঁকার ধ্বনি শুনিতেন। ইহাই বাজান এবং নারদ এই বীণাযন্ত্র ঐরূপে বাজাইতেন। বাস্তবিক এই শরীররূপ যন্ত্রের মধ্যে ঐ তন্ত্রে প্রাণরূপে ব্রহ্মসূত্র রহিয়াছে কিন্তু আমরা সেই সূত্রহারা হইয়া পড়িয়াছি। এই প্রাণই আপনার হরি এবং হরিই আপনার প্রাণ*। সেই জীবনস্বরূপ হরিতে লাগিয়া থাকুন তাহা হইলে আপনিও হরি হইয়া যাইবেন অর্থাৎ ত্রিতাপের নাশ হইয়া অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ অবস্থা অব্যক্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে উহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। সেই অব্যক্ত অবস্থা একমাত্র প্রাণের সাধনাদ্বারাই পাওয়া যায়। কেননা অব্যক্ত হইতেই প্রাণের উৎপত্তি*। সুতরাং এই প্রাণ ছাড়িয়া আমরা যাহা কিছু করিতে যাইব তাহাই অব্যক্ত হইতে দূর। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ সেই অব্যক্ত হইতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা অব্যক্তের যত নিকটে থাকিব ততই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব এবং যত দূরে যাইব ততই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইব, কোন ফলই হইবে না। আমরা যাহা কিছু করি তাহা মনের বশীভূত হইয়া করি কিন্তু সেই মনের ধর্ম্মই চঞ্চলতা। এক মুহূর্ত্তও উহা স্থির

---

* ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

থাকে না এবং এক বিষয়েও সর্ব্বদা থাকিতে চাহে না। সেই মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধনাদি কিছুই হইবে না। যদি বলা যায় ভগবৎসাধনে আবার মনঃস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা কি? মন স্থির হইল না বলিয়া কি ভগবৎসাধন হইবে না? ইহা স্বতঃই মনে উদয় হয় বটে, কিন্তু যদি আমার ব্যাকরণ বোধ না থাকে, তাহা হইলে সাহিত্য ও দর্শনাদি শাস্ত্রে কি আমার জ্ঞান জন্মিতে পারে? কখনই পারে না। ব্যাকরণ সকল শাস্ত্রের দর্পণস্বরূপ। দর্পণে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব বা স্থূল শরীরের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ ব্যাকরণের সাহায্যে সাহিত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের স্থূল অর্থ পরিগ্রহ হয়। স্থির মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এবং তদ্দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চঞ্চল মনের দ্বারা উহা কখনই সম্ভবে না। মনের স্থিরতার অভাবে উহার মলিনতা দূর না হইলে উহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছও হয় না। সুতরাং তাহাতে কোন জিনিসের প্রতিবিম্বও পড়ে না। সেই স্বচ্ছ মন যাহাতে লাগাইবেন তাহাতে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িবে। অতএব অগ্রে মন স্থির করা আবশ্যক, নচেৎ সব বৃথা। মনে করুন আমি কর্ণের দ্বারা একটী শব্দ শুনিতে বসিলাম; কিন্তু শব্দ শুনিবে কে? কর্ণ কখনই শব্দ শুনে না। অনেক সময় এমন হইয়া থাকে যে, আমি ঘরে বসিয়া কাগজ বা পুস্তক পাঠ করিতেছি অথচ সেই সময়ে ঘরের ভিতর ঘড়ি বাজিয়া গেল, আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে কর্ণ কখনও শব্দ শুনে না। কেবল কর্ণই যদি শব্দ শুনিত তাহা হইলে যখন ঘড়ি বাজিল তখন কি আমার কর্ণ ছিল না?

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তখন আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব হয় নাই। তবে শব্দ শুনিতে পাই নাই কেন? তাহার একমাত্র কারণ এই যে মন তখন অন্য বিষয়ে যুক্ত থাকায় ঘড়ির শব্দ উহা শ্রবণ করে নাই এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হওয়ায় কর্ণও তাহা শুনে নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অতএব অগ্রে মনকে স্থির করা আবশ্যক। মনকে এক বিষয়ে স্থির করিতে পারিলে সকল কর্ম্মই সুখসাধ্য হয়, নতুবা সবই বিফল—কোন কাজেরই হয় না এবং সকল কর্ম্মেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু মন স্থির হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। যাঁহার মন যে পরিমাণে স্থির অর্থাৎ যাঁহার একাগ্রতা যত বেশী তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান্। এই জন্যই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"

অর্থাৎ যাহার মন ব্রহ্মে যুক্ত নহে তাহার বুদ্ধি ও আত্মভাব নাই এবং যাহার আত্মভাব নাই তাহার শান্তি নাই ; যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায়? সুতরাং যাহাতে মন স্থির হয় অগ্রে তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। নতুবা যখন ষড়রিপু আক্রমণ করিবে তখন সাধন ভজন সবই পড়িয়া রহিবে, কিছুতেই উহাদিগের বেগ নিবারিত হইবে না। প্রাণায়াম ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ সংযত ও মন স্থির হয় না। অতএব প্রথমে প্রাণায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ঐ প্রাণায়ামের দ্বারাই ক্রমশঃ প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা॥
ধারণাদ্বাদশা প্রোক্তা ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ।
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে॥

ইতি গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ।

প্রাণায়াম উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে তাহার ১২টীতে প্রত্যাহার, ১৪৪টীতে ধারণা, ১৭২৮টীতে ধ্যান এবং ২০৭৩৬টীতে সমাধি হয়। ১৭২৮ প্রাণায়ামদ্বারা যে ধ্যানাবস্থা হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহার পরের অবস্থা বোধগম্য হয় এবং সেই পরাবস্থাটী যে কি, তৎসম্বন্ধে স্বতঃই মনে মনে প্রশ্ন ও বিচার হইয়া থাকে। সেই বিচারের নাম তর্ক। উহা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তাহার পর ২০৭৩৬ প্রাণায়ামদ্বারা আপনা আপনি ঐ তর্কের মীমাংসা হইয়া যে অবস্থা হয় তাহাকেই সমাধি এবং মুক্তাবস্থা কহে। সে অবস্থায় অহংজ্ঞান না থাকায় সর্ব্বত্র সমভাবের উদয় হয় অর্থাৎ তখন জগৎ আত্মময় দৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উপরি উক্ত নিয়মে যোগাভ্যাস করিলে যম নিয়ম আসন পরিত্যাগ করিতে হয় এবং ঐ সকল পরিত্যাগ করিলে অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত মতভেদ হয় অর্থাৎ যোগ অষ্টাঙ্গ থাকে না। যম নিয়ম আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। সুতরাং যম নিয়ম আসন বর্জ্জন করিয়া প্রাণায়াম অকরণীয়। প্রথমেই প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে যম নিয়ম আসন যে পরিত্যক্ত হয়—এমত নহে এবং

উহা শাস্ত্র বা যুক্তির বিরুদ্ধও নহে। শাস্ত্রেও ষড়ঙ্গ যোগের উল্লেখ আছে, যথা—

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে॥

অমৃতবিন্দূপনিষৎ।

প্রথমে যম নিয়ম অনাবশ্যক বোধে গোরক্ষনাথও যোগকে ষড়ঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতায় আছে—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥

ষড়ঙ্গ যোগ যে অশাস্ত্রীয় নহে তাহা উক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ইহাতেও মতভেদ আছে। সেই প্রভেদ এই যে উপনিষদে আসনের উল্লেখ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তর্কের উল্লেখ আছে এবং গোরক্ষসংহিতায় তর্কের পরিবর্ত্তে আসনের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ এ প্রভেদ প্রভেদই নহে। গোরক্ষসংহিতায় আসনের কথা মাত্র লিখিত আছে; সুতরাং যাঁহার যে আসন অভ্যস্ত তিনি সেইটী করিলেই তাঁহার গোরক্ষসংহিতার মতে কার্য্য করা হইল। ঘেরণ্ড সংহিতা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার সকলগুলিই যে করিতে হইবে বা আবশ্যক এমত নহে। ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন;—

"স্থিরসুখমাসনম্"

অর্থাৎ যাহাতে স্থির এবং সুখবোধ হয় এমত আসন করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। যে কোন রকম হউক এক রকম আসন করিলেই যখন চলিতে পারে তখন আসনের কথা অনাবশ্যক

বোধে উপনিষদে তাঁহার উল্লেখ নাই। আসনের পরিবর্ত্তে ধ্যানের পরের অবস্থা "তর্কের" উল্লেখ করিয়া যোগের ছয়টী অঙ্গ বজায় রাখিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতায় তর্কের বিষয় বলা নাই, কেননা ধ্যানের পর তর্ক আপনা আপনি স্বতই উদয় হয়, ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। বাস্তবিক ইহাতে মতভেদ কিছুই হয় না, তবে কূট তর্ক বা কূট অর্থের দ্বারা সবই হইতে পারে কিন্তু তাহা বিতণ্ডা মাত্র। ঐ বিতণ্ডায় কোন লাভ নাই। এইরূপ মতভেদের সামঞ্জস্য করিতে হইলে সদ্‌গুরুর উপদেশে ঐ সকল কার্য্য করিয়া নিজে বুঝিতে হয়। তখন ভাল মন্দ আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে এবং সব গণ্ড-গোলও মিটিয়া যায়। কেবল কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। তবে প্রাণায়াম ঠিক্ হওয়া চাই। প্রাণায়াম তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। প্রথম অভ্যাসীর প্রাণায়াম অধম, ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা মধ্যম এবং অবশেষে উত্তম হয়। সেই উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান তর্ক ও সমাধির অবস্থা ক্রমশঃ লাভ হইয়া প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়। এস্থলে আবার এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আসনের আবশ্যকতা না থাকিলেও যম নিয়মের আবশ্যকতা যে নাই তাহা কিরূপে বুঝিব? বস্তুতঃ যম নিয়ম যে পরিত্যাগ করিতে হইবে বা উহাদের আবশ্যকতা নাই একথা পূর্ব্বেও বলা হয় নাই। তবে প্রথমে যম নিয়মের অভ্যাস করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ ঐ গুলি প্রাণায়ামদ্বারাই সাধিত হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা যখন মনের ইচ্ছারনাশ হয় তখনই বাস্তবিক যম নিয়ম সিদ্ধ হয়। নচেৎ "আমি স্ত্রীপুত্র গৃহাদি বা যাবতীয় কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়াছি" কেবল মুখে এরূপ বলিলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না, যেহেতু ইহাতেও আমার নিজের ইচ্ছা রহিয়াছে অথবা কোন না কোন ফলের উদ্দেশে আমাকে ঐ সকল ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আজ কাল প্রায় সকলেরই একটা না একটা কামনা আছেই আছে। সুতরাং তাহাদের যে ত্যাগ তাহা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ত্যাগ। ইহাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যাইতে পারে না, কারণ গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

এই দেহ ধারণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করা যায় না, তবে যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনারহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী। আসক্তি থাকিলেই ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। আসক্তিসত্ত্বে কখনই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হওয়া যায় না। আসক্তিপূর্ব্বক ভোগ বা কর্ম্ম বন্ধের কারণ। বাসনাসত্ত্বে স্ত্রীপুত্র গৃহবস্ত্রাদি ও তৎসঙ্গে অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ফলমূলাহারী হইলেও প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না। উহা রাজসিক ও তামসিক ত্যাগের মধ্যে পরিগণিত। প্রাণায়াম দ্বারা যে অবস্থায় একেবারে ইচ্ছার নাশ হয় সেই অবস্থাই যথার্থ যম ও নিয়ম এবং সেই অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। আজকাল প্রায় অনেকেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া যম নিয়মের বহিরঙ্গ সাধন করিয়া থাকেন। তাহাতে কোন ফল হয় না, তবে লোক ভুলাইতে পারা যায় মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এরূপ ভ্রমধারণা আছে যে স্ত্রীপুত্র

গৃহরত্নাদি সাংসারিক বিষয় বৈভব পরিত্যাগ না করিলে কিছু-তেই ব্রহ্মচর্য্যাদি ভগবৎসাধন হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই ভ্রম। হায়, আমরা কি ভ্রমেই পড়িয়াছি!!! ভগবানের অপেক্ষাও আমাদের বুদ্ধি বেশী!!! যদি স্ত্রীপুত্র গৃহরত্নাদিই বন্ধের কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ সকলের সৃষ্টি হইল কেন? আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যেও অনেকেই স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি বেশী মনে করি বলিয়া, স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন ধারণ করিয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর বেশে বহুরূপী সাজিয়া এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়াই।

এক্ষণে দেখা যাউক সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ কি এবং শাস্ত্রেই বা সন্ন্যাসী কাহাকে বলে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন;—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং যোগী। নতুবা আমি আগুন স্পর্শ করি না বা কোন কর্ম্ম করি না বলিলে সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে পারা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে সন্ন্যাসীর উক্তরূপ যে লক্ষণ বলিয়াছেন এখন তাহা কৈ? আজকালের সন্ন্যাসী অন্যরূপ অর্থাৎ সমস্তই বিপরীত। স্ত্রীপুত্রধনরত্নাদি যদি বন্ধনের হেতু হইত এবং ঐ সকল ত্যাগ না করিলে যদি সন্ন্যাসী হওয়া না যাইত, তাহা হইলে ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম ও জনকাদি ঋষিরাও ত মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। অতএব স্ত্রী পুত্র বিষয়াদি বন্ধনের কারণ বলিতে গেলে,

পবিত্রহৃদয় ঋষিদিগকেও কলঙ্কিত করা হয়। সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধনের হেতু বা কারণ নহে। ঐ সকলের প্রতি আসক্তিই বন্ধের কারণ। মনে করুন, আমি না হয় স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত ত্যাগ করিলাম ; কিন্তু মনে মনে অহরহঃ ঐ সকলের যে চিন্তা রহিল, তাহা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা ত আমার নাই ; কারণ আমার ইন্দ্রিয় সংযম হয় নাই, সকল রিপুই বর্ত্তমান। যাহারা পরম শত্রু তাহাদিগকে যখন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই এবং তাহারা যখন আমার সঙ্গেই রহিল, তখন তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা আমার ন্যায় অসংযমী পুরুষের পক্ষে কি কখনও সাধ্য হইতে পারে ? যখন যে রিপু আমাকে আক্রমণ করে সে তন্মুহূর্ত্তেই আমাকে মোহিত করিয়া আপন কার্য্য চরিতার্থ করে। সুতরাং লোকলজ্জা বা রাজদণ্ডের ভয়ে অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত না হইলেও মনে মনে সকল কার্য্যই হইয়া যায়। অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত হইতেও দেখা যায়। ইহা কি মিথ্যাচার নহে ? এইরূপ কর্ম্মকেই ভগবান্ গীতাতে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকেন সেই মূঢ়াত্মাকে কপটাচার কহে। এরূপ কপট আচারে লাভ কি ? অতএব যাহাতে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহারই উপায় দেখা উচিত। কপটাচার ত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে আসক্তি আছে তাহা যাহাতে যায় তাহারই চেষ্টা

করা কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপদেশ পাইলে কিছুই ছাড়িতে হইবে না। আমাদের "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি"। কারণ বৈরাগ্যের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিতেই আমরা ব্যস্ত। আমাদের এমনই ভ্রম যে ঘর বাড়ী ছাড়িয়াই সংসার ছাড়িতে চাহিয়া থাকি। কিন্তু একথা একবারও ভাবি না যে সংসার কি এবং তাহা ছাড়িয়াই বা যাইব কোথা? যদি বলি বনে যাইব, তাহা হইলেই কি ঠিক্ উত্তর হইল? অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,—

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চ তাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥

বাসনাই সংসার—এই বিবেচনা করিয়া তুমি সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ কর। যেখানে সেখানেই অবস্থান কর না কেন, বাসনা ত্যাগেই সংসার ত্যাগ হয়। সুতরাং বনও সংসার ছাড়া নহে? থাকিবার জন্য এখানে যেমন দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহের আবশ্যক, বনেও তেমনি পর্ণ কুটীর অথবা পর্ব্বতগহ্বর কিম্বা অন্য একটী না একটী স্থানের আবশ্যক। তবে গৃহত্যাগ হইল কৈ? যাহা ছিল তাহাই ত রহিল। আসক্তি ছাড়িতে পারি নাই, সঙ্গেই আছে। সুতরাং দ্বিতল গৃহেও যেরূপ আসক্তি ছিল বনে আসিয়া পর্ণকুটীরেও সেইরূপ হইল। অতএব যখন দেখিতেছি যে আমার থাকিবার একটী স্থান চাই অথচ যেখানেই থাকিব সেই খানেই আসক্তি হইবে, তখন যাহা আছে তাহা ছাড়ি কেন? বরং যাহাতে সাধনার দ্বারা ঋষিদিগের ন্যায় আসক্তি-

শুদ্ধ হওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আসক্তির নাশ হইলে কর্ম্ম করিয়াও আবদ্ধ হইতে হয় না। রাজর্ষি জনক অনাসক্ত ভাবে সমস্ত রাজকার্য্য করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন নাই। আমাদের হয় ত এক ছটাঁক জমী বা দশকুড়ি টাকা পুঁজি মাত্র। জনকের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা ইহার জন্য এতই ব্যস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত যে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি "আমাদের সময় নাই, বড় কাজের ভিড়, দিবারাত্র ঝঞ্ঝট, সাধন ভজন করি কখন?" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলস্যে বিলাসিতায় গল্পে ও নাচতামাসায় আমরা কত সময় নষ্ট করিতেছি অথচ সে দিকে ভ্রূক্ষেপই করি না, কেবল ভগবৎসাধনের জন্যই সময় পাই না বলিয়া থাকি। সাধন ভজন করিবার যে ইচ্ছা নাই তাহা বলিতে পারি না, কেননা তাহা হইলে লোকসমাজে আমার ধার্ম্মিক উপাধি গ্রহণ করা হইবে না, অথবা লোকে নিন্দা করিবে বা লোকের কাছে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। সুতরাং বলিতে হয় যে সময় অভাবে কিছু করিতে পারি না। বাস্তবিক ইহা কেবল ওজর মাত্র এবং বাজে লোকের বাজে কথা। এ কথায় কিছু সার নাই। ইহাও মনে হইতে পারে যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সাধনাদি করিতে অন্য কোন বাধা না থাকিলেও নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক; সংসারে তাহা নাই। কেননা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ সর্ব্বদা নিকটে থাকায় মায়াবশতঃ প্রায় সকল সময়েই অনেক প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রাণায়ামাদি যোগসাধনের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। অতএব যোগসাধনের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা নির্জ্জন বনই ভাল

বস্তুতঃ এইরূপ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সাধনের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ আশ্রম আর নাই। এই জন্যই ঋষিদিগের অনেকেই পুত্রদারাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করিতেন। ভাবিয়া দেখুন, জগতে নির্জ্জন স্থান পাইব কোথায়? নির্জ্জন শব্দের অর্থ জনশূন্য, এমন স্থান কোথায়? বনে কি কিছু নাই? সেখানেও ত অনেক জীব জন্মিতেছে। তবে বনকে জনশূন্য কিরূপে বলি? ভাল. না হয় স্বীকার করিলাম যে বনে এমন স্থান আছে যেখানে কোন জীব জন্তু নাই কিন্তু তাহা হইলেও আমি ত আছি। আমি কি জীব নহি? অতএব আমি থাকিতে কোন স্থানই জনশূন্য হইতে পারে না। আমিত্বের লোপ হইলে বনে বা গৃহে যেখানেই থাকি না কেন সেই স্থানই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জ্জন। বরং গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা বনে আশঙ্কা আরও বেশী, যেহেতু ঐ স্থান হিংস্রজন্তুপূর্ণ। কোথাও বা শ্বাপদকুল ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা ভয়ানক অজগর সর্প সকল মুখব্যাদান পূর্ব্বক যেন জগৎকেই-গ্রাস করিবার উদ্দেশে ভীমমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে, আবার কোথাও বা মত্ত মাতঙ্গগণ বিকট রবে বনস্থল নিনাদিত করিতেছে এবং সেই বিকট নাদের প্রতিধ্বনিতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। সুতরাং তথায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত ভাবে থাকিতে হয়। কখন প্রাণ যায়, কখন কোন হিংস্র জন্তুর গ্রাসে পতিত হইতে হয় সর্ব্বদাই এই ভয়ে প্রাণ আকুল। যখন আমি সর্ব্বদা ভয়েই ব্যতিব্যস্ত তখন সাধন করিবে কে?

অপিচ—

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে র্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিন্নু করোত্যবদ্যম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ বিষয়মত্ত ব্যক্তি বনে গিয়াও সংসারেই থাকেন, যেহেতু সে ব্যক্তি সর্ব্বদা ছয়টী রিপুর সহিত অবস্থান করে; সুতরাং গৃহস্থাশ্রম জিতেন্দ্রিয় আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণের কি অনিষ্ট করিবে? পরন্তু যখন উদর ও ক্ষুধা সঙ্গেই আছে, তখন খাইতেই হইবে, অথচ আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে নাই। সুতরাং তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। লোকালয় নাই যে কাহারও বাড়ীতে অতিথি হইব। কাজে কাজেই ফলমূল ব্যতীত আর উপায় নাই। কিন্তু ঐ সকল ফলমূল অনায়াসলভ্য হইলেও হিংস্র জন্তুদ্বারা রক্ষিত বলিয়া আহরণ করা দুষ্কর। কেননা আহরণ করিতে গেলেই হিংস্র জন্তুগণ আমার হিংসা করিবে। কিন্তু যদি আমি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সাধনা দ্বারা হিংসা জয় করিয়া বনে আসিতাম, তাহা হইলে আর বনের পশুরাও আমার হিংসা করিত না। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বত্র বৈরত্যাগঃ।

অর্থাৎ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বত্রই বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ কেহই শত্রু থাকে না। হিংসা সর্ব্বত্র সমান। আমাতে যে হিংসাবৃত্তি আছে পশুতেও সেই হিংসাবৃত্তি আছে। এই উভয়ের বস্তুগত পার্থক্য কিছুই নাই। তবে পরিমাণের

তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুগত দুইই এক। সুতরাং হিংসাকে জয় করিতে পারিলে হিংসার দ্বারা আর আমার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তখন কোন হিংস্র জন্তু হঠাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহার মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখন তাহাকে আমার নিকট অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। যখন আমার হিংসা রহিয়াছে, তাহাকে জয় করিতে পারি নাই, তখন আমি বিপদ ভিন্ন আর কি আশা করিতে পারি? কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ইহারা পরম শত্রু। ইহারাও সঙ্গে আছে, ইহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া বনে আসি নাই। কাজে কাজেই কোন বিষয়ে সুখও পাইতেছিনা। সাধনের পথ পাই নাই যে, তদ্দ্বারা আত্মানন্দ অনুভব করিব। সুতরাং সর্ব্বদাই অসুখ ও সর্ব্বদাই অশান্তি। বনে সুখ না পাইয়া গৈরিক বস্ত্র, ত্রিশূল, চিমটা ও জটাজুটধারী হইয়া সাধু সাজিয়া আবার লোকালয়ে আসিলাম এবং বাহ্যদৃষ্টিতে লোকের কাছেও সাধু হইলাম। অনেকেই আমাকে সাধু সন্ন্যাসী বা স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল এবং আমিও তাহাদের কথায় অহংকারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলাম। এরূপ সন্ন্যাসী হওয়ায় লাভ কি? একেত আমি নিজে ঠকিলাম, তবে সাধুর ভাণ করিয়া আবার অপরকে ঠকাইবার চেষ্টা করি কেন? লোক ভুলাইবার জন্য নিজের অন্তরের কথা গোপন করিয়া "আমি বড় সুখে আছি," "গৃহস্থাশ্রমে এমন সুখ নাই" বা "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সাধন ভজন হয় না, সাধন-ভজন করিতে গেলে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া আমার ন্যায় সন্ন্যাসী হওয়া চাই" নিজের স্বার্থসিদ্ধির

জন্য এই প্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি। ঐরূপ না বলিলে দুই একটা চেলা বা সঙ্গী মিলে কৈ? কাজে কাজেই লোক সংগ্রহের জন্য এবং নিজের সেবার জন্য গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি কোন সাধু পুরুষের দর্শনলাভ হয় তাহা হইলে তিনি কখনই সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে বলিবেন না। বরং গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইলে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে ও বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইতে বলিয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন সময় হইবে তখন ঘরে বসিয়াই পাইবে, তবে ঘরে থাকিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা সর্ব্বদা অন্তরে রাখিবে ও সদ্‌গুরুলাভের চেষ্টা করিবে, এবং যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হইবে তাহা আনন্দের সহিত করিবে, কেননা 'কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মে কখনও তাচ্ছিল্য করিও না। সময় হইলেই সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান পাইবে এবং তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিয়া সুখী হইবে, নতুবা পণ্ডশ্রম—কিছুই লাভ হইবে না। কিন্তু এ সকল কথা শুনে কে? আমার গুরু হইবার ইচ্ছা আছে, তাই আবার লোকালয়ে আসিয়া সাধুর বেশ ধারণ ও সাধুর ভাণ করিয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বেও ছিলাম গৃহে, এখনও সেই গৃহে; আহারাদিও বেশ আছে। নাই কেবল বিবাহিতা স্ত্রী ও শাদা কাপড়। তদ্‌ব্যতিরিক্ত সবই আছে। তাহার উপর আবার স্বামী উপাধি ধারণ করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে আমি দাসেরও উপযুক্ত নহি অথচ স্বামী হইলাম। মুখেও বলিয়া থাকি আমি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যোগী সন্যাসী বা সাধু হইয়াছি। বেদান্তের ও যোগশাস্ত্রের

দুই চারি খানা পাতাও উল্টাইয়া যোগ শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইতেও শিখিয়াছি। বানপ্রস্থ পথাবলম্বন ব্যতিরেকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা কোন ফললাভ হয় না এইরূপ অসার ও অযৌক্তিক কত কথাই বলিয়া থাকি। বানপ্রস্থ অবলম্বন ব্যতীত যে কিছুই হয় না একথা বাস্তবিকই ঠিক্। কিন্তু সে বানপ্রস্থ কি? বা কাহাকে বলে? বানপ্রস্থ পদে দুইটী শব্দ আছে; যথা, বান+প্রস্থ। বান=বন+ষ্ণ; প্রস্থ=প্রকৃতরূপে স্থিতি। বানপ্রস্থ অর্থে বনে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি বুঝায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাহিরের বন বা অরণ্যে স্থিতিলাভ করা দূরে থাকুক্ তাহার নিকটেও যাওয়া যায় না এবং সাধুরাও সে বনে যাইতে উপদেশ দেন না বরং তাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে থাকিতেই বলেন। এরূপ স্থলে কি করা যায়? সাধুরা যখন গৃহে থাকিতে বলেন অথচ শাস্ত্রেও বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় রহস্য আছে। সে রহস্য সাধারণের জানা নাই। ভাল দেখা যাউক্ গৃহের নিকটে কোনও বন আছে কি না। সাধুবাক্য এবং শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে কেননা শাস্ত্রও আপ্তবাক্য। সুতরাং সাধুবাক্যে ও শাস্ত্রে অনৈক্য হইতেই পারে না। তবে আমরা আপ্ত হইতে পারি নাই বলিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি না। ব্যাকরণের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে যাহা হউক গৃহের নিকটে বন আছে কি না এস্থলে তাহাই আলোচ্য। বাহ্যজগতে যাহা কিছু আছে এই দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও সে সবই আছে।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌশশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥

সুতরাং বনে যাইবার জন্য দূরে গমন করিতে হয় না। এই দেহেই সেই বন আছে এবং কামাদি ছয় রিপু ও একাদশ ইন্দ্রিয়গণ হিংস্র জন্তুরূপে বাস করিতেছে। সেই জন্যই সাধকবর রামপ্রসাদসেনও সঙ্গীতচ্ছলে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে রমণ"।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥ ইত্যাদি

ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সাধকের এক ভাব এবং ব্যাকরণাদির দ্বারা সাধিত যে অর্থ তাহার আর এক ভাব। ব্যাকরণাদির সাহায্যে যে অর্থ বোধ হয়, তাহার দ্বারা কাজ না হইয়া কেবল বাগ্বিতণ্ডা ও তর্কবিতর্কই হইয়া থাকে। ষড়দর্শনাদি শাস্ত্রপাঠে এপর্য্যন্ত কাহারও ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। দেহের মধ্যে যে ষট্চক্র আছে ঐগুলি ভেদ করিয়া যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারই যথার্থ ষড়দর্শনের জ্ঞান,

হইয়াছে; নতুবা কেবল গ্রন্থপাঠে যে অদর্শন সেই অদর্শনই থাকে—কোন জ্ঞানই হয় না, কতকগুলি শব্দ মুখস্থ হয় মাত্র। যিনি কখনও চিনি খান নাই বা কখনও চিনি দেখেন নাই, তিনি যেমন চিনির গুণকীর্ত্তন শুনিয়া বা চিনির গুণ পুস্তকে পাঠ করিয়া চিনির মিষ্টতা বোধ বা চিনির জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তেমনি সাধনমার্গ অবলম্বন না করিয়া কেবল শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বেদ পুরাণাদি পাঠ করিয়া নারদেরই যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই তখন অন্যে পরে কা কথা।

সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হি॥
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্ব্বৈশ্চ শোকিতা॥

. ইতি পঞ্চদশী।

অর্থাৎ নারদ পুরাণের সহিত পঞ্চবেদ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্ববিৎ হইতে না পারায় শোকাকুল হইয়াছিলেন; বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে কেবল মাত্র ত্রিতাপে তাপিত ছিলেন, কিন্তু বেদাধ্যয়নের পর পাঠ বিস্মরণ, অবমাননা ও গর্ব্বহেতু তাঁহার মনের আরও অশান্তি হইয়াছিল। শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সদ্‌গুরুর উপদেশে কেবলমাত্র এক সাধনের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, নচেৎ নহে। সাধকবর রামপ্রসাদসেন যে পদ্মবনের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এই দেহের মধ্যেই আছে। অনেক সাধকও এই দেহকেই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ যে পদ্মবনের কথা

বলিয়াছেন, সেই পদ্মবন মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে আছে এবং সেই বনে হংসও বিচরণ করিতেছে। সে হংস পক্ষী নয়। উহা আমাদের প্রাণ, যাহা শ্বাসরূপে প্রতি ঘটে ঘটেই বিরাজ করিতেছে এবং যাহা জীবমাত্রেই প্রত্যহ ২১৬০০ বার অজপারূপে জপ করিতেছে। ইহার মধ্যে যে গুপ্ত রহস্য আছে, তাহা সদ্‌গুরু লাভ না হইলে অবগত হওয়া যায় না। গুরূপদেশে এই দেহরূপ বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিলাভ হইলেই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়। আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হইলেই ইচ্ছার নাশ হয় এবং ইচ্ছার নাশেই যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায়, নতুবা নহে। কিন্তু আমি ত এখন ইচ্ছার দাস; তবে কি একখানা গৈরিক বস্ত্র বা কৌপীন ধারণ করিয়াছি বলিয়াই সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক বা পরমহংস হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ—সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি? কেবল গৈরিক বস্ত্র ধারণ করাই কি সন্ন্যাস? তাহা হইতেই পারে না। সন্ন্যাস শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভগবান্ ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ। তাহা কি আমার হইয়াছে? যখন আমি ইচ্ছার দাস, সমস্তই নিজের ইচ্ছায় করিতেছি, এবং "আমি" "আমার" ও সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তখন আমার সন্ন্যাস কোথায়? তবে লোকে জানে আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু কাজে কিছুই নহি। কর্ম্মের সঙ্গে আমার খোঁজ নাই, কেবল শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মযোগ বা কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। কর্ম্মযোগ ব্যতীত যে সন্ন্যাস লাভ হয় না শাস্ত্রপাঠ করিয়াও তাহা আমার প্রাণে

হয় নাই। কেননা কোন যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া, অযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে করিয়াছি। কর্ম্মী ব্যতীত অপরের কাছে সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না। সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া কেবল ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সন্ন্যাস শব্দেরও ঐরূপ ভাষার্থ পড়িয়া নিজেও মজিয়াছি এবং অপরকেও মজাইতে চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেকেই কষ্ট পাইতেছেন। আজকাল যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥*
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা সমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজেন্নারকী ভবেৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, সমুদায় কর্ম্মের আসক্তি রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যাপারদর্শী ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। যিনি বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা, শিশু পুত্র-কন্যা এবং অসমর্থ বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন, তিনি নরকভাগী হন। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে যোগ ব্যতীত সন্ন্যাস হয় না—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া কঠিন কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে পান। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি এবং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য

জানিতে না পারায় আমাদের সকল কার্য্য এই প্রকার বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সকলের বিপরীত ফলও দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ—দণ্ডী কাহাকে বলে? দুই পাতা বেদান্ত পড়িয়া একটী বংশদণ্ড ধারণ করিলেই কি দণ্ডী হওয়া যায়? কখনই নহে। কর্ম্মযোগের আশ্রয় ব্যতীত দণ্ডধারণ হয় না। দণ্ড শব্দের অর্থ (দম=দমন করা) যদ্দ্বারা দমন করা যায়। এক্ষণে দেখা যাউক কি দমন করিতে হইবে। দণ্ডের দ্বারা যে শৃগাল কুকুর তাড়াইতে হইবে এমত বোধ হয় কখনই নহে। দণ্ড শব্দের অর্থে যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন হয় তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মযোগ ব্যতীত শাস্ত্রাদিপাঠে বা কথায় ইন্দ্রিয়দমন হয় না। কর্ম্মই ব্রহ্ম, যাহা জীবমাত্রেই অজপারূপে বিরাজ করিতেছে। সেই অজপারূপ কর্ম্মই দণ্ড এবং সেই দণ্ড যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনিই দণ্ডী; নচেৎ একটী বংশদণ্ড ধারণ করিলে দণ্ডী হয় না।

মৌনাহনীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্নভবেদ্ যতিঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১শ স্কন্ধ॥

অর্থাৎ মৌন, অনীহা (নিস্পৃহতা) এবং অনিলায়াম (প্রাণায়াম) এই তিনটী বাক্য দেহ এবং চিত্তের দণ্ড (নিয়ামক); এই তিনটী যাঁহার নাই তিনি যতি ন'হন; কেবল মাত্র বেণুদণ্ড (বংশদণ্ড) ধারণ করিলেই যতি হয় না। বংশদণ্ডধারী আমার ন্যায় দণ্ডীর দ্বারা দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়তঃ—ব্রহ্মচারী কে? যিনি ভগবান্ ব্রহ্মে বিচরণ করেন অর্থাৎ যাঁহার মন সর্ব্বদাই শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মে লাগিয়া আছে, তিনিই ব্রহ্মচারী। ঐরূপ হওয়াও কর্ম্মযোগ সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগের দ্বারা মন যখন ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মে যুক্ত হয় তখনই ব্রহ্মচারী, নচেৎ গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কেবল ফলমূলাহার ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না। উক্তরূপ আহারে ইন্দ্রিয়গণের দমন না হইয়া বরং উত্তেজনাই হইয়া থাকে। সুতরাং আমার ন্যায় কর্ম্মশূন্য এইরূপ ব্রহ্মচারীর দ্বারা জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা কিরূপে সম্ভবে?

চতুর্থতঃ—পরিব্রাজক শব্দেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য ঐরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেরূপ পরিব্রাজক অতি বিরল। আজকাল আমার ন্যায় ভেকধারী পরিব্রাজকের অভাব নাই। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য অর্থের জন্য লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই!! একটা গৈরিক আল্‌খাল্লা গায়ে দিয়া এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়ানই কি পরিব্রাজকের ধর্ম্ম? পরিব্রাজক শব্দের অর্থ কি? শব্দার্থ দেখিতে গেলেও দেখা যায় যে, পরিব্রাজক = পরি (সর্ব্বতোভাবে) + ব্রজ (গমন করা) + অক অর্থাৎ যিনি সর্ব্বতোভাবে গমন করেন। এখন দেখা যাউক কোথায় যাইতে হইবে। দেশ বিদেশ পর্য্যটনই কি উদ্দেশ্য? তাহা কখনই হইতে পারে না; কেননা দেশ বিদেশ বা তীর্থ ভ্রমণে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে;—

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে॥

অর্থাৎ এই তীর্থ এই তীর্থ করিয়া তামসিক জনেরাই ঘুরিয়া বেড়ায়; হে বরাননে! আত্মতীর্থ যিনি জানেন না তাঁহার মোক্ষ কোথায়?

অতএব এখানে গমন শব্দে ভগবান্ ব্রহ্মে মনের লয় করিবার জন্ত দেহস্থিত ষট্‌চক্রপথে গমনাগমন বুঝিতে হইবে। দেহের মধ্যেও একটী দেশ আছে; তাহাকে উপদেশ কহে। সেই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই ধ্যানাবস্থা পাওয়া যায়। ইহা কর্ম্মযোগ সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগের সাহায্য ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। সাধারণতঃ পরিব্রাজক উপাধি ধারণ করা কঠিন নহে, কিন্তু কর্ম্ম করিয়া পরিব্রাজক হওয়া বড় কঠিন। শাস্ত্রে পরিব্রাজকের যে সকল লক্ষণ ও কার্য্য বলিয়াছেন আমার ন্যায় পরিব্রাজকের ত সে সকলের কিছুই নাই। যথা—

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্নং ব্রহ্মমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতা দ্রোহসমতা সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সংবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং সুখদুঃখাবিকারিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণাধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেব পরিব্রাড্‌ধর্ম্ম উচ্যতে॥

ইতি গরুড় পুরাণ।

এই সকল লক্ষণ নিজের সঙ্গে মিলাইলেই আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়। তখন কেহ পরিব্রাজক বলিয়া ডাকিলে আমার মুখে আর কথা সরে না।

পঞ্চমতঃ—সন্ন্যাসী দণ্ডী প্রভৃতির যেমন অবস্থা পরমহংসেরও তদ্রূপ অবস্থা অর্থাৎ নামে পরমহংস, কাজে নহি। পরমহংস এই

শব্দের অর্থবোধ আমার নাই। হংসেরই যখন ব্যুৎপত্তি জানা নাই তখন পরমহংসের তাৎপর্য্য জানিব কিরূপে? কর্ম্মযোগ বা আত্মকর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত পরমহংসের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হংস এই মন্ত্র জীব দিবারাত্রে ২১৬০০ বার জপ করিতেছে। কর্ম্মযোগের দ্বারা এই হংস স্বতঃ স্থির হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরমহংসের অবস্থা অর্থাৎ হংসের অতীত অবস্থা। কর্ম্মযোগের দ্বারা যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনিই পরমহংস এবং তিনি সকলেরই প্রণম্য। কিন্তু কৈ আমার ত তাহা লাভ হয় নাই, তবে আমি পরমহংস কিসের? কেবল মুখের পরমহংস—কাজের নহি। আমার ন্যায় এই প্রকার কর্ম্মশূন্য পরমহংসের আজকাল অভাব নাই।

মুখে না হয় বলিলাম "আমি সকল কর্ম্মই ত্যাগ করিয়াছি" কিন্তু বস্তুতঃ আমার কোন কর্ম্মেরই ত্যাগ হয় নাই, কেননা আমি সকল কর্ম্মই আসক্তির সহিত করিয়া থাকি। এরূপ স্থলে আমার কর্ম্মত্যাগ কোথায়? কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি আমার কর্ম্ম জানা থাকিত তাহা হইলে আর আমাকে আসক্তির অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিতে হইত না। কর্ম্ম যে ত্যাগ করা যায় না, তাহা আমি জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে আর ওরূপ করিতাম না। কেহ কেহ বলিতে পারেন "কর্ম্ম আবার ত্যাগ করা যায় না, মনে করিলেই ত ত্যাগ করা যাইতে পারে"। কিন্তু মনে করুন আমি কোন কর্ম্ম করিলাম না, বসিয়া রহিলাম। তাহাতেই কি আমার কর্ম্মত্যাগ হইল? কথনই না, কারণ অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও

জন্মের সহিত আমি যে প্রাণকর্ম্ম পাইয়াছি, তাহা ত বন্ধ হয় নাই। আমি ইচ্ছা করি বা না করি উহার আর বিরাম নাই—চলিয়াছেই। যাহা করা যায় তাহাই যখন কর্ম্ম, তখন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণটাও আমার কর্ম্ম। এই কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

ইতি গীতা।

অর্থাৎ দেহিগণ নিঃশেষরূপে কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন। তবে আমার কর্ম্মত্যাগ কোথায়? অতএব কর্ম্মত্যাগ করিতে হইলে অগ্রে প্রাণের কর্ম্ম স্বতঃ রহিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রাণকর্ম্ম রহিত হইলে কর্ম্মত্যাগ আপনা আপনিই হইবে। তখন আর ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে না। ত্যাগ করাটা কি ইচ্ছা নহে? আমি ত্যাগ করি কেন? অবশ্যই আমার কোন না কোন ভবিষ্যৎ কামনা আছে, যে জন্য আমি ত্যাগ করিতেছি। কিন্তু ইচ্ছাই যখন বন্ধের কারণ, তখন এইরূপ ত্যাগের দ্বারা কখনই আমার মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। কেননা ঐরূপ ত্যাগে কখনই ইচ্ছার নাশ হয় না। একটা বিষয় ত্যাগ করিতে না করিতেই মন অমনি আর একটীতে আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত ত্যাগ করিতে হইলে অগ্রে ইচ্ছার নাশ করা চাই। প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই সেই ইচ্ছার মূলীভূত কারণ। অতএব

কর্ম্মযোগের দ্বারা প্রাণের সেই চঞ্চলতা দূর করিয়া তাহার স্থিরত্বসাধন করিলে তবে ইচ্ছার নাশ হইতে পারে—নচেৎ নহে। প্রাণ স্বতঃ স্থির হইলে প্রাণকর্ম্মও রহিত হইয়া যাইবে এবং প্রাণকর্ম্ম রহিত হইলে জ্ঞানোদয়ে ত্যাগও আপনা আপনি হইবে। তখন আর নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে না। নতুবা বেদ,বেদান্ত,পঞ্চদশী ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন মাত্র করিয়া যদি বলা যায় যে "কর্ম্মযোগ আবার কি? জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্মযোগে কিছুই হয় না এবং সেই জ্ঞান শাস্ত্রাদির পাঠ ও আলোচনার দ্বারা হইয়া থাকে" তাহা হইলে ধৃষ্টতা বা বাতুলতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কেননা সাধন ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠে এপর্য্যন্ত কাহারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উপস্থিত কালের পণ্ডিতগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাধুশ্রেণীভুক্ত হইতেন কিন্তু কৈ তাহা ত দেখা যায় না। বরং এরূপ অনেক দেখা যায় যে সাধু শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই লেখা পড়া না জানিয়া বা শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়াও কেবল মাত্র আত্ম-কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কেবল কতকগুলি কথা শিখা যায় মাত্র,—ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক কথা মুক্তির কারণ নহে, সদ্গুরূপদিষ্ট সাধন অর্থাৎ কর্ম্মযোগই মুক্তির কারণ। জলপানেই পিপাসা দূর হয়—জল জল করিয়া চীৎকার করিলে পিপাসা মিটে না। তদ্রূপ শাস্ত্রাদিপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, বরং বৃথা বাক্যব্যয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা না হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিকতাই আসিয়া

আছে। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাঁহার হৃদয়ে সদাই শান্তি বিরাজ করে ; কিন্তু আজ কাল কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরই ত তাহা দেখা যায় না। বরং শান্তির পরিবর্ত্তে অভাবই দৃষ্ট হয়। শান্তি সাধনের ধন ; বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ অগ্রে কর্ম্মযোগের আশ্রয় ত্যাগ করিলে শান্তি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতে হয়। অতএব প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ না করিয়া যাহাতে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ হয় স্বতঃ পরতঃ অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। নতুবা কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া বা বহুরূপীর ন্যায় সন্ন্যাসীর বেশধারণ করিয়া জ্ঞান জ্ঞান ধ্যান্ ধ্যান্ করিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

> ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্মত্যাগেই) সিদ্ধি (ইচ্ছা রহিত অবস্থা) পাওয়া যায় না। ইচ্ছা রহিত না হইলে ত্যাগ হয় না, ত্যাগ না হইলে শান্তি হয় না এবং শান্তি ব্যতীত সুখ হয় না। "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্" (গীতা ২য় অঃ ৬৬ শ্লোক) অর্থাৎ শান্তি ব্যতীত সুখ কোথায় ? কর্ম্মযোগের অভ্যাস-দ্বারা যখন সাধ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন অর্থাৎ অনুভব হয় তখনি তাহা জানা হয়। সেই জানার নামই জ্ঞান। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা কল্পনা বা অন্যের কথা মানিয়া লওয়া মাত্র। সুতরাং তাহাতে সন্দেহভঞ্জন না

হইয়া সময়ে সময়ে বরং বিপরীত ফলই দেখা যায়। যে সকল মহাত্মার দ্বারা শাস্ত্র সকল প্রণীত, তাঁহাদের প্রকৃত ভাব অবগত হওয়া বড় কঠিন। কারণ, তাঁহারা যে সকল ভাব বা অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন তাহা কর্ম্মী ব্যতীত অপরের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব এই জন্যই অজ্ঞানীরা "নানা মুনির নানা মত" এই কথা বলে এবং শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ একই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কখনও মতভেদ হইতেই পারে না *। তাঁহাদের মতভেদ আছে বলিলে প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে আমাদের মতভেদ রহিয়াছে বলিয়া আমরা সকল ঋষির একমত দেখিতে পাই না। আমরাই ভেদজ্ঞানপূর্ণ, সুতরাং নানা মুনির নানা মত দেখিয়া থাকি। যাহার যেমন ভাব তিনি তেমনি বুঝিয়া থাকেন—যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি করিতেন, তখন যশোদা মনে করিতেন "গোপাল, ননী খাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া, আমায় ডাকিতেছে"; গোপবালকগণ মনে করিত "কানাই গোচারণের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন"; ধেনু বৎসগণ মনে করিত "আমাদের গোষ্ঠে বা মাঠে যাইবার সময় হইয়াছে, তাই রাখাল কানাই ডাকিতেছে"; এবং সাধকগণ মনে করিতেন যেন প্রণবধ্বনি হইতেছে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এক বই দুই রকম নহে, অথচ যাহার

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দেখ।

যেমন ভাব সে সেই ভাবেই বুঝিয়া লইত। সেইরূপ ঋষিদিগের বাক্যার্থ এক, কিন্তু আমাদের যাহার যেমন ভাব আমরা সেইরূপই বুঝিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ চৈতন্য সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সকল ঘটে প্রকাশ নহেন। যে সকল ঘটে প্রকাশ তাঁহারাই ঋষি। তাঁহাদের আর নানা মত নাই। আমরা জড়বুদ্ধি, এজন্য আমরা নানা মত দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করা অপেক্ষা পাঠ না করা ভাল। কেননা শাস্ত্রপাঠে যদি আমার সংশয়চ্ছেদ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, তাহা হইলে আর আমার শাস্ত্রপাঠে আবশ্যক বা ফল কি?

আরও দেখুন, যখন শাস্ত্র অনন্ত এবং জীবের আয়ু অল্প, তখন এত সময়ই বা কৈ যে সমুদায় পড়িয়া শেষ করি? অতএব শাস্ত্রের যে সারভাগ তাহাই আশ্রয় করা উচিত। উত্তর গীতাতে ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

> অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
> স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
> যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
> হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য অনেক; আয়ুঃ অল্প এবং বিঘ্নও বহু—এস্থলে, জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধপানের ন্যায় (ঐ অনন্তের মধ্যে) সারাংশটুকুই অবলম্বনীয়। একমাত্র যোগীরাই সেই সারটুকু জানেন। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত আছে—

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাৎ চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া নবনীতরূপ সারভাগ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল অর্থাৎ অসার ভাগ লৌকিক পণ্ডিতেরা পান করেন। নতুবা শাস্ত্রপাঠ করিয়া যদি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া না যায় তাহা হইলে ইহার তুল্য কষ্ট আর নাই। যথা—

আলোচ্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥

ইতি উত্তরগীতা।

দর্ব্বী শব্দের অর্থ হাতা। হাতা যেমন সকল অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়াও তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমার ন্যায় জড়বুদ্ধি মানব শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; অথবা গাধা যেমন চন্দনের বোঝাই বহিয়া থাকে তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যিনি সার জানেন না তিনি গাধার ন্যায় ভারই বহন করেন মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই, কেননা যুক্ত না হইলে বুদ্ধি স্থির হয় না। স্থিরবুদ্ধি ব্যতীত কোন

কার্য্যও হয় না। অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি চঞ্চল। চঞ্চল বুদ্ধি থাকা না থাকা সমান। ইহাতে এমন বোধ হইতে পারে যে, তবে কি শাস্ত্র অপাঠ্য? না, তাহা মনে করা ভুল। একমাত্র কর্ম্মযোগ যে আত্মজ্ঞান লাভের মূলকারণ শাস্ত্র তাহার সাক্ষীস্বরূপ—ইহাতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মে। কারণ, আমি গুরূপদেশে যে কর্ম্ম পাইয়াছি সেই কর্ম্ম যে ঋষিদিগের অনুমোদিত, এবং অভ্রান্ত, শাস্ত্র তাহা দেখাইয়া দেয়। যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠ করিলে উহা অপাঠ্য নহে। কারণ, যুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রের সারভাগ দেখাইয়া দিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়া থাকেন। পরে ঐ কর্ম্মযোগের প্রভাবে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইতে পারা যায়। নচেৎ শাস্ত্রপাঠ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত ধ্যানাবস্থা পাওয়া যায় না। ধ্যানের পর সমাধি বা যুক্তাবস্থা। সেই ধ্যান করি কাহার? যাঁহার বিষয় ভাবনা বা চিন্তা করিব তৎসম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। বরং তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এবং লোকের মুখে নানা কথাই শুনিতে পাই। কেহ বলেন তিনি সাকার, কেহ বলেন তিনি নিরাকার, কেহ বা তাঁহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সুতরাং আমরা পরস্পরের মত খণ্ডন করিবার জন্য বিষম তর্ক ও গণ্ডগোল করিয়া থাকি এবং অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য নানা কূটতর্কের অবতারণাও করিয়া থাকি। সত্যের প্রতি আমার লক্ষ্য নাই, কেবল তর্কে জয়ী হইবারই চেষ্টা। মিথ্যাকে সত্য সাজাইতেও

কুণ্ঠিত নহি। নিজে বুঝিনা অথচ অপরকে বুঝাইবার জন্য ব্যাকুল। গলাবাজিতেও খুব মজবুত। শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অস্তি নাস্তি সম্বন্ধে এরূপ ঘোর আন্দোলন করিয়া থাকি যে, আমার গগনভেদী চীৎকারে ও বক্তৃতায় দিক্ সকল কম্পিত হইয়া থাকে। বিচারে কাহাকেও জয়ী হইতে দিব না ইহা আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। অথচ তিনি সাকার কি নিরাকার কিম্বা তাঁহার অস্তিত্বই নাই এ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নাই। কিন্তু কোট্ বজায় রাখিবার জন্য হয় ত বলিয়া থাকি, তিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, একমাত্র, এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ভাল, না হয় স্বীকার করিলাম যে তিনি একমাত্র, সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিরাকার তাহা হইলেও এস্থলে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে—প্রথম বাস্তবিক তিনি একমাত্র কি না? এবং দ্বিতীয়—তাঁহার আকার বা রূপ আছে কি না? তিনি যদি একমাত্র হইলেন তবে আমি কে? আমি থাকিলেই দুই হইল এবং দুই হইলেই বহুরাশিতে পরিণত হইল। তাহা হইলে আর একমাত্র থাকিল কৈ? ইহাতে না হয় বলিলাম যে তিনি একমাত্র, আমি পৃথক্ বা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একটী পদার্থ এবং আমার কার্য্য তাঁহার উপাসনা করা। কিন্তু ইহাও ভ্রান্তবাক্য। কেননা পুত্র যেমন পিতা হইতে পৃথক্ নহে, তদ্রূপ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও আমি তাঁহা হইতে পৃথক্ নহি। পুত্র পিতার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে হইলেও পৃথক্ নহে, কারণ পিতাই পুত্র, পুত্রই পিতা অর্থাৎ পুত্র পিতার রূপান্তর মাত্র—

"আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ"।

অর্থাৎ স্বশরীরস্থ আত্মা বা স্থিরপ্রাণ শুক্ররূপে ভার্য্যার জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে" ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

এই কারণে জ্ঞানের চক্ষে "রমণী জননী, জননী রমণী" এই বাক্যটীও অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শুক্রধাতুই আমাদের প্রাণ এবং স্থির প্রাণই আত্মা।

"শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।"

ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র।

প্রাণই যে আত্মা তাহা পূর্ব্বে প্রমাণের সহিত বলা হইয়াছে *। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব এরূপ স্থলে আমি তাঁহা হইতে পৃথক্ বা তাঁহার সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে একটী পদার্থ, একথা বলা সম্পূর্ণ অজ্ঞানের কার্য্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে, এখন আমাদের যে "আমি" আছে উক্তভাবে সে "আমি" থাকে না। এখন যে "আমি" রহিয়াছে সেই "আমির" অহংভাবের নাশ হইলে তবে তিনি "একমাত্র" অর্থাৎ যখন "একমাত্র" বলিবারও লোক থাকে না তখনই "একমাত্র"। নচেৎ এক বলিতে গেলেই দুই বলা হইল, কেননা যিনি এক বলেন তিনি এক এবং যাঁহাকে বলেন তিনি এক—এই দুই। অতএব আমার "আমি" থাকিতে তাঁহাকে একমাত্র বলা নিতান্ত ভ্রম। উপরে বলা হইয়াছে যে তিনি নিরাকার, কিন্তু তিনি যদি নিরাকার হন তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা কেমন

---

* ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়া করা যায়? উপাসনা শব্দের অর্থ সেবা আরাধনা বা পূজা। যাঁহার আকার বা রূপ নাই তাঁহার ধরি কি এবং সেবাই বা করি কিরূপে? এস্থলে না হয় বলিলাম সেবার অর্থ শুশ্রূষা নহে, তাঁহার বিষয় চিন্তা করার নামই সেবা। কিন্তু ইহাও এক প্রকার অসম্ভব। কেননা তিনি যদি নিরাকার হন তাহা হইলে তাঁহার চিন্তা করি কিরূপে এবং কেই বা চিন্তা করে? প্রথমতঃ, আমরা যে সকল বিষয় চিন্তা করি সেই চিন্তা মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানবের মন অবলম্বন ব্যতীত চিন্তা করিতেই পারে না। সুতরাং আমাদের চিন্তার বিষয়মাত্রেরই একটা না একটা রূপ আছেই আছে। এরূপ স্থলে আমার নিরাকার বস্তু চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া সাকার হইয়া পড়িল। নিরাকারের জ্ঞান আমাদের আদৌ নাই। শূন্যই একমাত্র নিরাকার বস্তু এবং উহা আমাদের সম্মুখেই আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের লক্ষ্য নাই এবং উহা দেখিতেও পাওয়া যায় না। "আমি শূন্য দেখিতেছি" একথা বলা আমার নিতান্ত ভ্রম। কেননা আকাশ বা শূন্য দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্রই মেঘই আমার নয়নগোচর হয়। মন এক সময়ে দুই বস্তু দেখিতে পারে না। সুতরাং যখন মেঘ দেখিতেছি, তখন আমার শূন্যদর্শন হইল না। যেহেতু শূন্যের কোন রূপ নাই। আমি যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন পদার্থই আমার নয়নপথে আসিয়া পড়ে, শূন্যদর্শন হয় না। তদ্রূপ নিরাকারের চিন্তা করিতে গেলে, মনে নানা বিষয়ের চিন্তাই আসিয়া

উদয় হয়। সুতরাং মন সেই সকল বিষয়েরই চিন্তা করে, নিরাকারের চিন্তা হয় না। কর্ম্মযোগ ব্যতীত বিনা অবলম্বনে মন স্থির হয় না। মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই এই যে, সে কখনও এক বিষয়ে স্থির থাকে না। এরূপ স্থলে আমার নিরাকারের উপাসনা হইল কৈ? কেবল তর্কের অনুরোধে মুখে বলি মাত্র যে তিনি নিরাকার। বস্তুতঃ জড়বুদ্ধি মানবের পক্ষে নিরাকারের উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা চিন্তা করিতে গেলেই রূপ আসিবে, রূপ আসিলেই সাকার হইল, এবং সাকার হইলেই আর নিরাকার রহিল না। ইহাতে না হয় বলিলাম যে আমি কোন রূপের চিন্তা করি না, আমি তাঁহার গুণের ও কার্য্যের চিন্তা করি এবং সেই গুণের কীর্ত্তন করিয়া থাকি। প্রথমতঃ, এই কথায় তাঁহাকে সগুণ করা হইল, এবং সগুণ হইলেই তিনি সামান্য মানবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তবে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার না হয় দশটা ক্ষমতা বেশী আছে এই মাত্র। রাজা যেমন মনে করিলেই আমাদের দণ্ড দিতে পারেন অথবা দুই দশ টাকা পুরস্কার দিয়া আমাদের কিছু উপকার করিতে পারেন, তিনিও না হয় সেইরূপ করিতে পারেন। তবে রাজা প্রত্যক্ষ থাকিতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উপাসনার আবশ্যকতা কি? রাজার উপাসনা করিলেই ত আমরা সুখী হইতে পারি? ইহাতে না হয় আমি বলিব যে, যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রাজা তিনি আমাদের ও আমাদের রাজারও রাজা এবং আমাদের মৃত্যুর পর বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার পূজা বা উপাসনা করা উচিত। বাস্তবিক কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা

ভাল এই মাত্র। যেহেতু ভগবৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা যায় তাহাই ভাল। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবহেতু ইহাতেও প্রায় অনেকেরই ঘোর সংশয় ও অবিশ্বাস হইতে দেখা যায়। এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তিনি পাপ পুণ্যের সৃষ্টি করেন কেন? পাপ কার্য্যের সৃষ্টি না হইলে ত আমি পাপ করিতাম না। যখন পাপের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন উহা যে তাঁহারই অভিপ্রায়েই হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। আমি যখন বানররূপী জীব তখন ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের বিষয় সম্মুখে পাইলেই গ্রহণ করিব। জীবমাত্রেরই এই ধর্ম্ম। তবে "বেঁধে মারে না সহে ভাল" এই জন্যই দণ্ডের ভয়ে অতি কষ্টে ভোগপিপাসা সহ্য করি মাত্র। কিন্তু ইহাই কি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কর্ত্তব্য? তিনি ত আমাকে কেবল সৎ ইচ্ছা দিলেই পারিতেন। তাহা হইলে ত আমার এরূপ কুপ্রবৃত্তি হইত না, এত কষ্ট ভোগও করিতে হইত না। যদি বলি জগৎ জীবের পরীক্ষাস্থল, পরীক্ষা দিবার জন্যই আমরা জগতে আসিয়াছি, তাহা হইলেও ভগবানে দোষ অর্শে। কেননা পরীক্ষা দিব কাহার কাছে? যিনি আমার কোন বিষয় অবগত নহেন তাঁহার কাছে বরং একদিন পরীক্ষা দেওয়া সম্ভবে, কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার নিকট আমি কি পরীক্ষা দিব? তিনি কি আমার বিষয় কিছুই জানেন না? যদি না জানেন তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? সুতরাং পরীক্ষার কথা বলিতে গেলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায় দোষ পড়ে। সেবাদি করিলেই তিনি পাপ তাপ শোক দূর করেন বলিলেও তাঁহাতে দোষ হয়, কেননা যে

তাঁহার সেবা পূজা বা স্তুতি করে, তাহাকেই তিনি ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করেন, আর যে তাহা না করে তাহাকে তিনি উদ্ধার করেন না। তাহা হইলে ত তিনি তোষামোদপ্রিয় সামান্য মানবের ন্যায় হইলেন। সুতরাং ইহাতেও তাঁহাতে দোষ অর্শে। এক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই নিষ্কলঙ্ক বস্তুতে এইরূপে নানা কলঙ্কের আরোপ করা হয়। অতএব নিরাকারের উপাসনা বা চিন্তা করা আমার বাতুলতা নয় কি? এরূপ স্থলে আমার সাকার উপাসনা মন্দ হইলেও অকরণীয় নহে। কেননা এই সাকার উপাসনা দোষযুক্ত হইলেও স্বল্পবুদ্ধি মানবের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপকল্পনা ও সাকার মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। কল্পনাই মিথ্যা, তবে সেই সাকার মূর্ত্তির যে সমস্ত পূজাবিধি আছে তৎসমুদায়েই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাহার মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগক্রিয়া সকল নিহিত আছে। সেই সকল কার্য্যের প্রকৃত অনুষ্ঠান হইলে আর সাকার কল্পনা করিতে হয় না, কোন মূর্ত্তিও গঠন করিতে হয় না। জড়বুদ্ধি মানবকে কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই মূর্ত্তিগঠন প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মযোগদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে আর কোন বাদ থাকে না। নতুবা সাকার নিরাকার এ দুইই কল্পনা। ভগবান্ সাকারও নহেন, নিরাকারও নহেন; তাঁহাকে সাকার বলাও দোষ, নিরাকার বলাও দোষ। কেননা তিনি অব্যক্ত, কথায় তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না। সাকার বা নিরাকার অথবা ব্রহ্ম, হরি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি উপাধির দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না;

যেহেতু ঐ সকল উপাধি বা শব্দ তিনি নহেন, তিনি যাবতীয় উপাধিরহিত ও শব্দাতীত। জল এই শব্দটী যেমন জল নয় এবং জল জল করিয়া চীৎকার করিলে যেমন পিপাসা মিটে না, তেমনি আমরা যে কিছু উপাধি বা শব্দ দ্বারা সেই অব্যক্ত পরাশক্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকি সে সকল উপাধি বা শব্দ তিনি নহেন এবং মুখে ঐ সকল উচ্চারণ করিলে তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানও হয় না। তবে বাল্যকাল হইতে আমরা যাঁহাকে যাহা বলিতে অভ্যাস করিয়াছি তাঁহাকে সেই নাম বা উপাধি দিয়া ডাকি এই মাত্র। যাহার যে ভাষা সে তাহার ভাষানুরূপ নাম দিয়া থাকে। ভাষা বা বুলি ভিন্ন হইলেও বস্তুগত ভগবান সেই একই পদার্থ। ভাষা বা নাম অনুসারে তিনি ভিন্ন নহেন। কিন্তু ভাষা এক না হইলেও যখন বস্তুর জ্ঞান হয় তখন যেমন সব বিবাদ মিটিয়া যায়, তদ্রূপ ভগবদ্‌-বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই সাকার, নিরাকার, ব্রহ্ম, হরি, দুর্গা, কালী ইত্যাদিরূপ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত কেবল কথায় ঐ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইতেই পারে না। কেননা জ্ঞানের চক্ষে দেখা যায় যে, তিনি সাকারও নহেন নিরাকারও নহেন, অথচ তিনি সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন। সাকার নহেন অথচ সাকার ইহার তাৎপর্য্য এই যে যত দিন তিনি আমাতে আছেন অর্থাৎ যত দিন "আমি" আছি ততদিন তিনি সাকার এবং যখন আমার "আমি" নাই তখন তিনি নিরাকার। এইরূপ তিনি পূর্ণও নহেন অংশও নহেন। তাঁহাকে পূর্ণ বলিলেও দোষ, অংশ বলিলেও দোষ। অসীম পদার্থকে সসীম করিলেই

তাঁহার অসীমত্বের নাশ হয়। সুতরাং তিনি পূর্ণও নহেন অংশও নহেন। তেমনি তিনি রূপও নহেন শব্দও নহেন, কারণ তিনি রূপ ও শব্দের অতীত। এই প্রকার তিনি সকল পদার্থের বা বিষয়েরই অতীত অথচ সকল পদার্থে বা বিষয়েই রহিয়াছেন। কিন্তু সকল পদার্থ তাঁহাতে নাই—যেমন তিনি আমাতে রহিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহাতে নাই অর্থাৎ আমার মন তাঁহাতে নাই। আমার মন যদি সেই পরাশক্তিতে থাকিত তাহা হইলে আর আমার দেহাভিমান থাকিত না। যখন দেহাভিমান রহিয়াছে তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহাতে আমার লক্ষ্য নাই। কাজে কাজেই সকল বিষয়েই আমার অশান্তি। ইচ্ছাই এই অশান্তির প্রধান কারণ; ইচ্ছার নাশ না হইলে কখনই অশান্তি দূর হইবে না। ইচ্ছার নাশ হইবে কিরূপে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মন হইতেই ইচ্ছার উৎপত্তি। সেই মন স্থির না হইলে ইচ্ছার নাশ হইতে পারে না। এখন আমার মন নানা বিষয়ে রত এবং অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় শুঁড় বিস্তার পূর্ব্বক ইচ্ছার বশীভূত হইয়া "আমি কর্ত্তা" "আমি জ্ঞানী" "আমি পণ্ডিত" "আমি রূপবান্" "আমি গুণবান্" "আমি ধনবান্" "আমি বলবান্" ইত্যাকার নানা প্রকার মদ অহরহঃ পান করিতেছে। কাজে কাজেই মত্ততাও যাইতেছে না। কিন্তু যদি আমি আমার শরীরস্থ সেই মহাশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম, তাহা হইলে আমার মন স্থির হইয়া আমার অহং ইত্যাকার জ্ঞান ও দেহাভিমানও বিনষ্ট হইয়া যাইত। প্রত্যক্ষ

জ্ঞানের অভাবেই তাহা হইতেছে না। ইচ্ছার বশীভূত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। হায়, কি পরিতাপের বিষয়, ইচ্ছার নাশ না হইলে যে আমার ভোগের নাশ হইবে না, তাহা আমার জানা নাই!! অথচ আমি সুখলাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে তাহাও জানি না। দুঃখকে সুখ এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছি। এইরূপ উল্‌টা রাস্তায় পড়ায় আমার প্রাণ সর্ব্বদাই অস্থির। আমার বুদ্ধি ও ধারণা এমনি বিপরীত হইয়া গিয়াছে যে যদি কেহ আমায় বুঝাইয়া দেন যে আমি উল্‌টা রাস্তায় চলিতেছি ও সেই জন্যই আমার এত কষ্ট হইতেছে এবং সোজা রাস্তায় চলিলে আমার সকল কষ্ট দূর হইবে কোন কষ্টই থাকিবে না, তাহা হইলেও আমার সে ভ্রম কিছুতেই নষ্ট হয় না। এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কল্পিত সুখের প্রত্যাশায় নানা কৌশলে আমি সেই সুখলাভের জন্য সদাই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু হায় কি দুঃখের বিষয় আমার প্রকৃত সুখের ধারণাই নাই। আমার সুখের ধারণা—রাজ-অট্টালিকায় বাস করিব, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিব, চতুর্দ্দিকে দাস দাসী ও পরিজনবর্গ বেষ্টন করিয়া আমার সেবা করিবে, রজতমাণিক্যের অপ্রতুল থাকিবে না, স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিব ইত্যাদি। এবম্বিধ নানা বিষয় লাভের ইচ্ছায় মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সুতরাং আমিও অশান্তিসাগরে মগ্ন। তবে এখানে এরূপ মনে হইতে পারে যে, ঐ সকল বিষয় যদি আমার না থাকে এবং আমাকে ঐ সকল পাইবার চেষ্টা করিতে হয়,

তাহা হইলে আমার অশান্তি হইতে পারে; কিন্তু আমার যদি ঐ সকল সম্পত্তি থাকে বা অনায়াসলভ্য হয়, তাহা হইলে আর আমার অশান্তি কি? তখন ত আমার অবিরাম সুখের অবস্থা। বাস্তবিক যদি আমার ধন বা ঐশ্বর্য্য না থাকে তাহা হইলে আমার ঐরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু উহা যে আমার ভ্রম তাহার আর সন্দেহ নাই। কেননা মনের নির্ম্মল আনন্দই যদি সুখ হয়, তাহা হইলে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও আমার সুখ কোথায়? বোধ হয় তখনও জগতে আমার ন্যায় দুঃখী আর দ্বিতীয় নাই; যেহেতু, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি মনে সুখ বা শান্তি পাই না। তবে দেঁতোর হাসি হাসিয়া দিন কাটাই মাত্র। মনকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আমি কখনও গানে, কখনও নাচে, কখনও বা রসালাপে সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকি; কিন্তু যখন যাহাতে মিশি কিছুতেই নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারি না। বরং মনে সর্ব্বদা বিষয়চিন্তা জাগরূক থাকায় সব সুখেরই অবসান হইয়া যায়। মনে হয় "এই অতুল ঐশ্বর্য্য আমি কাহাকে দিয়া যাইব," "আমার অবর্ত্তমানে ইহা কে ভোগ করিবে", "পুত্র হয় ত সব নষ্ট করিয়া আমার নাম পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিবে" ইত্যাদি। রোগ শোক ও চিন্তায় শরীর এবং মন জর্জ্জরিত হওয়ায় হয় ত আমি জীবদ্দশায় নিজেই ভোগ করিতে অক্ষম, কেবল যক্ষের মত কতকগুলি টাকা আগলাইয়া থাকি মাত্র। কাহাকেও বিশ্বাস নাই পাছে কেহ ঠকায় বা ফাঁকি দেয়। হায় আসক্তির কি মোহিনী শক্তি!!! তাহার কুহকে পড়িয়া শরীর ও মন

এইরূপ নানা চিন্তায় জীর্ণ শীর্ণ ও জর্জ্জরিত হইলেও আমার চৈতন্য হয় না। কেহ ভাল কথা বলিলেও বিরক্ত হইয়া উঠি, এবং কোন ভাল লোকও নিকটে আসিলে ভীত হই, পাছে সে কিছু অর্থ প্রার্থনা করে। সেই ভয়ে সকলের সহিত আলাপ করি না, যাহা কিছু করি তাহা কেবল যশঃপ্রত্যাশায় বা সম্ভ্রমরক্ষার জন্য। ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। কামনা ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই করি না। এক খানা চিট্‌কে থালা, সামান্য আতব তণ্ডুল ও একটা কাঁচা কলা উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ প্রার্থনা করিয়া থাকি। মনে করি এখানে ত বিষয় হইতে কোন সুখই হইল না, তবে দুই চারি পয়সায় যদি স্বর্গলাভ হয় তাহা হইলে মন্দ কি? বেশী পয়সা খরচ করিতে প্রাণে কষ্ট হইলেও স্বর্গসুখের প্রলোভনে পড়িয়া সময়ে সময়ে তাহাও করি। মনে করি স্বর্গসুখ না জানি কেমন। কিন্তু স্বর্গেও যে সুখ নাই, তাহা আমার জানা নাই, জানা থাকিলে বোধ হয় স্বর্গকামনা করিতাম না।

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শিবসংহিতা, ১ম পটল।

অর্থাৎ স্বর্গেও পরস্ত্রীদর্শনাদিজনিত দুঃখসম্ভোগ হইয়া থাকে। অতএব এই সংসার যে দুঃখময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইতে পারে যে স্বর্গেও সুখ ও শান্তি নাই। মনে করুন, একটী পাখী সোণার ডাঁড়ে হীরার শিকলে বাঁধা

আছে ও আহারাদিও রাজভোগ পাইতেছে এবং আর একটী পাখী লোহার ডাঁড়ে লোহার শিকলে বাঁধা আছে ও অতি কষ্টে দিনান্তে দুইটা শুক্‌না ধান ও একটু জল খাইয়া কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া আছে। এই পাখী দুইটার মধ্যে সুখী কোন্‌টী? অবশ্যই বলিব যে, যে পাখীটী সোণার ডাঁড়ে হীরার শিকল পরিয়া রাজভোগ আহার করে সেইই সুখী এবং অপরটীর যখন দিনান্তে অতি কষ্টে আহারীয় যুটি-তেছে তখন তাহার আবার সুখ কোথায়? কিন্তু ইহা কি আমার ঠিক্‌ উত্তর হইল? আমি যে ভ্রমে অন্ধ হইয়া প্রকৃত সুখ বুঝি না, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বাস্তবিক উভয় পাখীর মধ্যে কোনটীই সুখী নহে, কেননা উভয়েই বাঁধা আছে, কোনটীই মুক্ত নহে। তবে উভয় বন্ধনের তারতম্য এই—যেমন দেওয়ানী কারাগার (Civil jail) আর ফৌজদারী কারাগার (Criminal jail)। জেলখানার ভোগরূপ দণ্ড শেষ হইলে যেমন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থালী কর্ম্ম করিতে হয়, তেমনি স্বর্গ ও নরক এ দুইই ভোগের স্থান এবং ভোগের অবসানে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয়। এরূপ কর্ম্মে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আসক্ত হন না। তবে আমি প্রকৃত সুখ অবগত নহি বলিয়া আসক্তির সহিত কাম্যকর্ম্ম দ্বারা শিকল পায়ে দিয়া নিজেকে সুখী মনে করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার না এখানে না স্বর্গে কোথাও নিস্তার আছে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ গীতা ৯ম অধ্যায় ॥

এই জন্য যাঁহারা যোগী তাঁহারা স্বর্গ ও নরককে তুল্য জ্ঞান করিয়া ঐ উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকেন। পরিত্যাগের কারণ এই যে, ভোগসত্বে কখনও শান্তি হইতে পারে না। সুখদুঃখের অতীত অবস্থাতেই শান্তি হয়। সেই শান্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও বাঞ্ছিত। কেবল যোগীরাই তাহা লাভ করিয়া থাকেন। হায় আমরা এমন শান্তিসুখে বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অমৃতবোধে কি অসার বিষয়-বিষ ভক্ষণ করিতেছি!! সেই বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সর্ব্বদাই অশান্তি ভোগ করিতেছি। এরূপ স্থলে সুখ হইবে কোথা হইতে? অতএব আপাততঃ রমণীয় ও মনোমুগ্ধকর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ও দুঃখকর সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃত শান্তিপথের পথিক হওয়া উচিত নয় কি? শান্তিপথের পথিক হইতে হইলে কর্ম্ম-যোগের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কর্ম্মযোগ ব্যতীত শান্তিলাভ হইতেই পারে না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শাস্ত্রের অনেক স্থলে যখন কর্ম্মযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি? অপরন্তু কর্ম্মযোগ বা হঠযোগের অভ্যাসীরা যে সকল

উৎকট আসন ও নেতি ধৌতি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা করা দূরে থাকুক্ তাহার কথা শুনিলেও ভয় হইয়া থাকে। বাস্তবিকই ঐ সকল কার্য্য অকরণীয় না হইলেও আজকাল অকরণীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সচরাচর উক্ত কার্য্য সকল যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, শিক্ষার দোষে তাহা বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্যই কেবল সাধারণের ধারণা হইয়াছে যে, হঠযোগের দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট লাভের আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত গুরুর অভাবে হঠযোগের রহস্য অবগত হইতে পারা যায় না। শাস্ত্র দেখিয়া করিতে গেলেই পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা আছে। শাস্ত্রপাঠে যদি আমার এই ধারণা হয় যে, হঠযোগের দ্বারা দেহের মল পরিষ্কার করিতে না পারিলে চিত্ত নির্ম্মল হইবে না, তাহা হইলে উহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। কেননা দেহের মল পরিষ্কারে মনের ময়লা কখনই দূর হয় না। তাহাও না হয় স্বীকার করা যাইত যদি দেহকে একেবারে মলশূন্য করিতে পারা যাইত। দেহের রক্ত না থাকিলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, মলশূন্য হইলেও তদ্রূপ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য বৈদ্যশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে—"মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ" অর্থাৎ মলভাণ্ড চালনা করিবে না। অতএব ধৌতিক্রিয়া দ্বারা দেহের মল ধৌত করিতে গেলে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে। মনে করুন আমি যদি নিত্য জোলাপ গ্রহণ করি তাহা হইলেও ত আমার মল পরিষ্কার হইতে পারে। তবে আমার ধৌতির আবশ্যকতা কি? নিত্য জোলাপ লওয়াও যেমন অস্বাস্থ্যকর, নিত্য ধৌতিও তদ্রূপ। জোলাপ বা ধৌতির দ্বারা

মলনির্গমন করাও এক রকম ব্যাধিবিশেষ। এই জন্য যাঁহারা নিত্য ধৌতিক্রিয়ার অভ্যাস করেন, তাঁহাদের পরিপাক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া শেষে-একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি অর্দ্ধ ছটাক চালের পায়স পরিপাক করিবারও শক্তি থাকে না। সুতরাং মৃত্যু ক্রমশঃ নিকট হইয়া আইসে। ইহাতে "লাভঃ পরং গোবধঃ" হয় মাত্র; কেননা, না ঐহিক না পারলৌকিক কোন দিকেরই সুখ হয় না। দুই দিকই অন্ধকার। মল পরিষ্কারের সঙ্গে উভয় দিকের সুখস্বচ্ছন্দতা শেষ হইয়া মন ঘোর অশান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়। শাস্ত্রে যে ধৌতির উল্লেখ আছে তাহা এরূপ বাহ্য ধৌতি নহে। বাহ্য ধৌতির দ্বারা মন কখনই নির্ম্মল হয় না। মন নির্ম্মল করিতে হইলে অন্তর্ধৌতি আবশ্যক। অন্তর্ধৌতি প্রাণায়াম সাপেক্ষ এবং প্রাণায়াম সদ্গুরূপদেশগম্য। উপস্থিতকালে আমাদের দেশে যেরূপ প্রাণায়াম চলিত আছে তাহা প্রকৃত প্রাণায়াম নহে। কেননা তাহাতে কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুরোধ করিতে হয়। স্বভাবের গতি রোধ করায় এ প্রকার প্রাণায়ামে দেহ ব্যাধিমন্দির হইবার আশঙ্কা আছে।

বালবুদ্ধিভিরঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈঃ ত্যাজ্যঃ।

ইতি ঋগ্বেদভাষ্য।

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি লোকে যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলিদ্বারা নাসাচ্ছিদ্র রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকে তাহা সাধুগণের পরিত্যাজ্য।

ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু লাভ হইলে জানা যায় যে প্রকৃত প্রাণায়ামে বায়ুরোধ করিতে হয় না। হঠযোগ শব্দের অর্থেও ঐরূপ প্রাণায়ামই বুঝায়। হঠযোগের অর্থ বাহ্য নেতি ধৌতি প্রভৃতি ক্রিয়া নহে।

হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে॥

ইতি গোরক্ষনাথ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি।

হশ্চ ঠশ্চ হঠৌ সূর্য্যচন্দ্রৌ তয়োর্যোগো হঠযোগঃ, এতেন হঠশব্দবাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগলক্ষণং সিদ্ধম্।

ইতি ব্রহ্মানন্দকৃত হঠযোগপ্রদীপিকাভাষ্য।

হ শব্দের অর্থ সূর্য্য, ঠ শব্দের অর্থ চন্দ্র এবং যোগ শব্দের অর্থ মিলন। এই চন্দ্র সূর্য্যের মিলন করার নামই হঠযোগ অর্থাৎ প্রাণায়াম। দক্ষিণ নাসিকায় (পিঙ্গলায়) যে বায়ু বহে তাহাই সূর্য্য এবং বাম নাসিকায় (ঈড়ায়) যে বায়ু বহে তাহাই চন্দ্র। এই উভয়ের যখন মিলন হয় অর্থাৎ যখন বাম ও দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ুর গতি থাকে না, তখন বায়ু বিনা অবরোধে স্বতঃ স্থির থাকে এবং তখনই চন্দ্র সূর্য্যের যোগ অর্থাৎ মিলন হয়। যদ্দ্বারা এইরূপ মিলন হয় তাহাই হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ। ঐ স্থিরের উপর মন রাখার নামই রাজযোগ বা সাংখ্যযোগ। সুতরাং কর্ম্মযোগেও যে গতি সাংখ্যযোগেও সেই গতি অর্থাৎ উভয়েরই স্থিতি এক। ইহা শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানদ্বারা কখনই লাভ হইবে না। কর্ম্মযোগের অভ্যাস ব্যতীত ইহা

লাভ হইতেই পারে না। সকলেই এই কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিতে সমর্থ এবং সকলেই ইহার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

যুবা বৃদ্ধোঽতিবৃদ্ধো বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোঽপি বা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগেষ্বতন্দ্রিতঃ॥
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
ন শাস্ত্রপাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
ন বেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং ন চ তৎকথা।
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥

ইতি হঠপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ যুবা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা দুর্ব্বল ইহারাও অনলস হইয়া যোগাভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করে। যোগসাধন করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, যোগানুষ্ঠান-বিরত ব্যক্তির সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? কেবল মাত্র শাস্ত্রপাঠে সিদ্ধি হয় না; বেশধারণ বা শাস্ত্রীয় কথা সিদ্ধির কারণ নহে। ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহা সত্য এবং ইহাতে সংশয় নাই। অতএব "কর্ম্মযোগ নিকৃষ্ট, রাজযোগ বা সাংখ্য-যোগ উৎকৃষ্ট" এ কথা কোন কাজেরই নহে, ইহা কেবল কথার কথা মাত্র। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা এই উভয়কেই তুল্য অর্থাৎ উভয়েরই গতি সমান বলিয়া থাকেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

ইতি গীতা।

বাস্তবিক কর্ম্মযোগের অভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান ব্যতীত কিছুরই মীমাংসা হয় না। এই জন্যই সেই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আজ দেশের এই দুরবস্থা দেখা যায়। চতুর্দ্দিকেই অমঙ্গল, চতুর্দ্দিকেই ধর্ম্মবিভ্রাট, যাঁহার যাহা মনে আসিতেছে তিনি তাহাই বলিতেছেন, এক পক্ষ অপর পক্ষের মত খণ্ডন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সাকারবাদী নিরাকারবাদীর এবং নিরাকারবাদী সাকারবাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন। দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীর মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিতেছেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, ইহার দ্বারা যে নিজের ও অপরের অনিষ্ট হইতেছে তাহা বুঝিতেছেন না। কেননা সকলেই যখন শাস্ত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন, তখন শাস্ত্রের কোন্ কথাটী ঠিক্ বলিয়া মানিব? শাস্ত্রীয় একটী মতও খণ্ডন করিলেই শাস্ত্র ভ্রান্ত হইল। কারণ যে মতটী খণ্ডন করা হইল তাহা কি আপ্তবাক্য নয়? তাহা যদি আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাকার নিরাকার দ্বৈত অদ্বৈত বাদ সকল ত আপ্তের দ্বারাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ স্থলে যদি কোন একটী বাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপ্তবাক্যে আর কাহারও বিশ্বাস থাকিবে না। কিন্তু আমি পাণ্ডিত্যাভিমানের দোষে আপ্তবাক্য খণ্ডন করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি নিজেই যে ভ্রান্ত

তাহা আমি জানি না। তাহা জানিলে আর কোন মতে আপ্তবাক্যের খণ্ডন করিতে যাইতাম না। অতএব কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া সেই পরাশক্তির সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয়েই যেমন ভ্রান্ত, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীও তদ্রূপ। কিন্তু আপ্তবাক্য অভ্রান্ত। তবে যে আপ্তবাক্য ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে, আমি নিজেই ভ্রান্ত। আমি যদি ভ্রান্ত না হইতাম তাহা হইলে আর পরস্পরে বাদানুবাদ করিয়া আত্মবিচ্ছেদ করিতাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এমনই ভ্রমান্ধ হইয়াছি যে যাঁহাকে বাদের মধ্যে আনিতেছি তিনি স্বয়ং যে বাদাতীত অর্থাৎ কোন বাদের মধ্যেই নহেন তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যখন বাদাতীত বস্তুকে বাদের মধ্যে আনিতেছি, তখন আমার শাস্ত্রজ্ঞান বা সাধুতা কোথায়? আমার যদি সেই পরাশক্তির প্রকৃত জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে আর তাঁহাকে বাদের মধ্যে আনিতাম না। বাদের মধ্যে পড়িয়া নিজেই ত কষ্ট পাইতেছি, আবার তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করি কেন? ইহা কি আমার ভ্রম নহে? অতএব যাঁহারা দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদ লইয়া ঝগড়া বা দলাদলি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উচিত দলাদলি ছাড়িয়া যাহাতে যথার্থ কাজ হয়, তাহারই চেষ্টা করা। দলাদলিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এখন আর আমাদের ঝগড়া করিবার সময় নহে। আরও কথা এই যে, দ্বৈত অদ্বৈত সম্বন্ধে আমার যে

জ্ঞান আছে তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। উহা কেবল আনু-মানিক জ্ঞান মাত্র। আনুমানিক জ্ঞান সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। এরূপ স্থলে আনুমানিক জ্ঞান লইয়া পরস্পরে বিরোধ ও বাগ্‌বিতণ্ডা করা আমার উচিত নহে, বরং যাহাতে সকল বাদের মীমাংসা হয় তাহাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই মীমাংসার চেষ্টা করে কে? চেষ্টা করিতে গেলেই আমাকে ছোট হইতে হইবে, কিন্তু ছোট হওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন; কেননা আমি লোকের কাছে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং আমার দ্বারা মীমাংসা হওয়া দুরাশা মাত্র; যেহেতু একপক্ষ নিরস্ত না হইলে মীমাংসা হইতে পারে না, অথচ নিরস্ত হইলে লোকের কাছে আমার মান যাইবে বলিয়া নিরস্তও হইতে পারি না। সুতরাং একটা না একটা বাদ অবলম্বন করিয়া তাহা সমর্থন করিবার জন্য নানারূপ শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি—যখন যাহা পাই তাহাই-প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দ্বৈত অদ্বৈত সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বুঝিনা। অতএব দেখা যাউক দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ কাহাকে বলে।

প্রথমে দ্বৈতবাদেরই আলোচনা করা যাউক। দ্বৈত-বাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা জীবাত্মার পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন। ইঁহারা মুখে জাতিভেদ বা পরমাত্মার সাকাররূপ স্বীকার করেন না, কিন্তু কার্য্যে সবই করিয়া থাকেন। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা

হইয়াছে তাহাতেই ইহা বিস্তৃতরূপে বুঝান হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। নিরাকারের উপাসনা নাই, উপাসনা করিতে গেলেই সাকার আসিয়া পড়ে। সুতরাং আমায় নিরাকার বলা কেবল মুখের কথা, কাজের কথা নহে। জাতিভেদ স্বীকার করি না একথা বলাও আমার ভ্রম, কেননা আহারাদি ভিন্ন আমার অন্যান্য প্রায় সকল কার্য্যেই জাতিভেদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। জাতি সম্বন্ধে যদি আমার অভেদ জ্ঞানই থাকিত, তাহা হইলে দলাদলি থাকিত না। আরও কথা এই যে, যখন আমার গোজাতি, পশুজাতি, স্ত্রীজাতি, পুংজাতি ইত্যাদি জ্ঞান রহিয়াছে তখন জাতি সম্বন্ধে আমার অভেদ জ্ঞান কোথায়? সর্ব্বত্রই জাতিগত প্রভেদ দেখিতেছি। তবে যে জাতিভেদ স্বীকার করি না তাহা কেবল নিজের সুবিধার জন্য। আমার নিজের সুখের কোন ব্যাঘাত হই-লেই জাতিভেদ বাহির হইয়া পড়ে। যখন আমার "আমি" "আমার" বোধ রহিয়াছে তখন অভেদ ভাব হইতেই পারে না। তবে যে অভেদ বলিয়া থাকি তাহা কেবল লোক ভুলাইবার বা দলপুষ্টির জন্য, নতুবা মনে আমার অভেদ ভাব নাই। জাতিভেদ এইরূপে অস্বীকার করায় দেশের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট কিছুই হইতেছে না। ইহাতে দেশের নরনারীগণ ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া কালে দেশ অশান্তির আবাসস্থল হইয়া উঠিবে। অতএব এইরূপ জাতিভেদ অস্বী-কার করা অপেক্ষা জাতিভেদ স্বীকার করা বরং শ্রেয়ঃ। জাতিভেদ প্রথা যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা উঠিয়া গেলে দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তবে ধর্ম্মগত

প্রভেদ হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ হইলে দেশের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এমত স্থলে জাতিভেদ প্রথা রহিত করা, উচিত কিংবা উহা রাখা উচিত তাহাই দেখা যাউক। জাতি কি এবং জাতি কাহার আর ভেদই বা কার? প্রথমতঃ দেখা চাই যে অভেদ জ্ঞান করা উচিত, কি ভেদজ্ঞান করা উচিত। বাস্তবিক আমাদের যখন অভেদজ্ঞান হইতেছেনা তখন জাতিভেদ অস্বীকার করা উচিত নহে। পশুজাতি নানা প্রকার হইলেও যেমন তাহাদের দুগ্ধ এক রঙ্গেরই দেখা যায় তদ্রূপ ত আমি দুগ্ধের ন্যায় একবর্ণ দেখিতেছি না অর্থাৎ যখন আমার সর্ব্বত্রই ও সকল পদার্থেই ভেদজ্ঞান হইতেছে তখন আমার অভেদ জ্ঞান কোথায়? ভেদজ্ঞান থাকিতে জাতিভেদ অস্বীকার করা মিথ্যাচার মাত্র। মুখে জাতিগত অভেদজ্ঞানের কথা বলিতেছি কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি; আরও কথা এই, মিথ্যাচাররূপ অভেদজ্ঞান দেশে প্রচলিত হইলে দেশের শিল্পাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মণপুত্র হইতে সকল জাতিরই গুণ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ প্রথা থাকা উচিত। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই অভেদ জ্ঞানে চাতুর্বর্ণে বিবাহ ভোজন ইত্যাদি করিতে পারেন; কারণ, তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছে। ঋষিরাও তাহা করিতেন। তদ্ব্যতীত ব্যক্তি-মাত্রেরই বাহ্য জগতের গুণগত জাতিভেদ মানিয়া চলা উচিত; কারণ, বাহ্য জগতের গুণগত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তর্জগতের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা বাহ্যজগতে নিজ নিজ গুণগত কর্ম্ম করিয়া অন্ত-

র্জগতে প্রবেশ করিবেন। ক্ষত্রিয়ের বাহ্যজগতের কার্য্য যুদ্ধাদি রাজ্যরক্ষা। বৈশ্যের কৃষিগোরক্ষবাণিজ্য। শূদ্রের কর্ম্ম উপর্যুক্ত তিন বর্ণের সেবা ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্পাদি অন্যান্য কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম বংশগত না হইলে এই সকল কর্ম্মের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। পরে, যিনি ক্ষত্রিয়, তিনি বাহ্যকর্ম্ম করিতে করিতে গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবেন তখন তিনি স্বশরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া মনোরাজ্যের উচ্ছেদ করতঃ আত্মরাজ্য স্থাপন করিবেন। তদ্রূপ যিনি বৈশ্য, তিনিও বাহ্য জগতের কৃষি-বিদ্যাদি করিতে করিতে গুরূপদেশে যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবেন তখন তিনি শরীররূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া আত্ম-জ্ঞানরূপ ফললাভের জন্য গোরক্ষা (অর্থাৎ গুরূপদেশে জিহ্বাকে যথা স্থানে রাখা) ও বাণিজ্য অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত (মোক্ষের ইচ্ছার সহিত) কর্ম্ম করিবেন। যিনি শূদ্র তিনি গুরূপদেশ প্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য এই তিনের সেবা করিবেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার বংশগত শিল্পাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ যাঁহার বংশগত যে কর্ম্ম তিনি তাহা করিবেন*। এই রূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে সকলেই কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মে লীন হইবেন অর্থাৎ যিনি শূদ্র তিনি গুরূপদিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা শূদ্র হইতে বৈশ্যভাবাপন্ন এবং বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন;

---

* আর্য্যমিশন হইতে প্রকাশিত ভগবদ্গীতা ৪র্থ সংস্করণ ১৮শ অঃ ৪৫ শ্লোক দেখ।

যিনি বৈশ্য তিনিও গুরূপদেশে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন, এবং যিনি ক্ষত্রিয় তিনিও গুরূপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ হইবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণপুত্র হইতে সকলেই জন্মমাত্রে শূদ্র এবং সকলকেই সদ্‌গুরুলাভ করিয়া সাধন দ্বারা ঐরূপে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। তবে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে কাহারও শীঘ্র এবং কাহারও বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এই মাত্র প্রভেদ*। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে যিনি শূদ্র তিনি গুরূপদেশে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করিয়া বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইলেও অথবা ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেও তিনি যে প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তিনি সেই প্রকৃতি অনুযায়িক কর্ম্ম করিয়া চলিবেন। তদ্রূপ বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণপুত্রও অন্তর্জগতের উন্নতি সাধন করিলেও বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিবেন। মহাত্মা কবির সাহেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও তন্তুবায়ের গৃহে জন্মগ্রহণহেতু অথবা প্রতিপালিত হওয়ায় স্বীয় বংশোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মাও তদ্রূপ।

উপরে বলা হইয়াছে যে কেহ কেহ বলেন পরমাত্মা জীবাত্মার পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন—ইহা বলাও দোষ। কেননা, তাহা হইলে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ করা হয় মাত্র, আর কিছুই নহে। পূর্ব্বেও এ বিষয়ের আলোচনা করা

---

* আর্য্যমিশন হইতে প্রকাশিত ভগবদ্গীতা ৪র্থ সংস্করণ ১০ম অঃ ৪১ শ্লোকের টীকা দেখ।

হইয়াছে সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। অতএব দ্বৈতবাদের বিষয় যাহা কিছু বলি তাহা আমার ভ্রম। এক মূলভিত্তির অভাবে আমার কোন কথারই দৃঢ়তা নাই। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরাও দ্বৈতবাদী। ইঁহারা পরমাত্মার স্বরূপত্বলাভ স্বীকার করেন না, ইঁহারা বলিয়া থাকেন "তিনি প্রভু, আমি দাস; চিনি হওয়া অপেক্ষা যেমন চিনি খাওয়া ভাল, তেমনি এই দাস ভাবে তাঁহার উপাসনা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই"। ইঁহারা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া ভক্তিমার্গকে যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন তাহা নিতান্তই ভ্রম। "চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল" এই যে যুক্তি ইহাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কেননা, "চিনি খাওয়া ভাল" এই কথা চিনি খাইয়া বলিলেও না হয় স্বীকার করিতে পারা যাইত। কেবল চিনি চিনি শব্দ করিলে কি আমার মুখ মিষ্ট হইবে বা আমি মিষ্টরস অনুভব করিব? তাহা নিতান্ত অসম্ভব, কেননা, তাহা হইলে 'ভোজন' 'ভোজন' এই শব্দ দ্বারাওত ভোজনের কার্য্য সমাধা হইতে পারে। আমি মায়ার বশীভূত হইয়া ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই বলিয়া থাকি "চিনি খাওয়া ভাল"। চিনি খাওয়াটা কি সুখভোগের অবস্থা নহে? সুখের অস্তিত্ব থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, কারণ সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখ আছেই আছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং স্থির সিদ্ধান্ত। এই জন্যই যোগীরা সুখ দুঃখ এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই উভয়ের স্বতঃ পরিত্যাগের অবস্থাই চিনি খাওয়া। ইহা মুখে বলিলে হইবে না, কর্ম্মের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা চাই। নচেৎ "চিনি

হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল” এই কথা কেবল মুখে বলা আমার ন্যায় বাতুলের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং উহা কোন কাজের কথাই নহে। তদ্রূপ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট মনে করাও আমার বাতুলতা। আমার জ্ঞান নাই বলিয়াই আমি বলিয়া থাকি যে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভক্তি কাহাকে বলে আদৌ তাহারই আমার জ্ঞান নাই। ভক্তির চিহ্ন ধারণ করার নামই কি ভক্তি? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ত আজকাল ভক্ত বা ভক্তির ছড়াছড়ি। হায় হায় কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি !!! ভক্তির চিহ্ন (ভেক) ধারণ করিলে অথবা ভাব লাগিয়াছে বলিয়া চিপ্ চাপ্ আছাড় খাইয়া পড়িলে ভক্ত হয় না। ভাবের উদয়ে কখনও পতন হয় না। অভাবের উদয়েই পতন হইয়া থাকে। ভাবে যদি পতন হয়, তবে অভাবে কি উত্থান হইবে? মায়িক জীবের সবই উল্টা, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বোধ, সত্যকে অসত্য জ্ঞান এবং জ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া তাচ্ছল্য !!! ইহা কেবল মায়িক জীবেই সম্ভবে। নতুবা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট বলিব কেন? ভাল একবার দেখা যাউক্ জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে কি না? প্রথমতঃ আমি কাহাকে ভক্তি করিব? এই কথার উত্তরে যদি বলা যায় যে আমি নামে ভক্তি করিব এবং নাম ও নামী অভেদ জ্ঞান করিয়া দাস ভাবে ভক্তি বা সেবা করিব, তাহা হইলে ইহাতে তিনটী প্রশ্ন আসিতে পারে। প্রথম, নাম কাহার? দ্বিতীয়, নাম করে কে? তৃতীয়, নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান কিরূপ? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে না হয় বলিলাম আমি হরিনাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম সদা সর্ব্বদা জপ ও সেই নাম সংকীর্ত্তন করিব;

ইহাতেই আমার বৈকুণ্ঠধাম বা গোলোক ধাম প্রাপ্তি হইবে এবং তথায় বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিব। বাস্তবিক ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে নিতান্ত মন্দ নহে, তবে কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না এবং আমরা যে ভাবে নাম জপ করিয়া থাকি তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম কি না ইহাই বিচার্য্য। নাম জপ করিতে গেলে প্রথমতঃ আমার জানা উচিত যে আমি কাহার নাম জপ করিতেছি। যদি তাহা আমার জানা না থাকে তাহা হইলে আমার সব বৃথা; কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে আমার অনন্যভক্তি হইতে পারে না। "হরি" এই শব্দ যাহা মুখে বলা যায় তাহাই কি হরি? যদি তাহাই হরি হয় তাহা হইলে আমার হরি সম্বন্ধে ভক্তি হওয়া অসম্ভব। কেননা, জল এই শব্দটী কি জল? যদি তাহাই হয় তবে উহা মুখে উচ্চারণ করিলে পিপাসা দূর বা মুখ জলপূর্ণ হউক। তাহা যখন হয় না, তখন জল এই শব্দটীকে জল বলা আমার নিতান্ত ভ্রম। জল বলিতে গেলে যেমন জল এই শব্দকে না বুঝাইয়া জলবাচক বিষয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি হয় সেই বস্তুকে বুঝায় এবং উহা যখন পান করিব তখনই আমার পিপাসার শান্তি হইবে নচেৎ নহে, তদ্রূপ হরি বা শ্রীকৃষ্ণ এই নাম বলিলেই এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত মহাশক্তিকে বুঝায়। জল জল শব্দ করিলে যেমন পিপাসা দূর না হইয়া মুখ আরও শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ হরিনাম বা কৃষ্ণনাম মুখে চীৎকার করিয়া বলিলেও মুখে ফেকো পড়িয়া মুখ রসশূন্য হয়। কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারা আমার হরি বা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হইত তাহা হইলে আর আমার

মুখে কেকো পড়িত না, বরং মুখ আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইত। আমি মুখে হরি হরি করিতেছি কিন্তু হরি কি তাহা বুঝিনা। তবে যে ডাকি তাহার কারণ এই যে লোকের কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিলে আমার ভাল হইবে অথবা স্বর্গসুখ লাভ হইবে; তাই সেই ভাল'র আশায়—স্বর্গসুখের আশায় তাঁহাকে ডাকি মাত্র, অথচ এত ডাকিতেছি কাহারও সাড়া পাই না। কিন্তু যদি শুনিতাম যে তিনি কাহারও ভাল করেন না তাহা হইলে বোধ হয় কখনই তাঁহাকে ডাকিতাম না। আর যাহাও ডাকিতেছি তাহাও ডাকা হইতেছে না। কেননা ডাকিবে কে? মুখে আমি হরি হরি শব্দ করিতেছি কিন্তু আমার মন বিষয়ে রমণ করিতেছে। আমি স্থলে সাঁতার শিখিয়া জলে নামিয়াছি, সুতরাং সাঁতাররূপ জ্ঞানের অভাবে ডুবিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে? মনের স্থিরতা বা ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবে আমার সকল কার্য্যই পণ্ড হইতেছে। নাম যে করিবে সে আমার নহে, আমি তাহার দাস বলিলেও চলে। আমার হাতে মালা ফিরিতেছে ও মুখে নাম হইতেছে কিন্তু যে আমার উপস্থিত প্রভু অর্থাৎ মন, সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করিতেছে। সুতরাং আমি হরিতেও আসক্ত নহি, মালাতেও আসক্ত নহি, আসক্ত কেবল ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখে। আমি লোকের কাছে সাধু বৈরাগী বা ভক্ত সাজিয়াছি বটে, কিন্তু আমার নিজের কাছে আমি ইন্দ্রিয়ের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে আমি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলি তাহা কেবল লোক

ভুলাইবার জন্ম বা দলপুষ্টির অভিপ্রায়ে। হরিনাম বা কৃষ্ণনাম পক্ষীর ন্যায় কেবল মুখে আওড়াইলে হইবে না। পক্ষী যেমন সারাদিন হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণ নাম করিয়া থাকে অথচ বিড়ালে ধরিলে তাহার আর সেই হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণ নাম বাহির না হইয়া তাহার জাতীয় বুলি ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ বাহির হয় এবং ট্যাঁ ট্যাঁ করিতে করিতে সে দেহত্যাগ করে, তদ্রূপ এই প্রকারে নাম করায় আমাদেরও পক্ষীর ন্যায় গতি হইবে, অর্থাৎ যখন বিড়ালরূপী কাল আসিয়া আমাদের গলা টিপিয়া ধরিবে তখন আর মুখে নাম বাহির হইবে না। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ আবার কি কথা? মৃত্যুকালে অনেককেই ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে দেখা যায়? তাহা যায় বটে, কিন্তু যতক্ষণ কণ্ঠশ্বাস না হয় ততক্ষণই সব হয়। করের অভ্যাস বশতঃ উহা যতক্ষণ অসাড় না হয় ততক্ষণই ফিরিতে থাকে। জিহ্বা ওষ্ঠও তদ্রূপ। এইরূপ যখন সকল অঙ্গ অবশ হইয়া যায় এবং একমাত্র মন ও প্রাণ অবস্থিতি করে তখন আর আমার এই নাম হয় না। কেননা আমি পূর্ব্বে প্রাণের দ্বারা মনের প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই। যদি রাখিতাম তাহা হইলে এই আসন্ন কালে তাহারা আমার সাহায্য করিত অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ে আমার মন থাকিত। মন চিরকাল বিষয়ে রমণ করিয়াছে, আমি মুখে নাম করিয়াছি মাত্র। মুখ নিস্পন্দ হওয়ায় মন পূর্ব্বে যাহা করিত এখন সেই বিষয়চিন্তাই করিতে লাগিল। সুতরাং গতিও তদ্রূপ হইল। ভরত রাজা হরিণশিশু চিন্তা করিয়া এই জন্যই হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল মুখে শব্দমাত্র জপ করিলে কিছুই হয় না। তুলসী দাসের রামায়ণেও উক্ত আছে—

নাম জিহ জপি, জাগহিঁ যোগী।

অর্থাৎ ভগবানের নামটী যোগীরাই জিহ্বার দ্বারা করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য তুলসীদাসের দোঁহাতে প্রকাশ, যথা—

রাম নাম মণিদীপ ধরু, জিহ দেহরি দ্বার।
তুলসী বাহর ভিতরো, যো চাহসি উজিয়ার॥

অর্থাৎ যদি বাহিরে ও ভিতরে রামের প্রকাশ চাও তবে জিহ্বারূপ দেরকোর (পিলসুজের) উপরে রামনামরূপ মণি (শ্রেষ্ঠ) দীপকে রাখ অর্থাৎ জিহ্বাকে ত্রিকূটে রাখ তাহা হইলেই ভিতরে ও বাহিরে রামের প্রকাশ হইবে। ইহাতে যদি বলা যায়, যে আমরা ত আর কেবল শব্দমাত্র জপ করি না, শব্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও রূপ দর্শন করি এবং সেই মূর্ত্তি ও রূপের উপর ভক্তি করিয়া থাকি; সুতরাং শেষ সময়ে সেই মূর্ত্তি বা রূপ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব; কেননা, রূপ দর্শন করে কে? চক্ষু কি দর্শন করে? পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, চক্ষু দর্শনের দ্বারস্বরূপ; চক্ষুর সহিত মনের সংযোগ না হইলে দর্শনকার্য্য হয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বার সেই চক্ষু যখন অবশ হইয়া যাইবে, তখন আর আমার দর্শন হইবে না। কিন্তু যদি আমি প্রাণের দ্বারা মনের কার্য্য করিতাম ও মনকে নিজবশে রাখিতাম তাহা হইলে এই অন্তিম অবস্থায় সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইলেও এক মনের দ্বারা দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্য সমাধা হইয়া পরা গতি

প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। অন্তিম কালে মন যখন অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় অভিভূত হয়, তখন কাণের কাছে আসিয়া "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল" এই কথাগুলি শুনাইলেও মন তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা সামান্য পীড়াদির যন্ত্রণায় যখন এত অধীর হইয়া পড়ি যে, তখন আর আমাদের কোন কিছুই ভাল লাগে না, তখন মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইলে আমাদের মনের যে কি ভাব হয়, তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিলেও কতকটা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি প্রাণের সাধন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার মন সকল অবস্থাতেই ভগবানে যুক্ত থাকে, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু হায়! হায়! আমি প্রাণের দ্বারা মনের সাধন করি নাই—কেবল ভুও নাম করিয়াছি মাত্র এবং রূপ বা মূর্ত্তি যাহা দেখিয়াছি তাহাও কল্পনা। সুতরাং আমার আর কি গতি হইতে পারে?

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

ইতি গীতা।

অর্থাৎ আমি তোমায় বিজ্ঞানের সহিত এই (মদ্বিষয়ক) জ্ঞান বিশেষরূপে বলিব, যাহা জানিলে জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকিবে না। ইহার দ্বারা দেখা যায় যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়াও তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে কেবল কল্পনার দ্বারা আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং আমার নাম করা না করা

দুইই সমান। নামের দ্বারা যখন আমার সেই হরি বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হইল না, তখন ভক্তি কাহাকে করিব? যাহাকে ভক্তি করিব সেই পাত্রই যদি আমার ঠিক না হইল, তাহা হইলে আমার ভক্তি কতক্ষণ থাকিতে পারে? ভক্তি মুখের কথা নহে। তবে কপট ভক্তি লাভ করা কষ্টকর নহে। দুই চারি বার লোকের কাছে রাধার প্রেম বা শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয় শুনিয়া কাঁদিতে পারিলেই আমি অনায়াসে ভক্ত বা প্রেমিক উপাধি লাভ করিতে পারি। কিন্তু প্রকৃত অব্যভি-চারিণী ভক্তি সাধন ব্যতীত কখনই লাভ হইতে পারে না।* কর্ম্মযোগের দ্বারা যখন আমার জ্ঞান লাভ হইবে, তখনই আমার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নচেৎ ভক্তি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ এই শব্দ যদি শ্রীকৃষ্ণ না হইল তাহা হইলে নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান কোথায়? শব্দ যখন নশ্বর পদার্থ তখন নিত্য পদার্থ সেই অব্যক্ত পরাশক্তির সহিত উহা কিরূপে তুল্য হইতে পারে? শাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বাহিরের শব্দ নহে। আমরা যে সকল শব্দ করিয়া বা বলিয়া থাকি, সে সকল আকাশতত্ত্বের গুণ। সুতরাং উহা কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না। শাস্ত্রে যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন তাহা অশব্দের শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ বিনা আঘাতে আপনা আপনি হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীই কেবল এই প্রণবধ্বনিরূপ শব্দ শ্রবণ করেন। ঐ ধ্বনি যখন সাধকের

---

* আর্য্যমিশন্ হইতে প্রকাশিত ভগবদ্গীতা ৪র্থ সংস্করণ ৯ অঃ ২৬ শ্লোকের টীকা, ১১অঃ ৫৪শ শ্লোকের টীকা এবং ১২ অঃ ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক ও টীকা দেখ।

শ্রুতিগোচর হইয়া বিশেষরূপে নিশ্চিতবুদ্ধি হয় তখনই সাধকের সমাধিতে অচলাবুদ্ধি হইয়া থাকে। গীতাতেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

যদা শ্রুতবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ ওঁকারধ্বনি শ্রবণৈঃ বিশেষেণ প্রতিপন্না নিশ্চিতা) তে (তব) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্) নিশ্চলা (বিষয়ান্তরৈঃ অনাকৃষ্টা) [অতএব] অচলা (অভ্যাসপটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞানম্) অবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ যখন ওঁকারধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল ও স্থির থাকিবে তখন তুমি যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবে। বিনা আঘাতে আপনা আপনি যে শব্দ হয় তাহাই ওঁকার ধ্বনি। সেই শব্দের যে ধ্বনি তাহার অন্তর্গত এক পীতবর্ণ জ্যোতি আছে এবং সেই জ্যোতির মন অন্তর্গত। এই মন যাহাতে লয় হয় তাহাই অব্যক্ত বিষ্ণুর পরম পদ। সেই পরম পদের ধ্যানই পরম ধ্যান এবং সেই ধ্যানের বিষয়ই ব্রহ্ম। ওঁকার গীতাতেও এই কথা আছে যথা—

অনাহতশ্চ যঃ শব্দস্তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
তস্য চান্তর্গতং জ্যোতি তস্য চান্তর্গতং মনঃ॥
যস্মিন্ মনোলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানঞ্চ হি ব্রহ্মতঃ॥

এই ওঁকাররূপ শব্দই ব্রহ্ম এবং এই শব্দের অতীত অবস্থা নিরঞ্জন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সঞ্চিন্তয়েদ্ যতিঃ।
শব্দব্রহ্মাদিরূপেণ শব্দাতীতং নিরঞ্জনম্॥

ইতি ওঁকার গীতা।

অতএব আমরা মুখে নামাদি উচ্চারণ করিয়া যে শব্দ করিয়া থাকি তাহা ব্রহ্ম নহে। সুতরাং নাম ও নামীর বিষয় এক হইতে পারে না। আমার নাম কখনও আমি নহে। নাম উপাধিমাত্র, আমি স্বতন্ত্র বিষয়। এরূপ অবস্থায় অভেদ কোথায়? প্রকৃতপক্ষে আমার "আমি" থাকিতে অভেদ জ্ঞান হইতেই পারে না। নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান করিব এ কথা কেবল মুখে বলিলেত হয় না—কার্য্যে পরিণত করা চাই।

উপস্থিত কালে যে সকল হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে সে গুলি তামসিক বা রাজসিক কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ সাত্ত্বিক কর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন যথা—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

অর্থাৎ নিষ্কামব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তি শূন্য, প্রীতি বা দ্বেষবশত কৃত নয় এমন যে কর্ম্ম তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং উপস্থিত কালের নাম সংকীর্ত্তনাদি কখনই সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে পারে না। তবে যদি বলা যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভুল বলিয়াছেন তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

বাক্য যদি ভুল হয় তবে তাঁহার নামের আর মাহাত্ম্য কি রহিল? অতএব তাঁহার বাক্য কখনও ভুল হইতে পারে না। আমাদের কার্য্যের দোষে, শিক্ষার দোষে এবং প্রবৃত্তির দোষে আমরাই ভুল বুঝিয়া ভুল করিয়া থাকি। আমি তামসিক ভাবাপন্ন, তামসিক কার্য্যেই আমার প্রবৃত্তি। সুতরাং সাত্বিক কর্ম্মে আমার লক্ষ্য হয় না। লক্ষ্য হইলেও আমার প্রবৃত্তি লোভের বশীভূত হইয়া আমাকে সাত্বিক কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া আনে, তাহাতে রত হইতে দেয় না। সুতরাং নামের অছিলায় সুরে তালে রাগ রাগিণীতে আসক্ত হই। নতুবা সুর তাল রাগ রাগিণী যদি না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় নাম সংকীর্ত্তন করিতাম না। আমার সাত্বিক ইচ্ছার অভাবেই কেবল আমি এইরূপ করিয়া থাকি। উপরি উক্ত সাত্বিক কর্ম্মের লক্ষণানুসারে আমার নাম সংকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম কখনই সাত্বিক কর্ম্ম নহে। সভা সমিতি করিয়া আজ কাল যে সকল হরিনামাদি সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে সে সকল সঙ্গ বর্জ্জিতও নহে ফলাকাঙ্ক্ষারহিতও নহে, বরং প্রীতি বা দ্বেষ বশতই হইয়া থাকে। কারণ, অনেক স্থলেই প্রায় এইরূপ দেখা যায় যে অমুক সভার যখন পাঁচ দিন অধিবেশন ও বক্তৃতা এবং দলে দলে নাম সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল তখন আমাদের এবার দশ দিন হওয়া চাই, তাহাদের অপেক্ষা নিশানও বেশী রাখা আবশ্যক, এবং বিধিমতে চেষ্টা করা চাই, যাহাতে তাহাদের অপেক্ষা আমাদের ভাল হয়; আর নাম সংকীর্ত্তন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় করা চাই, নিশানের উপর লিখিয়া দিতে হইবে "অমুক পাড়ার সংকীর্ত্তনের দল"; আর যিনি যিনি গগন ভেদী বক্তৃতা করিতে

পারেন, এমন বাছা বাছা লোক আনিতে হইবে ; তাহাতে বহু টাকাই খরচ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, এবং সংকীর্ত্তনেরও এমন বন্দোবস্ত করা উচিত যেন মৃদঙ্গের, করতালের ও রামশিঙার ধ্বনিতে নগর কম্পিত হইয়া উঠে—মোট কথা তাহাদের অপেক্ষা আমাদের সংকীর্ত্তন যেন কোন অংশে কম না হয়। হায় ইহাই কি আমার সাত্ত্বিক কর্ম্ম !!! গীতার যে শ্লোকটী উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে ইহাকে ত কোন ক্রমেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। এরূপ ভাবে যে সকল হরিনামাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা তামসিক বা রাজসিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। গীতাতেও ভগবান্ এইরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলকে রাজসিক বা তামসিক কর্ম্ম বলিয়াছেন।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহংকারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিশয় আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজস বলিয়া কথিত।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

অর্থাৎ পরিণামে কর্ম্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা, ও স্বকীয় সামর্থ্য এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে নামাদি সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা রাজসিক বা তামসিক কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজকাল সবই বিপরীত। মৃদঙ্গ (খোল) বাজাইয়া নিশান

উড়াইয়া দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনের বা হরিনামের ছড়াছড়ি। হায়, হায়, ইহাই কি সঙ্কীর্ত্তন !!! ইহাই যদি সঙ্কীর্ত্তন হয়, তবে সঙ্কীর্ত্তনের পরে গলা বসিয়া যায় কেন? গা গতরের বেদনাই বা থাকে কেন? এইরূপে হরিনাম করাটা সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইলে সেই সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণামে ক্লেশ বা অশান্তি হওয়া ত উচিত নহে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণামে শান্তিসুখই হওয়া উচিত। কিন্তু রাজসিক কর্ম্মের প্রথমে সুখ ও পরিণামে ক্লেশ এবং তাহাই এই সঙ্কীর্ত্তনে হইয়া থাকে অর্থাৎ এইরূপ হরিসঙ্কীর্ত্তনের যে সুখ তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলা যায় না, উহা রাজসিক ও তামসিক সুখের মধ্যেই পরিগণিত। গীতাতে ভগবান্ এইরূপ সুখকেই রাজসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা আর নাই। সাধন ব্যতীত নিরপরাধ হইতে পারা যায় না। আমি নিরপরাধ হইয়াছি ইহা মুখে বলিলেই কি হইল? বাস্তবিক আমি যতদিন ইন্দ্রিয়ের দাস ততদিন আমার নিরপরাধ হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বলি আমি নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইব অর্থাৎ নাম করিতে করিতেই আমার নিরপরাধের অবস্থা হইবে, তাহা হইলে আমার নিতান্ত ভুল। কেননা, নাম করিবে কে?

মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া নাম করিতে না পারিলে নাম করা না করা এ দুইই তুল্য। আরও বিশেষ ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃ স্থৈর্য্যের অভাবে আমার নাম করা তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইবে। যাহাতে উহা তামসিক কর্ম্মে পরিণত না হয় সেই আশঙ্কায় নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা আছে। যদি কেবল মাত্র নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার বিধি থাকিত না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ—

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করি ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি কহোঁ শুন সর্ব্বজন।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥

প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

কিন্তু আজ কাল সবই ইহার বিপরীত। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব এখন কোথায়? এখন প্রায় সকলেই আমার ন্যায় ব্যভিচারগ্রস্ত। যাহাতে ব্যভিচারের নাশ হয় তাহার প্রতিও কাহারও লক্ষ্য নাই। এখন কেবল যশঃপ্রত্যাশায়, ফল প্রত্যাশায়, ভোজনপ্রত্যাশায় গুরু-উপাধি-লাভপ্রত্যাশায় বা অর্থপ্রত্যাশায় দম্ভের সহিত রাস্তায় রাস্তায় সভাতে সভাতে নাম সংকীর্ত্তনের ছড়াছড়ি। এই সকল কারণে, শ্রীজীব গোস্বামী সাধনাঙ্গ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ ধামে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে প্রাণায়ামের ক্রিয়া সকল নিহিত আছে। পূর্ব্বেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে *, সুতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপস্থিত কালের বৈষ্ণব মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য নহে, উহা প্রভুদিগের জন্যই হইয়াছে এবং একমাত্র নামেতেই তাঁহাদের মোক্ষ হইবে; কেননা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ কলিতে কেবল হরির নামই (সার) তদ্ব্যতীত কলিতে জীবের আর অন্যগতি নাই। বাস্তবিক ইহাও শাস্ত্রীয় কথা বটে, তবে কি শাস্ত্র ভুল? জড় চক্ষে দেখিতে গেলে শাস্ত্র ভুল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদেরই বুঝিবার ভুল। একটু ধীরভাবে

* ২৭শ পৃষ্ঠা দেখ।

দেখিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু মীমাংসা হইবে কোথা হইতে? এক সাধনের অভাবে আমার মন সত্ত্বভাবাপন্ন নহে। সুতরাং আমি প্রবৃত্তি অনুসারে কেবল গোলে হরি-বোল করিয়া বেড়াইতেছি। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইলে কোন বিষেয়রই গোল থাকে না। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিই বা কিরূপে? আমার সাধন ভজন কিছুই নাই। এক সাধনের অভাবে শান্তিরূপ ফল হইতেছে না এবং শান্তিরূপ ফলের অভাবে মনও নত হইতেছে না। বৃক্ষে ফল ধরিলে ডাল যেমন স্বভাবতঃ নত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধন দ্বারা শান্তিরূপ ফল ফলিলে, মন আপনা আপনি নত হইয়া যায় এবং তখনই সাধকের নিরপরাধরূপ অবস্থা স্বতই প্রকাশ পায় ও তখনই স্বতই নামরূপ অবস্থা সর্ব্বদা আপনা আপনি হইতে থাকে। সেই অবস্থায় লাগিয়া থাকার নামই হরিনাম জপ। শাস্ত্র হইতে ভগবত্তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে যৌগিক অর্থ জানা আবশ্যক। যৌগিক অর্থ ব্যতিরেকে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্" ইত্যাদিরূপ যে শ্লোকটী উপরে বলা হইয়াছে যৌগিক অর্থে তাহার অন্বয় অন্যরূপ, যথা—"হরের্নাম হরের্নাম কেবলমেব হরের্নাম" অর্থাৎ "কেবলই" হইতেছে হরির নাম। এখানে "কেবল" শব্দের অর্থ একমাত্র নহে। "কেবল" একটী কর্ম্ম-বিশেষ। এই কেবলরূপ কর্ম্মের দ্বারা কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই কর্ম্মই এক মাত্র ব্রহ্মপ্রকাশের হেতুভূত।

কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ॥

অর্থাৎ কেবলরূপ আদ্য যোগের দ্বারা সাধক ভৈরব হন। এই কেবল কর্ম্মের যে অবস্থা তাহার নামই হরি, কারণ, এই কেবল কর্ম্মই জীবের জীবভাব হরণ করিয়া কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। ইহা একমাত্র প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীরাই লাভ করিতে পারেন। পূরক রেচক স্বতঃ বর্জ্জিত অবস্থাই কেবলরূপ কর্ম্মের অবস্থা।

সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ।
রেচশ্চাপূর্য্য যঃ কার্য্যঃ স বৈ সহিতকুম্ভকঃ॥
রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতিস্মৃতঃ॥
ইতি গ্রহযামল॥

অর্থাৎ কুম্ভক দুই প্রকার, সহিত ও কেবল; রেচক ও পূরকের সহিত যে কুম্ভক তাহার নাম সহিত কুম্ভক এবং রেচক পূরক পরিত্যাগে সুখে যে বায়ু ধারণ হয় অর্থাৎ বায়ু যে স্বতঃ স্থির হয় সেই প্রাণায়ামের নামই কেবল।

এই কেবলরূপ কর্ম্মের আর একটী নাম সহজ কর্ম্ম। বৈষ্ণবদিগের বিবর্ত্তবিলাস নামক গ্রন্থে সহজ কর্ম্ম ব্যতীত জীবের যে উপায়ান্তর নাই তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। কেবল কর্ম্ম হইতে যেমন কৈবল্যাবস্থা, এই সহজ কর্ম্ম হইতে তেমনি সহজাবস্থা। এ উভয় অবস্থাই তুল্য কিন্তু অতি দুর্লভ। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত উহা লাভ হয় না। সাধকের যখন উক্ত অবস্থা লাভ হয় তখনই প্রকৃত হরিনাম স্মরণ বা কীর্ত্তন হয়। তখন আর মুখে চীৎকার করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে হয় না। মহাত্মা কবির সাহেবও এইরূপ ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে* সুতরাং এখানে আবার তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বাস্তবিক একটু ধীরভাবে ও গোঁড়ামি ছাড়িয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা কার্য্যতঃ ঠিক্ হইতেছে না। পূর্ব্বে যে দাস ভাবে সেবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা আত্মজ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে সাধকের সাধনাবস্থায় এরূপ অনুষ্ঠান থাকা বড় ভাল। জীব যতকাল অজ্ঞানরূপ অহংমদে মত্ত থাকে, ততকাল আত্মজ্ঞানের অভাবে নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে। তন্মধ্যে "তিনি প্রভু, আমি দাস" ইহাও আত্মজ্ঞানীর চক্ষে এক প্রকার প্রলাপ বাক্য মাত্র। অজ্ঞানীর পক্ষে ভগবৎ সম্বন্ধে কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল এইমাত্র। যখন কর্ম্মের দ্বারা আমার "আমি'র" জ্ঞান হইবে তখনই এই প্রলাপ যাইবে, নচেৎ নহে। তবে যে দ্বৈত অদ্বৈত লইয়া বাদানুবাদ করি, তাহা কেবল আমার বিতণ্ডা মাত্র। বাস্তবিক এ উভয় বাদের মধ্যে আমার কোন বাদেরই জ্ঞান নাই, কেবল মুখে বলি মাত্র যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু ইহা একবারও ভাবি না যে, জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে? মনে করুন এক স্বর্ণ হইতে যেমন নানা প্রকার অলঙ্কার হইয়া নানা উপাধি ধারণ করে, কিন্তু অলঙ্কার গুলি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে তদ্রূপ আত্মা এক বই দুই নহে। কিন্তু ইহা কেবল মুখে বলিলে হয় না। দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ মুখের কথা নহে, ইহা সাধনের এক এক অবস্থা মাত্র। "এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই" অদ্বৈতবাদীদিগের এই কথাটী

সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, এক ব্রহ্ম বলে কে? যিনি 'এক' বলেন তিনি এক আর ব্রহ্ম এক, সুতরাং দুই হইল। দুই থাকিলে আর অদ্বৈত কোথায়? যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করিতে হয়, আমি দুই চারি পাতা পুঁথি পড়িয়া সেই জ্ঞান লাভ করিব ইহাই কি কখন সম্ভব? কখনই নহে, কেননা তাহা হইলে জগতে আর কেহই অজ্ঞানী বা বদ্ধ থাকিত না। সকলেই পুস্তক পাঠ করিয়াই মুক্ত হইয়া যাইত। অতএব সাধনার দ্বারা নিজবোধ না হইলে দ্বৈত অদ্বৈত বাদের মীমাংসা হয় না। গুরূপদেশে সাধন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সাধক যখন আপন হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থ চৈতন্যের রূপ দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই দ্বৈত ভাব। সে অবস্থায় তাঁহার দৃশ্য ও দ্রষ্টাভাব বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহাকে দ্বৈত ভাব কহে। আর সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যখন সাধকের দ্রষ্টাভাব যায় অর্থাৎ আত্ম-জ্যোতি দর্শন করিতে করিতে সাধক যখন "আমিহারা" হইয়া যান এবং দ্রষ্টার অভাব হয়, তখনই তাঁহার অদ্বৈত ভাব। ইহা কল্পনায় বা শাস্ত্রপাঠে কখনই হয় না। শাস্ত্রপাঠে দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদের জ্ঞান লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রপাঠে এ পর্য্যন্ত কেহ আত্মজ্ঞান বা দ্বৈত অদ্বৈত বাদের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শাস্ত্রপাঠের দ্বারা উহা লাভ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

এক কালে নারদ ঋষিও শাস্ত্রপাঠে জ্ঞান লাভ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু শাস্ত্রাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়ায় শোকাকুল হইয়াছিলেন—

সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হি॥
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্ব্বৈশ্চ শোকিতা॥
ইতি পঞ্চদশী।

নারদেরই যখন এই অবস্থা ঘটিয়াছিল তখন অন্যে পরে কা কথা। বাস্তবিক শাস্ত্রাদিপাঠে জ্ঞান লাভ হওয়া দূরে থাকুক্ বরং নাস্তিকতার ভাবই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ধরা কঠিন, কেননা আমার অন্তর নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হইলেও ব্যবসার খাতিরে আমি মুখে প্রায় আস্তিকতার ভাণই দেখাইয়া থাকি এবং গোপনে সবই করিতে প্রস্তুত, কিছুতেই কুণ্ঠিত নহি।

এই নাস্তিকতা বাদ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে ও পশুভাবাপন্ন তান্ত্রিকদিগের ঘোর প্রাণিবধের উৎপাত নিবারণ মানসে গৌরাঙ্গদেব টোল ছাড়িয়া হরিনাম প্রচার করেন। যাহারা কিছু করিতে চাহে না তাহাদিগকে সাধন মার্গ লওয়াইবার জন্য ঔষধের অনুপানের স্বরূপ হরিনাম দিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনমার্গ অবলম্বনে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ দেখিলেই স্পষ্ট অনুভব হয় যে, চৈতন্যদেব এই অভিপ্রায়েই ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। কারণ উক্ত গ্রন্থে যোগক্রিয়া ও যোগোপদেশ সকল নিহিত আছে। শ্রীরূপ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, কৃষ্ণদাসকবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবচূড়ামণিগণ বৃন্দাবনধামে সহজরূপ যোগাভ্যাসে রত হইয়াছিলেন, আর গৌরাঙ্গদেবের ভ্রমান্ধ শিষ্যগণ কামনার দাস হইয়া অসভ্যতা-

নিবন্ধন সাধন মার্গকে অবহেলা করিয়া হরিনামাদি কার্য্যে রত থাকিলেন। তাঁহারা ইহা বুঝিলেন না যে, সাধনের অভাবে হরিনাম করিবে কে? যত দিন আমার মন অন্য বিষয়ে রমণ করে তত দিন আমি ইন্দ্রিয়ের দাস। সুতরাং এমন অবস্থায় আমার মুখে হরিনাম এবং করে মালা জপ করা না করা এ দুইই সমান। প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় না। যিনি বলেন যে, এই সহজপ্রাণায়াম-যোগাভ্যাস ব্যতীত মন বা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে, তিনি আমার ন্যায় নিতান্ত ভ্রান্ত। কেবল ভোগলালসা পূর্ণ করিবার মানসেই ধর্ম্মের অছিলায় ঐরূপ বলিয়া থাকেন মাত্র। সুতরাং তাহা কোন কাজের কথাই নহে। এইরূপে সাধনের অভাবে আমাদের সবই নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি পুনর্ব্বার সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার সহিত কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা হইলে পূর্ব্বের সে অবস্থা আবার পাইতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত সৎপথে কাহারও দৃষ্টি নাই, যাহা কিছু আছে বলিয়া দেখা যায়, তাহা কেবল ঐহিক সুখভোগের জন্য। ইন্দ্রিয়সুখে মজিয়া থাকায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম যে পরধর্ম্ম তাহা জানি না, সুতরাং লোকসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে, সেই পরধর্ম্মরূপ অধর্ম্মকেই ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া তাহাই করিয়া থাকি।

এইরূপ তান্ত্রিকদিগের মধ্যেও সাধনবিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাঁহারাও অধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া নানারূপ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মের অছিলায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মদ্যমাংসাদির ব্যবহাররূপ পাশবিক

আচারে রত হইয়া থাকেন অথচ বলিয়া থাকেন আমরা বীরাচারী ভৈরব ইত্যাদি। মনে করুন, মদ্যপান বহুস্ত্রীসেবা অথবা প্রাণিবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করাটাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম কি? আর সেই মেষ মহিষ ছাগাদি পশু বধ করিয়া তাহার রক্তাদি মাখিয়া রাক্ষসের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করাই কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ? সাধক রামপ্রসাদ সেনও তান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তিনিও এরূপ নৃশংস ভাবে বলি দিতেন না। তবে তাঁহার ন্যায় সাধু তান্ত্রিকের এক ভাব এবং উপস্থিত কালের তান্ত্রিকগণের আর এক ভাব। ষড়দর্শন এবং বেদও তাঁহার শ্যামার দর্শন পায় নাই। তাই তিনি নিজরচিত সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জানবে তেমন॥
প্রসাদ বলে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥

মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটরি ভোর হ'লে সে লুকাবে রে॥
ষড়্দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা সম্প্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা ষড়্দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট গুরুশিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাট তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর সে প্রবেশে সেই পুর।
রাম প্রসাদ বলে ভাঙ্‌ল ভোর আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥

বলিদান সম্বন্ধেও রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর, কর্‌তে চাওরে উপাসনা॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়, আলচাল আর বুটভিজানা
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করবে পূজা, মা ত আমার ঘুষ্ খাবেনা॥

কিন্তু উপস্থিত কালের তান্ত্রিকগণের শ্যামা বা তার অনুরূপ অর্থাৎ বিড়ালবৎ। বিড়াল যেমন আপন শাবককে ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে তান্ত্রিকগণের শ্যামাও তদ্রূপ প্রাণিবধে যদি পাপ না হয় তাহা হইলে শ্যামার মহিমা বড় কম নয়!! কিন্তু উহাতে যদি পাপ না হয় তবে পাপ যে কিসে, তাহা ত বুঝি না।

যূপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥

ইতি যোগোপনিষদে শুকবাক্য।

অর্থাৎ যূপকাষ্ঠে পশুবধ করিয়া এবং রুধিরদ্বারা কর্দ্দম করিয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে নরকে কে যাইবে? বৈদিক কার্য্যে পশুহিংসাদিরূপ যে সকল নানা দোষ আছে তৎসম্বন্ধে কপিল বলেন—

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ॥

ইতি কপিলসূত্র ৮২, প্রথম অধ্যায়।

অর্থাৎ জলের দ্বারা যেমন শীতনিবারণ না হইয়া বরং শীতের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ মেষমহিষাদি বধ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তার দুঃখের বৃদ্ধি ভিন্ন তাহার হ্রাস হয় না। সুতরাং এইরূপ বলিদানে "লাভঃ পরং গোবধঃ"। বলি শব্দের অর্থ উপহার। সাধন কালে সাধকের নিজ পশুভাব বলি (উপহার) দিয়া দেবভাবে পূজা করাই বলির উদ্দেশ্য। সাধকবর রাম প্রসাদ সেন তান্ত্রিক ছিলেন বটে কিন্তু সদ্‌গুরূপদেশে সাধনদ্বারা বলির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে বস্‌রে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আল চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোশ্‌নাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দাওনা জ্বলুক নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী ব'লে, বলি দাও ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

প্রাণিবধ করিয়া বলি দেওয়া শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রায় নহে। তবে আমার বুঝিবার দোষে সবই হইতে পারে। তন্ত্রে পঞ্চমকার সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আরও কথা এই, পঞ্চমকারও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন তাহারাই এই ঘৃণিত পঞ্চমকার সাধন করিয়া থাকে। এই ঘৃণিত পঞ্চমকারে সাধারণ মদ্য, পশুমাংস, মৎস্যাদি জলচর, মুদ্রা অর্থাৎ ভাজা ইত্যাদি এবং নিজ স্ত্রী বা অন্যা স্ত্রীতে রমণ, এই গুলি সাধনের উপকরণ। এই গুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অধর্ম্মকর বিষয় আর কি আছে?—

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তু হ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবেত বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিসেবনাৎ॥

ইতি কুলার্ণব, ২য় উল্লাস।

অর্থাৎ মদ্যপানের দ্বারা যদি মানুষ সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে মদ্যপায়ী পামরেরাও সিদ্ধিলাভ করুক; মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্যা গতি হয়, তাহা হইলে জগতে মাংসাশী সকলেই পুণ্যভাক্ হউক; হে দেবেশি, স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীসেবা হেতু জগতে সকল জীবই মুক্ত হউক্। যদি বলা যায় যে, রাজসিক ও তামসিক লোকের জন্য এরূপ পঞ্চমকারের ব্যবস্থা হইবার কারণ কি? তদুত্তরে

ইহাই জানা উচিত যে আমার প্রবৃত্তি যখন স্বতঃই ঐ সকল বিষয়ে রহিয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ঐ সকল কার্য্য অহরহঃ করিব বা করিয়া থাকি। সুতরাং লোকসমাজে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে ও বলে "বেটা মাতাল, বেটা বেশ্যাখোর, বদ্‌মাইষ্, বেটা একবারও ভগবানের নাম করে না", ইত্যাদি। কিন্তু আমি যখন গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কাপালিকের বেশে সিন্দূরের ফোঁটা লাগাইয়া ভগবদারাধনার ছলে ঐ সকল করি তখন আমায় কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় না অথচ লোকে সাধুজ্ঞানে আমাকে প্রণাম করে ও ভক্তি করে। ভগবদ্বিষয়ে আমার অনুরাগ থাকুক্ আর নাই থাকুক্ আমি মজার লোভে তাহাতে রত হই। পূর্ব্বে ভগবদ্বিষয়ের নামও করিতাম না, এখন অন্তরে না থাকিলেও, মুখে লোক দেখান "তারা" "তারা" শব্দ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "তারা" কি তাহা জানি না, কেবল মুখে বলি মাত্র। ইহাতেও কিছু উপকার আছে—সাধুর ভাণে, ধর্ম্মের ভাণে নানা প্রকার সাজ্ গোজ্ করিতে হয়। ধর্ম্মের এরূপ ভাণও ভাল, নচেৎ আর কিছুই ভাল নহে। উপরে যে সাত্বিক পঞ্চমকারের কথা বলা হইয়াছে তাহা কি—এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। তন্ত্রের মধ্যে যে সকল সাধন প্রণালী আছে, তন্মধ্যে পঞ্চমকার সর্ব্ব প্রধান। এই পঞ্চমকারের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রায় কোন তান্ত্রিকের কাছেই পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রে যে সকল বচন আছে তাহা অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু যদ্দ্বারা কাজ হইবে এমন লোক দেখা যায় না। বচনে সবই আছে বটে কিন্তু কাজে তাহা বুঝায় কে? প্রকৃত কার্য্য করাইবার লোক

অতি বিরল। এক্ষণে যতটুকু প্রকাশযোগ্য এখানে তাহাই বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ—মদ্য কাহাকে বলে এবং শাস্ত্রেই বা কাহাকে মদ্য বলিয়াছেন?

সোমধারা ক্ষরেদ্‌যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্‌ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

ইতি আগমসার।

অর্থাৎ হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারাক্ষরণ হয় তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়েন তাঁহাকেই মদ্যসাধক বলা যায়।

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

ইতি কৈবল্যতন্ত্র।

অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মেতে যোগবল দ্বারা যে প্রমদন (জ্ঞান) তাহার নাম মদ্য। অর্থাৎ সুরাপায়ী ব্যক্তিরা যাদৃশ শরীররক্ষণাবেক্ষণ বিষয়জ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দ লাভ করে, তাদৃশ বিষয়জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যে আনন্দজ্ঞান তাহার নাম মদ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে নাভিতে সূর্য্য এবং তালুমূলে চন্দ্র আছেন। সূর্য্যকে তালুমূলে আকর্ষণ করিয়া মিলন করায় চন্দ্র সূর্য্যের সমাগম হয়। সেই সমাগমে অনিল ও অমৃত স্বরূপ সুধা বায়ু অর্থাৎ মিষ্টবায়ু গলায় অনুভব হয়। ইহাই মদ্য এবং ইহাতে এক প্রকার নেসার মতন হয়। সাধক এইরূপ মদ্যপান করিয়া সদা সর্ব্বদা ভগবৎ নেসায় মাতিয়া থাকেন। সাধকবর রামপ্রসাদ সেনও যে এই প্রকার

মদ্যপান করিতেন তাহা তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে॥

সুরা পান করিনেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, মিছে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা।
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা।
রাম প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

কবির দাসও বলিতেন, "বিন্ মদ্ পিয়ে মাতোয়ারা" অর্থাৎ সাধকে মদ্যপান না করিয়াও মাতাল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সাত্বিক ভাবও রহিয়াছে, রাজসিক তামসিক ভাবও রহিয়াছে। আমার প্রবৃত্তি অনুসারে আমি রাজসিক ও তামসিক ভাব

গ্রহণ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে লক্ষ্যও করি না, বরং সাত্ত্বিক ভাবকে ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক পঞ্চমকারে আমি যে সুখ অনুভব করিতেছি, তাহাতে শরীর ও মন দিন দিন ক্ষীণ হইলেও প্রবৃত্তির এমনি অপার মহিমা যে, উহা আমাকে বোকা করিয়া রাখিয়াছে, কেহ বুঝাইয়া দিলেও স্বীকার করি না।

এক্ষণে দ্বিতীয় মকার মাংস কাহাকে বলে তাহা দেখা যাউক। তন্ত্রে এই কয়টী মাংসকে মহামাংস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

গোনরেভাশ্বমহিষ-বরাহোষ্ট্রোরগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্॥

অর্থাৎ গোমাংস, নরমাংস, হস্তিমাংস, অশ্বমাংস, মহিষ-মাংস, বরাহমাংস, উষ্ট্রমাংস ও সর্পমাংস এই অষ্টবিধ মহামাংস দেবতার প্রীতিকর। আরও কয়েক প্রকার মাংস উক্ত আছে, যথা—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎসর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥
ইতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ মাংস তিন প্রকার—জলচর, স্থলচর ও আকাশচর; এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক [illegible]

প্রথমোক্ত মাংস ও শেষোক্ত মাংস সকলের দ্বারা যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে অপ্রীতিকর মাংস কি আছে? আর এই গুলিত যদি দেবতার ও সাধকের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে রাক্ষসের প্রীতিকর যে কি হইবে তাহা ত ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। বাস্তবিক এইরূপ মাংস ভোজন করিলে যদি মাংস-সাধক হয়, তাহা হইলে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কে হইবে? ইহাতে কেবল জলচরের মধ্যে নৌকা, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে খট্টাঙ্গ বাদ পড়ে। এই কয়েকটী বাদে সবই ত খাইবার বিধি দেখা যায়। ইহাই কি ধর্ম্ম? এই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কি? আর ইহাই যদি দ্বিতীয় মকার মাংস হয় তাহা হইলে সাহেবদিগকে ঘৃণা করিবার আবশ্যক কি? তাহারাও ত মাংসসাধক॥ বাস্তবিক পশুমাংস বা পক্ষিমাংস ভোজন মাংসসাধকের লক্ষণ নহে। আগমসারে যাহা লিখিত আছে প্রকৃত পক্ষে মাংসসাধকের লক্ষণ তাহাই।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

ইতি আগমসার।

অর্থাৎ মা শব্দে রসনাকে বুঝায়, তদংশ বাক্য; ইহা রসনার প্রিয়। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ বাক্য সংযম করে সেই যোগী পুরুষকেই মাংসসাধক বলা যায়। পঞ্চমাত্রার মধ্যে গো এক মাত্রা। সেই গো শব্দের অর্থ জিহ্বা।

গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥

গোশব্দেনোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।
গোমাংসভক্ষণং তত্তু মহাপাতকনাশনম্‌॥
ইতি হঠপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ ও চন্দ্র হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয় সেই সুধাপান করেন, তিনিই কুলীন; অন্যে কুলঘাতক। গো শব্দে জিহ্বাকে বুঝায় এবং তালুমূলে তাহা প্রবেশ করানই গোমাংস ভক্ষণ, এই গোমাংস ভক্ষণ মহা-পাতক নাশক। এইরূপ গোমাংসভক্ষণে জিহ্বার সংযম এবং জিহ্বার সংযমে বাক্যের সংযম হয়। এই অর্থেই গৌরাঙ্গ বলিতেন—

গো ভোজনে বড় পুণ্য,
স্ত্রী থাকিতে গৃহশূন্য,
গুরু মেরে স্বর্গবাস,
হরি ভজলে সর্ব্বনাশ।

গুরূপদেশে কর্ম্মের সহিত যে সাধক ত্রিকূট দেশে জিহ্বার এইরূপ স্থিতি করাইতে পারেন, তিনি অপার আনন্দলাভ করেন এবং তাঁহার বাক্যের সংযম হয়। জিহ্বা না থাকিলে কথা কহা যায় না, সুতরাং জিহ্বার সংযমে বাক্যেরও সংযম হইয়া থাকে। এই জিহ্বার কর্ম্ম সাধককে মাংসসাধক কহে। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা জিহ্বার গোড়া ছেদন করিয়া জিহ্বারূপ মাংস ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের বুদ্ধি ভগবানের অপেক্ষাও বেশী, তাই তিনি যাহা করিয়া দেন নাই স্বভাবের বিরুদ্ধে আমরা তাহাই করিতে যাই। কি মূর্খতার কার্য্য!!! কেবল না বুঝিবার দোষেই

আমরা ঐরূপ করিয়া থাকি। ফুকো দেওয়া দুগ্ধ যেমন খাইতে সুমিষ্ট হয় না এবং উহা যেমন দেবদ্বিজে দেওয়া উচিত নহে, তদ্রূপ ছিন্ন জিহ্বার দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। কেননা, যে স্থানটী কাটা হয় সেই স্থানের ক্ষত শুকাইলে সেই স্থানটী আর বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং কেবল কাটাকুটিই সার হয় মাত্র। তবে লোককে দেখাইয়া পয়সা উপায়ের সুবিধা হইতে পারে। আমার ন্যায় অজ্ঞলোকের দ্বারা ধর্ম্ম চালিত হওয়ায় সময়ে সময়ে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে কর্ম্মযোগের শিক্ষা পান তাঁহারা কাটাকুটির হাত এড়াইয়া থাকেন। জিহ্বা ছেদন করিবার আদৌ আবশ্যক নাই। সদ্‌গুরুর উপদেশে জিহ্বার ত্রিকূট দেশে স্থিতি আপনা আপনিই হইয়া থাকে। ইহাতে যদি বলা যায় যে, শাস্ত্রেও যখন ছেদন করিবার বিধি আছে তখন ছেদন না করি কেন? কিন্তু যদি সহজ উপায়ে আমার তাহা লাভ হয় এবং ছেদন অপেক্ষাও কার্য্য ভাল হয়, তাহা মন্দ কি? যখন হাজার হাজার লোকের সেই কার্য্য বিনা ছেদনে সমাধা হইতেছে তখন কাটিবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক শাস্ত্রে সুন্দর সুন্দর সাধন প্রণালী থাকিলেও ব্যবসায়ী-দিগের হাতে পড়িয়া অনেক সময় অনেককে কষ্টকর ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই দ্বিতীয় মকারের এমন উৎকৃষ্ট বিষয় থাকিতেও আমার ন্যায় তামসিক ভাবাপন্ন গুরুর হাতে পড়িয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুর ন্যায় হাড় মাস চিবাইতে হইতেছে। হায়! হায়! সাত্ত্বিক পঞ্চমকার থাকিতে আমায় রাক্ষসের ন্যায় ধর্ম্মপালন করিতে হইতেছে!!! ধন্য আমার

ধর্ম্মশিক্ষায় এবং ধন্য আমার গুরুগিরিতে। এইরূপে সাত্ত্বিক ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন আর প্রায় কেহ তাহার নামও করে না। এই ত সাত্ত্বিক মকার মাংসের কথা বলা হইল।

এক্ষণে পঞ্চমকারের তৃতীয় মকার মৎস্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই তৃতীয় মকার মৎস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারায় জড়ভাবে তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া থাকি। জড় অর্থে—শাল মাছ, বোয়াল-মাছ, ও রুই মাছ এই তিন প্রকার মৎস্যকে উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ধাইমাছ, চিংড়িমাছ, মাগুরমাছ প্রভৃতি কণ্টক-হীন মৎস্যকে মধ্যম বলে। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে যদি মাছের কাঁটা গলায় বিদ্ধ হয় তাহা হইলেই বিষম বিভ্রাট—এই আশঙ্কায় বহুকণ্টকাকীর্ণ মৎস্যকে অধম বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে যখন উত্তম পঞ্চমকার বহিয়াছে তখন আবার এই ঘৃণিত পঞ্চমকার থাকার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, যাহারা কিছুই করিতে চাহে না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির নাম মাত্র নাই অথচ মদ্য মাংস সেবন প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে সর্ব্বদা রত, ভুলিয়াও ভগবানের নাম করে না, তাহাদিগকে সাধন মার্গে প্রবৃত্ত করাইবার এই প্রলোভনই এক মাত্র সদুপায়। ইহাতে মাংসাদি ভোজন ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়া সম্ভব, কেননা নিত্য মাংসাদি সেবন করা অপেক্ষা পূজাপার্ব্বণাদি উপলক্ষে করায় হিংসাদি অনেক কমিয়া আইসে। কিন্তু যদি গুরু সাত্ত্বিক না হন তাহা হইলে উন্নতির আশা কিছু মাত্র নাই, কারণ, এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া অনুতাপের

সহিত মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। কিন্তু গুরু যদি সাত্ত্বিক হন তাহা হইলে এরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পরন্তু তিনি শীঘ্রই শিষ্যকে তামসিক ও রাজসিক মৎস্যাদির পরিবর্ত্তে সাত্ত্বিক মকার সাধনে প্রবৃত্ত করেন। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন এই গুলিতে যদি ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে অধর্ম্ম যে কি এবং কিসে হয় তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না। এখন দেখা যাউক বাস্তবিক মৎস্যের তাৎপর্য্য কি। প্রথমতঃ দেখা যাউক শাস্ত্রেই বা কি বলিয়াছেন—

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুইটী মৎস্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করেন তিনিই মৎস্যসাধক। গঙ্গা অর্থে ঈড়া এবং যমুনা পিঙ্গলা; এই নাড়ীদ্বয় মধ্যে সর্ব্বদা যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে তাহাই মৎস্য। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণকে স্বতঃ স্থির করেন তিনিই মৎস্যসাধক।

এখন দেখা যাউক চতুর্থ মকার মুদ্রা কি বা কাহাকে বলে? প্রকৃত সদ্‌গুরুর অভাবে সকল স্থলেই সাত্ত্বিক ভাব পরিত্যক্ত হইয়া ঘৃণিত তামসিক কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুদ্রাসাধনও তদ্রূপ। আজকাল যে মুদ্রাসাধন হয় সাধারণ কথায় লোকে তাহাকেই মদের চাট্ বলে। চাল কড়াই ভাজা, চীনের বাদাম ভাজা, তিল ভাজা, ছোলা ভাজা ইত্যাদি মুদ্রা—কেবল খৈ ও মুড়িই অধম বলিয়া উক্ত আছে। ঐ সকল ভাজাই যদি মুদ্রাসাধন

হয়, তাহা হইলে প্রায় সকলেরই ত মুদ্রাসাধন হইয়া থাকে। হায়! হায়! প্রবৃত্তির কি অপার মহিমা!!! প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমি কি সাধনই করিতেছি!!! আমার ঘৃণাও নাই, লজ্জাও নাই, তাই এখনও সমাজে পোড়ার মুখ দেখাইয়া বেড়াই!!! ছি ছি কি লজ্জার বিষয়!!! এ কথা লোককে বলিতেও লজ্জা করে না। আর ইহাই যদি সাধনাঙ্গ হয় তাহা হইলে পাপকার্য্য কি? আগমসারে মুদ্রার বিষয় যাহা লিখিত আছে তাহাই একমাত্র মুদ্রাসাধন; নচেৎ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ মাত্র। আগমসারে উক্ত আছে—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

অর্থাৎ স্বশরীরস্থ সহস্রদলকমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত কূটস্থ মধ্যে পারদের ন্যায় নির্ম্মল শুভ্রবর্ণ কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্যের আভা অপেক্ষাও অধিক প্রকাশ অথচ শীতল আভাযুক্ত অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনী সংযুক্ত যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই মুদ্রাসাধক। এই কুণ্ডলিনী প্রাণরূপে দেহের মধ্যেই রহিয়াছেন—

"সা দেবী বায়বী শক্তিঃ" ইত্যাদি।

ইতি রুদ্রযামল।

গুরূপদেশে যিনি উক্তরূপে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন তিনিই মুদ্রাসাধক, অপরে নহে। হায়! হায়!

এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য থাকিতে আমরা কি ঘৃণিত কার্য্যেই রত হইতেছি !!! কিন্তু ইহা বলিবারও জো নাই, কেননা, তাহা হইলেই আমি শাস্ত্রদ্বেষী ও অহিন্দু বলিয়া ঘোষিত হইব। ধিক্ আমার উপাসনায়, ধিক্ আমার গুরুগিরিতে এবং ধিক্ আমার ধর্ম্ম আলোচনায় !!! নতুবা সাধনের এমন উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল থাকিতে এরূপ ঘৃণিত তামসিক আচার অনুষ্ঠিত হইবে কেন ? চিরকালই কি এইরূপ রাজসিক ও তামসিক ভাবে থাকিতে হইবে ? তাহা হইতে কি আর উঠিতে হইবে না ? চিরকালই কি এক ভাবে যাইবে ? চিরকালই কি ঘৃণিত ভাবে পড়িয়া থাকিতে হইবে ? সাত্ত্বিক ভাবে কি দৃষ্টি করিব না ? আমার ন্যায় এরূপ তমঃ প্রধান লোকের দ্বারাই ত তন্ত্র সকল কিম্ভূত কিমাকার ভাবে দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কাহারও মুখে সাত্ত্বিক ভাবের কথা পাওয়া যায় না। রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি। কেহ দেখাইয়া দিলেও এই ভ্রম স্বীকার করি না, বরং যিনি ভ্রম দেখাইয়া দেন তাঁহাকেই ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিই। প্রবৃত্তিশক্তির এমনি অপার মহিমা যে সামান্য সুখের লালসায় এরূপ ঘৃণিত বিষয়কেও ঘৃণা না করিয়া বরং তাহারই সেবা করিতেছি, অথচ ইহাতে যে কাহার ক্ষতি হইতেছে তাহা একবারও ভাবিনা !!!

পঞ্চমমকার মৈথুন তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উৎকৃষ্ট বিধি আছে কিনা অধুনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগমসারে মৈথুন সাধকের যে লক্ষণ উক্ত আছে তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্ব স্ব

প্রবৃত্তির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিতেছি। সমাজের নেতার অভাবে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন ও বলিতেছেন। যাঁহারা সমাজের নেতা তাঁহারাও অর্থলোভের বশীভূত হইয়া অর্থ এবং যশঃ প্রত্যাশায় ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞানে ব্যবস্থাদি দিয়া দেশকে ধর্ম্মশূন্য করিতে বসিয়াছেন। এখন প্রকৃত ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম জ্ঞানে তাহারই যাজন করা হইতেছে। হায়! কি পরিতাপের বিষয় যে, ইহা বলিবারও জো নাই!!! কিন্তু একবারও ভাবিনা যে, যদি যোনিতে মৈথুন করাটাই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম কি? আগমসারে উক্ত আছে—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদোচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্।

ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি ॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্ ।
আবাহনং সীৎকারং নৈবেদ্যমুপলেপনম্ ॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা ।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকপ্রিয়ে ॥

এই মৈথুনতত্ত্বই সৃষ্টিস্থিতি ও অন্তের কারণ। এই মৈথুন হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা হয় এবং সুদুর্লভ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শরীরাভ্যন্তরে নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ রকারের (তেজস্তত্ত্বের) সহিত আকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যখন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির (ব্রহ্মযোনির) মধ্যস্থিত বিন্দুস্বরূপ মকারের মিলন হয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ হয় তখনই আনন্দ-ময় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঊর্দ্ধে এইরূপ স্থিতিলাভ হইলে যে অবস্থা হয় সেই অবস্থায় রমণ করার নাম রাম। এই রাম নাম মুখে বলা যায় না। ইহাই উল্টা রাম নাম। এই উল্টা রাম নাম জপ করিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তুলসী দাসের রামায়ণেও ইহার প্রকাশ আছে যথা—

উলটা নাম জপৎ জগ্ জানা।
বাল্মীকি হুয়া ব্রহ্ম সমানা।

কিন্তু আমরা রাম রাম হাজার হাজার বার করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাকুক মনের একটুও শান্তি পাই না। ইহার কারণ এই যে আমরা সদ্গুরুর অভাবে সবই বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

মৈথুন সাধক সহস্রারে আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন,

একারণ রাম নামের অর্থ তারক ব্রহ্ম। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে এইরূপ রাম নাম স্মরণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা গুরূপদেশে আত্মক্রিয়ায় রত থাকা উচিত। কেননা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি মৃত্যুকালে এইরূপ রাম নাম স্মরণ করেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। এই আত্মতত্ত্বই সকল প্রকার পূজা এবং উহা জপাদিরও ফলপ্রদান করিয়া থাকে। গুরূপদেশে ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া দ্বারা মন্ত্র সকল প্রসন্ন অর্থাৎ চৈতন্য হয়। ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া গুরূপদেশগম্য। ন্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা হৃদয়ে বায়ুকে ধারণ করার নাম আলিঙ্গন এবং স্থিতিপদে মগ্ন হওয়ারূপ অবস্থার নাম চুম্বন। ইহাই ধ্যানাবস্থা এবং এই ধ্যান ১৭২৮ প্রাণায়ামে হইয়া থাকে। কেবলরূপ কুম্ভকের অবস্থায় আবাহন হয়। এই আবাহনকেই সীৎকার বলে। এই প্রকার করিতে করিতে যে অমৃত ক্ষরণ হয় তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখাই নৈবেদ্য। অজপারূপ জপক্রিয়াই রমণ এবং এইরূপ রমণ করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ পারার ন্যায় রেতঃ অর্থাৎ শিববীর্য্য দৃষ্ট হয় এবং উহা দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র তৃপ্তি-রূপ আনন্দের উদয় হয়। ইহাই রেতঃপাত অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের অবস্থা। ইহাই মৈথুনতত্ত্ব এবং ইহা পার্ব্বতীকে মহাদেব সর্ব্বতোভাবে গোপন করিতে বলিয়াছেন। হায়! হায়! এমন সকল উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক কর্ম্ম থাকিতে আমার প্রবৃত্তির দোষে রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মকে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছি !!!

এইরূপে প্রায় সকল সম্প্রদায়েই সাত্ত্বিক কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের অভাবে এমন সোণার ভারত আজ

শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে !! যোগমার্গ পরিত্যাগ করাই ইহার একমাত্র কারণ। প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতীত কেহ সাত্ত্বিক কর্ম্মা হইতে পারে না। এক প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অভাবে সাত্ত্বিক ভাব লুপ্ত হওয়ায় দেশ রজস্তমঃ প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রজস্তমঃ গুণের প্রাধান্যেই দেশে এত অশান্তি। আশু সুখের লালসাতেই আমরা এত কষ্ট ভোগ করিতেছি। প্রায় কাহারও অন্তরেই সুখ নাই। কেবল চড়কে হাসি হাসিয়া লোকের কাছে আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। অন্তরে সুখের লেশ মাত্রও নাই, সদা সর্ব্বদাই ঘোর অশান্তিরূপ বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছি। এ জ্বালা কিছুতেই যাইতেছেনা এবং জ্বালা নিবারণের উপায়ও দেখিতেছি না। উপায় যে নাই এমত নহে। কিন্তু হায়! উপায় দেখিবে কে? আমি রজস্তমো মদে মত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ আসুরিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া থাকি। যাঁহারা আমার উপদেষ্টা তাঁহারাও আমাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দুই এক টাকা দিতে পারিলেই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "আপনার ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আজ কাল আর দেখা যায় না, যাহা কিছু সদ্‌গুণ, সে সকল আপনাতেই আছে, আপনার ন্যায় শিবতুল্য ব্যক্তি আর কোথায় পাইব" ইত্যাকার নানাপ্রকার বাক্যে আমার ন্যায় বোকা চৈতন্যকে মজাইয়া অসার বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন এবং আমিও দুই একটা বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও ভক্ত ইত্যাদি নানারূপ

উপাধিতে ভূষিত হইয়া সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রকারান্তরে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়া থাকি। ইহা যে সব আমারই দোষ এমত নহে, কারণ, আমি উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে বাহ্য রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে রত হওয়ায় আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার অন্তরে সুখ না থাকায় আমি নানারূপ দৈহিক ও মানসিক কষ্টে কোনরূপে দিন কাটাই মাত্র। আমার সুখের আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কেননা আমি যে সকল বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সে সকল রাজসিক বা তামসিক। রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মের ফল পরিণামে বিষতুল্য। সুতরাং আমায় বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে। এই বিষময় ফলে দেশের কোথাও বা দুর্ভিক্ষ কোথাও বা মহামারী অকালমৃত্যু ইত্যাদি প্রায়ই হইতে দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না। এই সকল নিবারণের উপায় থাকিতেও কাহারও তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রেই সেই সকল উপায় রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাহা দ্বারা পরমানন্দ ও পরমা গতি লাভ হইবে আমরা তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হই। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অষ্টাদশ গীতা রহিয়াছে এবং এই সকল গীতার মধ্যে যোগবিষয়ক সাত্ত্বিক কর্ম্মের এমন সকল উপদেশ আছে যদ্দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দ ও পরমা গতি লাভ হয়। সেই সকল গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সমস্তই বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাণোক্ত যোগোপদেশ ও কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল পুরাণোক্ত দেবগণের আচার ব্যবহার গল্পের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকি মাত্র। সুতরাং

বিপরীত ফলও পাইয়া থাকি। বিপরীত ফল ফলিবার কারণ এই যে, দেবগণের কার্য্য ও আচার ব্যবহার বাহ্য চক্ষে দেখিতে গেলে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হওয়ায় দেবগণকে সামান্য মানবের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত আজ কাল বিরল নহে। ইহাতে দেবচরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করা হয় মাত্র, আর কিছুই নাহ। যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত কিছুতেই পুরাণের গূঢ় তাৎপর্য্য বা রহস্য অবগত হইতে পারা যায় না। যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করিয়া সাধারণকে শ্রবণ করান তাঁহারা এরূপ ঘৃণিতভাবে কথকতা করেন যে তাহা শুনিবারও অযোগ্য। কিন্তু এক কালে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, সেই পুরাণ লক্ষ লক্ষ স্থানে পাঠ হইতেছে অথচ কাহারও ত শান্তিলাভ হইতেছে না!!! শান্তির পরিবর্তে বরং অশান্তির বৃদ্ধিই দেখা যায়। যে পুরাণ শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাণ শ্রবণ করিয়াও, শান্তিলাভ দূরে থাকুক্, অশান্তির জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। পরীক্ষিৎ যে পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন আমি কি তবে তাহা শ্রবণ করিতেছিনা? যদি সেই পুরাণই হয়, তাহা হইলে শান্তির স্থলে আমার অশান্তি লাভ হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, উপস্থিত কালে যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই যোগী নহেন। যোগী ব্যতীত কেহই পুরাণাদি শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। ইহাতে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল।

কোন দেশে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার

কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের অভাব না থাকিলেও তাহা হইতে তিনি কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া দিন দিন বরং বিষয়রূপ বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছিলেন। একদা সেই রাজা তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীকে নিজ মনের ভাব জ্ঞাপন করিয়া কিসে শান্তিলাভ হইবে তাঁহাদিগকে তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে রাজাকে ব্রত, পূজা, জপ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পুরশ্চরণ ইত্যাদি নানা প্রকার মাঙ্গলিক কাম্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সকল কার্য্যের দ্বারা আপনার শান্তি-লাভ হইবে। রাজাও সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উপদেশ মত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু দিবস ধরিয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়াও রাজা কোনরূপ শান্তি না পাইয়া বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চিন্তার দ্বারা নিজে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, নিজ কুল-গুরুকে স্বগৃহে আনয়ন করাইয়া স্বীয় অশান্তির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন ও কহিলেন, দেব! আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কথা-মত যাগ, যজ্ঞ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বার, ব্রত, নিয়মাদি করিয়াও কিছুমাত্র শান্তি পাইলাম না, বরং শান্তির স্থলে অশান্তির আধিক্যই দেখিতেছি। আমার শরীর ও মন অশান্তিতে জর জর হইতেছে। পরন্তু, পণ্ডিতগণ সভাস্থলে আমাকে সম্বোধন করিয়া যখন বলেন যে, মহারাজ বড় সাত্ত্বিকপ্রকৃতি এবং অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক ও সদাশয়, শান্তি যেন মহারাজের দাসী হইয়া মহারাজের অঙ্গ শোভা করিতেছে, মহারাজের ন্যায় দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তি আর কুত্রাপি কাহারও দেখিতে পাওয়া

যায় না, তখন ঐ সকল বাক্যে আমার আরও অন্তর্দাহ হইয়া অন্তরে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হয়। মানাপমান বোধ থাকায় পাছে লোকে আমায় ঘৃণা করে এই আশঙ্কায় মনের কথা ব্যক্ত করিতেও পারি না। সুতরাং ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে ঐ সকল বাক্য শুনিয়া যাই মাত্র। নতুবা আমি ইহার যথোচিত দণ্ড দিতে পারিতাম। লোকলজ্জা ভয়েই কেবল তাহা পারি নাই। গুরো! এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি আপনার শরণাগত, যাহাতে আমার এই অশান্তি দূর হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভ হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন্। আমি আপনার শিষ্য পুত্রতুল্য আমার এই জ্বালা নিবারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্।

মহারাজের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু মহারাজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি পুরাণ শ্রবণ করুন; পুরাণোক্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনার শান্তি লাভ হইবে। এক কালে রাজা পরীক্ষিৎ এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আপনারও তাহাই হইবে। আমি স্বয়ং সেই পুরাণ পাঠ করিব এবং যাহাতে মহারাজের শান্তিলাভ হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়া আপনাকে শান্তি প্রদান করিব। গুরুদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ পুলকিত হৃদয়ে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব শাস্ত্র হইতে রাজোচিত বিধি অনুযায়ীক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন এবং শুভদিন স্থির করিয়া মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজও সেই

ব্যবস্থাপত্র তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, অমুক দিন হইতে পুরাণপাঠ কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং গুরুদেব স্বয়ং পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইবেন, অতএব ব্যবস্থাপত্র অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে যেন সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত থাকে। মন্ত্রীও এই কথা শুনিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যথাসময়ে সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট শুভদিন আগত হইলে যথাসময়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুরাণ পাঠ কার্য্যও আরম্ভ হইল। গুরুদেব নিত্য কথকতা দ্বারা মহারাজকে পুরাণ শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাল পুরাণ শ্রবণ করিয়া পুরাণ সমাপন হইলে পর মহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন, আমি পুরাণ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে যাহা ছিল এক্ষণে তাহা হইতে আমার অশান্তি কিছুমাত্র দূর হয় নাই, বরং ভগবৎলীলা শ্রবণ করিয়া আরও সংশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পুরাণ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমার শান্তি লাভ হইবে; কিন্তু কৈ তাহা ত আমার হইল না, এক্ষণে অশান্তিতে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। এত অর্থব্যয় করিলাম, শারীরিক কষ্ট সহ্য করিলাম, আপনারা যাহা যাহা বলিলেন তৎসমুদায়ই প্রাণপণে পালন করিলাম অথচ শান্তি লাভ হইল না। অতএব এখন আর ব্রাহ্মণ বা গুরু বলিয়া মানিব না, যদি আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার শান্তির উপায় করিতে না পারেন, তাহা হইলে অদ্য হইতে সপ্তাহের পরদিবস প্রাতে আপনাকে সবংশে নিধন করিব; অদ্য আপনি বাটী যাউন।

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুর মস্তকে যেন বজ্র পাতন হইল। তাঁহার পা আর চলেনা, চক্ষুর যেন আর দৃষ্টি নাই, তবে কোন গতিকে লোক সাহায্যে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাটীতে আসিয়াই একটা ঘরের মধ্যে শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, কথা কহিবার শক্তিও যেন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার গাত্রে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে। ব্রাহ্মণ রাজগুরু, সুতরাং তাঁহার দাস দাসীর অপ্রতুল নাই। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র সন্তান, কিন্তু তিনিও পাগল। পুত্র বাটীতে প্রায় থাকেন না, কেবল আহারের সময় এক এক বার বাটীতে আসিয়া জননীর নিকট হইতে কিছু খাইয়া বাটী হইতে পলাইয়া যান। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আবল্ তাবল্ বকিয়া উড়াইয়া দেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্রবধূ বাটীতেই আছেন। পুত্রবধূর কোলে একটী মাত্র শিশু পুত্র। শিশুটীর বয়স ৪।৫ বৎসর হইবে। পুত্রবধূটী দেখিতে শুনিতে মন্দ নহেন। ভাল না বলিয়া মন্দ নহেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বধূঠাকুরাণী আজ কালের বধূ-ঠাকুরাণীদিগের মতন ভাল নহেন, এবং হাটেবাজারের বা বঙ্গ-সাহিত্যের পুস্তকে বর্ণিত কেবলমাত্র মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্যে সুন্দরীও নহেন। ইনি গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীরূপা, অতিথির পক্ষে মা অন্নপূর্ণাস্বরূপা, দাসদাসীদিগের পক্ষে জননী-রূপা, পতিপ্রাণাদিগের মধ্যে কাত্যায়নীরূপা, সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রীরূপা এবং জননীদিগের মধ্যে গণেশজননীবিশেষ। তাই বলা হইয়াছে যে, ইনি আজকালের ভাল নহেন। আজকাল

সবই ইহার বিপরীত। যাহা হউক পুত্রবধূ শিশু পুত্রটীকে ক্রোড়ে করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পার্শ্বে বসিয়া শ্বশুরকে ব্যজন করিতেছেন। মুখে কথা কহিতেছেন না, কারণ, ইনি আজ কালের বউ ঝির মতন চপলা নহেন। আরও বিশেষ শাশুড়ী ঠাকুরাণী উপস্থিত থাকিতে কোন কথা কহা উচিত নয় বোধে কেবল শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আজ্ঞা পালন করিবার মানসে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। আর শ্বশ্রূঠাকুরাণী যখন যাহা করিতে বলিতেছেন তন্মুহূর্ত্তে তাহা করিতেছেন। পুত্র বাটীতে নাই, কোথায় গিয়াছেন তাহাও কেহ জানে না। জানিলে ডাকাইয়া আনা হইত। সুতরাং ডাকা হয় নাই। আর তিনি পাগল, তাঁহাকে ডাকিলেই বা কি হইবে? পাগলের দ্বারা আর কি উপকার হইতে পারে? সকলে কপালে হাত দিয়া বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর ব্রাহ্মণকে বাতাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ চৈতন্যরহিত শবের ন্যায় পড়িয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময় পুত্র বাটী আসিলেন। বাটীতে আসিয়া মা মা শব্দ করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, মা আমার ক্ষুধাবোধ হইয়াছে আমাকে কিছু খাইতে দিন। মা পুত্রের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আজ বাড়ীতে বড় বিপদ, কর্ত্তা রাজবাড়ী থেকে এসে অচৈতন্যবৎ প'ড়ে আছেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছেন। শুন্‌লাম রাজা রাজসভায় কি না কি বলেছেন, তাই শুনে অবধি কর্ত্তা এইরূপ হয়েছেন। আমরা কিছুতেই তাঁর চৈতন্য করতে পারিনি।

বাবা ! আজ আমাদের যে কি বিপদ হয়েছে যদি তোমার জ্ঞান থাক্‌তো তা হ'লে তুমিও এতক্ষণ কত কাতর হ'য়ে তোমার জনকের সেবায় নিযুক্ত হ'তে ।"

মা ! বিপদ কি মা, বিপদ কাকে বলে মা, কার বিপদ হয়েছে মা। মা ! আমার ক্ষিধে পেয়েছে মা ; কি খেতে দিবি মা, খেতে দে। বিপদ আবার কি মা, বিপদে কি করে মা ; বিপদ বড় ভাল, মা বিপদ যেন সর্ব্বদা হয়।

আঃ ! হা বিধাতঃ ! হা আমার পোড়া কপাল ! বাবা, তুমি পাগল না হ'লে আর এমন কথা বল যে বিপদ বড় ভাল ! বিপদ আমার সর্ব্বদা থাকুক্‌ ! বাবা, অমন কথা বল্‌তে নাই, বিপদের মত আপদ আর সংসারে নাই, বিপদ যেন পরম শত্রুরও না হয়। বাবা ! তোমায় আজ কি খেতে দিব, আজ ত রান্না বান্না কিছুই হয় নাই। বউমাও আজ রান্না ঘরে যান্‌নি। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কর্ত্তার জন্য কাতর হয়েছে, কর্ত্তা ভাল না হ'লে আমরা রান্না বান্না আর কিছুই কর্‌ব না।

মার নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র দ্রুতপদে পিতার নিকট গিয়া পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "বাবা ! আপনি উঠুন্‌। রাজবাটীতে কি হইয়াছে এবং তাহার জন্য এত ভাবনা কেন ? আমি সব মীমাংসা করিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ জড়বৎ পড়িয়া থাকিলেও পুত্রের কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, "বাবা গোপাল ! কি বলিতেছ ? তুমি আমার পাগল গোপাল। আমার যে বিপদ হইয়াছে তাহা আমার একলার নহে, তাহা তোমার আর এই পরিবারবর্গের

সকলেরই। অদ্য মহারাজের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হৃদয়বিদারক শূলবৎ কঠোর। ওঃ! আর সহ্য হয় না, আর বলিতে পারি না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!! আমার নিজ পাপের দোষে, বাবা, তোমরা সকলেই রাজার কোপানলে পড়িয়াছ। রাজা অদ্য হইতে সপ্তাহের পরদিবস প্রাতে আমার পরিবারবর্গের মস্তক ছেদন করাইয়া তৎপরে আমার মস্তক ছেদন করাইবেন। হা বিধাতঃ! এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই কেন আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না! এখনও কেন দেহ রহিয়াছে!!

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা কি বিনা অপরাধে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন? না ইহার কোন কারণ আছে?

পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা! ইহার কারণ অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা আর তোমায় বলিয়া কি করিব। তুমি যদি আমার পাগল না হইতে তাহা হইলে বলিতাম। আর পাগল না হইলেই বা তুমি কি করিতে? আমিই যখন কিছু করিতে পারিলাম না, তখন পাগল না হইলেই বা তুমি আর কি করিতে? ভাল, তোমাদের যখন শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে তখন শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শান্তিলাভের ইচ্ছায় রাজা অপরাপর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপদেশে নানা প্রকার যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমায় আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজার মনে শান্তি উৎপাদন করাইবার মানসে আমি রাজাকে পুরাণ শ্রবণের উপদেশ করি।

মনে করিয়াছিলাম, পুরাণ শ্রবণে রাজার মনে শান্তি হইবে এবং আমারও দশ টাকা লাভ হইবে। কোন গতিক করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করিব। কিন্তু দেখিতেছি তাহার ফল বিপরীত হইল—"লাভঃ পরং গোবধঃ।" পুরাণ শ্রবণে রাজার শান্তি হইল না। কিসে যে রাজার শান্তি হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রাজাকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সবই করান হইয়াছে, কিছুতেই তাঁহার শান্তি লাভ হয় নাই। আর কিসে যে হইবে তাহাও জানি না। রাজ পরিবারদিগের নিকট প্রায় মধ্যে মধ্যে পুরাণ পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়া থাকি। তাঁহারা সকলেই বেশ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আমারও পুরাণপাঠের বেশ যশ আছে। কিন্তু এমন ঘোর মহাবিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও আর দেখিতেছি না। রাজা যেরূপ বুদ্ধিমান্ তাহাতে তাঁহার নিকট কোন ফাঁকিও চলিবে না। তিনি আর কোন ব্যবস্থাও মানিবেন না। তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছি যে, এই সকল কর্ম্মের দ্বারা আপনার পরকালে শান্তি হইবে। ইহাতে তিনি বলেন যে, ইহকালেই যদি আমার মনের শান্তি না হইল তাহা হইলে পরকালে যে হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি? যাহার ইহকালে শান্তি নাই, তাহার পরকালেও শান্তি নাই। শাস্ত্রে যাহা যাহা লিখিত আছে, আমার বোধ হয়, সে সকলের কিছুই ভুল নহে তবে আপনারা তৎসমুদায়ের মর্ম্ম অবগত নহেন। আপনারা কেবল লোক ভুলাইয়া ও স্ত্রীজাতি ভুলাইয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইয়া থাকেন এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষদিগকেও পরকালে (ইহ-

কালে নহে) স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া নানা রূপ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন মাত্র, আর কিছুই নহে। বাবা গোপাল! রাজা এইরূপ সব কথা বলিয়া থাকেন। বাবা, এই সকল কর্ম্ম করাইয়া মাথার চুল পাকিয়া গেল, কিন্তু এরূপ ভাবের কথা কেহ কখনও বলা দূরে থাকুক্ আমি কর্ণেও শুনি নাই। বরং সাধারণের নিকট হইতে মান সম্ভ্রমই পাইয়া আসিতেছি। এরূপ বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। জীবনের আশা আর কাহারও নাই। রাজার যেরূপ কোপ, তাহাতে বোধ হয় তিনি তাঁহার রাজত্বের মধ্যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশ সমূলে নির্ব্বংশ করিবেন। ওঃ! আর আমি বলিতে পারি না, আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে এবং আমি চক্ষে চতুর্দ্দিকেই যেন সরিষা ফুল দেখিতেছি। বাবা গোপাল! একবার আমার কোলে আয়। বাবা, তুমি আমার একমাত্র পাগল পুত্র। এবার বুঝি আমার বুদ্ধির দোষে আমার জীবনের সহিত তোমাদের সকলকেই হারাইলাম। হা বিধাতঃ! হা ভগবন্! আমার কপালে এত পাপ ছিল যে রাজদণ্ডে অপঘাতে প্রাণ যায়!! হা জগদীশ্বর! রক্ষা কর, তুমি ব্যতীত আর উপায় নাই। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে মৃতের ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ ব্যতীত আর আর সকলেই উচ্চ রবে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ নীরবে বসিয়া এক হস্তে শ্বশুর ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন ও এক হস্তে মস্তকের কাপড় টানিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন এবং মধ্যে

মধ্যে এক একবার নিজপতির মুখাবলোকন করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল পরে অবনত মস্তকে শ্বশুরঠাকুরের চরণ দর্শন করিতেছেন। পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীর অন্তরে কোনরূপ শোক বা ভয়ের উদয় হয় নাই, কারণ, পতিব্রতা জানেন যে, পতিব্রতার কোন রূপ বিপদ হইতে পারে না। সুতরাং পতিব্রতার বদনেও কোন রূপ শোক বা ভয়ের চিহ্নও প্রকাশ পায় নাই। বরং প্রশান্ত ও প্রফুল্ল বদনই বোধ হইতেছে। পতিব্রতার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার শশীরন্যায় প্রফুল্ল বা প্রশান্ত নহে। কেননা চন্দ্রে কলঙ্কের চিহ্ন আছে, পতিব্রতার তাহা নাই। সুতরাং পূর্ণিমার শশীর সহিত পতিব্রতার বদনের তুলনা হইতে পারে না। আরও বিশেষ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, হ্রাসবৃদ্ধি থাকিতে প্রকৃষ্টরূপ শান্তি হয় না। স্থিতি ব্যতীত শান্তি সম্ভবে না। সুতরাং পূর্ণিমার শশীকেও প্রফুল্ল বা প্রশান্ত বলা যাইতে পারে না। পদ্মিনী যেমন নিজ পতির প্রকাশে প্রফুল্লহৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়, নিজ স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া পতিব্রতার বদন-কমলও তদ্রূপ প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রস্ফুটিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে অবস্থা হয় তাহাই প্রফুল্ল। চন্দ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি আছে দেহেরও তদ্রূপ হ্রাসবৃদ্ধি আছে। দেহাভিমান অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞান যতকাল থাকে দেহের হ্রাস বৃদ্ধিও ততকাল থাকে। দেহাভিমান থাকিতে শান্তি হওয়া অসম্ভব। কেননা দেহাভিমান থাকিতে রিপুকুল দমিত হয় না এবং রিপুদমন ব্যতীত শান্তিও হয় না। কিন্তু পতিব্রতা নিজ পতিতে তন্ময় হওয়ায় দেহে আসক্ত নহেন। তাঁহার মনে পতির রূপ ব্যতীত আর কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং

তাঁহার অন্তর শান্তিপূর্ণ এবং সেই শান্তি বদনে প্রকাশিত সুতরাং তাঁহার বদনও প্রশান্ত ও প্রসন্ন হইয়াছে।

পুত্র ও পুত্রবধূ ব্যতীত আর আর সকলেই শোকাচ্ছন্ন। পুত্র সকলকেই কাতর দেখিয়া মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা! বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। আপনি একটু স্থির হউন, কোন ভয় নাই, আমি উপায় করিতেছি।

মা পুত্রের বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবা গোপাল! তুমি কি উপায় করবে? বাবা, তুমি যে আমার পাগল, তোমার কথায় যে বাবা ধৈর্য্য ধারণ করতে পারি না। বাবা! আমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত!! আমি পতির সহিত তোমাকেও হারাব!! রাজা যদি আমার জীবন নিয়ে তোমাদের জীবন দান করেন, তা হ'লে আমি আমাকে ধন্য ও পরম সুখী মনে করব। বাবা! তুমি গিয়া রাজাকে আমার এই কথা বল, কিম্বা চল আমিও তোমার সঙ্গে গিয়া রাজার কাছে আমার জীবন দিয়া তোমাদের জীবন ভিক্ষা করি।

পুত্র বলিলেন, মা! আপনি কেন এত ব্যস্ত হইতেছেন, আমাদের কিছুই ত হয় নাই। মা! সর্ব্বনাশ ত আমাদের এখনও হয় নাই, সর্ব্বনাশ না হইলে কাহারও ভাল হয় না, সর্ব্বনাশ জীব মাত্রেরই প্রার্থনীয়। মা! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্ সর্ব্বনাশ যেন সকলের শীঘ্র হয়। মা! গুরুকৃপা ব্যতীত সর্ব্বনাশ হয় না এবং সর্ব্বনাশ না হইলেও ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।

বাবা, সাধে কি আমি তোমায় পাগল বলি, পাগল না হ'লে কি আর তুমি বল যে সর্ব্বনাশ প্রার্থনীয়! বাবা! সর্ব্বনাশ যদি হ'ল তা হ'লে আর কি নিয়ে সংসারে থাক্‌ব?

মা ! সংসারে কাহার কি আছে, মা !!

কেন, সকলকারই সব আছে, ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, কন্যা পুত্র, সবই আছে। এইত আমারই সব রয়েছে।

আচ্ছা মা ! আপনারই যদি এই সব হয় তাহা হইলে আপনি কোথাও যাইলে এই সব লইয়া যাইতেও পারেন ?

তা আর পারিনি ? আমি যখন যেখানে যা'ব সেই খানেই নিয়ে যেতে পারি।

আচ্ছা মা ! আপনি যখন মরিয়া যাইবেন তখন এই সব জিনিষপত্রের সহিত আমাদেরও লইয়া যাইবেন ? তবে আর এত ভাবনা বা চিন্তা কেন ?

আ আমার পোড়া কপাল ! তা কি কেউ ম'রে গেলে জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে ? তা কেউই পারে না। বাবা ! তা হ'লে আর ভাবনা কিসের !!

তবে মা, কেমন করিয়া বলিলেন যে এসব "আমার" ? তা হ'লে বলুন যে এসব "আমার" নহে।

বাবা, তাকি বল্‌তে পারি ? যতক্ষণ না মরব ততক্ষণ বল্‌ব "আমার" ; জীবদ্দশায় বল্‌তে পার্‌ব না যে "আমার" নয়।

মা ! এই "আমার" বোধ থাকিতে কাহারও সর্ব্বনাশ হয় না। এই "আমার" যে অবস্থায় যায় তাহাই সর্ব্বনাশের অবস্থা। সেই অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা জীবদ্দশাতেই গুরুকৃপায় সাধন দ্বারা লাভ হয়, তদ্ব্যতীত লাভ হয় না।

বাবা গোপাল ! তুই ত বালককাল থেকে লেখা পড়া কিছুই করিস্‌ নাই, বাবা, তুই এত কথা কোথা থেকে পেয়েছিস্‌ !

তোর কথা শুনে আমার বোধ হচ্চে তুই ত পাগল নয়। তোর মুখের কথা শুনে আমার বোধ হচ্চে তুই পাগল বেশে আমাদের ছলনা করিস্ মাত্র। বাবা! তুই সত্য ক'রে বল্ তুই কে?

মা, আমি তোর পাগল গোপাল, আমার ক্ষিধে পেয়েছে মা, কিছু খেতে দে মা।

কি খেতে দিব বাবা? খাবারত কিছু তয়েরি নাই। কর্ত্তা একটু চৈতন্য লাভ কর্‌লেই তোমাকে খাবার তয়েরি ক'রে দিব।

গোপাল দেখিলেন যে, মা একটু স্থির হইয়াছেন। মার কাতরতা একটু কম দেখিয়া পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা পিতার যেন সামান্য চৈতন্য লাভ হইয়াছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে এক আধ্‌বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। গোপাল এই সময়ে পিতাকে বলিলেন, বাবা আপনি উঠুন্ এবং মুখ হাত পা ধুইয়া একটু জল খান, আপনি জল না খাইলে কেহ কিছু খাইতে পাইতেছে না। চিন্তার বিষয় কিছুই নাই—আপনি রাজাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহার শান্তির উপায় বলিয়া দিব।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিলেন, কে আমায় বলিল রাজাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিব?

পুত্র সম্মুখেই ছিলেন, তিনি বলিলেন, বাবা আমি বলিতেছিলাম যে, আমি রাজাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিব। আপনি উঠিয়া হাতে পায়ে জল দিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করুন, আপনি কিছু না খাইলে কেহই কিছু খাইতে পাইতেছেন না।

ব্রাহ্মণ আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন, সুতরাং এই কথা গুলি শুনিয়া মনে করিলেন যেন স্বপ্নাবস্থায় দৈববাণী শুনিতেছেন।

কিন্তু যখন জানিলেন যে, তাহা স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণী নহে, উহা তাঁহার পাগল পুত্রের কথা, তখন হতাশ হইয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা গোপাল! তুমি এ অসম্ভব কথা কেন বলিতেছ? বাবা, তুমি শাস্ত্রাদি কিছুই পাঠ কর নাই, আমি অনেক যত্ন করিয়াও তোমাকে একটা শ্লোকও অভ্যাস করাইতে পারি নাই, তোমার শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। আমি এত শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যখন রাজার শান্তি উৎপাদন করিতে পারিলাম না, তখন তুমি শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া কি প্রকারে তাঁহার শান্তি লাভের উপায় করিয়া দিবে, ইহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!! বাবা, তুমি পাগল তাই এ কথা বলিতেছ। ইহা পাগলের উক্তি মাত্র আর কিছুই নহে।

পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা! এখনও ত এক সপ্তাহ কাল সময় আছে, আপনি না হয় অদ্যই রাজাকে বলিয়া আসুন যে, আমার পুত্র অদ্যই আপনাকে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিবে; কিন্তু আমার পুত্র যাহা বলিবে ও করিবে তাহাতে আপনি কোন কথা বলিতে পারিবেন না; আর তাহার যদি কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহাও আপনি তাহাকে দিবেন এবং যদি না দেন তাহা হইলে সে তাহা লইয়া যাইবে। আমি অদ্য বৈকালে পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। আপনি রাজাকে এই সকল কথা বলিয়া আসিলে, আমি অদ্যই আপনার সঙ্গে রাজার নিকট যাইয়া যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারি, তাহা হইলে না হয় আপনি কল্য হইতে আবার এইরূপে পড়িয়া থাকিবেন। আজ আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া দেখুন কি হয়।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

ব্রাহ্মণী সেই খানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের কথা সমর্থন করিয়া কর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন—গোপাল যখন বল্‌ছে তখন দেখ্‌তেই বা দোষ কি? এখনও ত সাত দিন সময় আছে। গোপালের কথায় না হয় এক দিন চেষ্টাই কর্‌লে, তা'তে আর দোষ কি? বিপদে পড়্‌লে লোকে যে কত রকম চেষ্টা করে, সকল চেষ্টাই কি সফল হয়? চেষ্টা ত কিছু কর্‌তে হ'বে; না হয় আজকার মতন গোপাল যা বল্‌ছে তাই কর্‌লে, তা'তে আর ক্ষতি কি? আমার আজ গোপালের কথা শুনে গোপালকে আর পাগল ব'লে বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় গোপাল পাগ্‌লামি ক'রে আমাদের ছলনা ক'রে থাকে।

কর্ত্তা এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, তুমি পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া এই অন্তিম কালে ঐরূপ বলিতেছ। যাহাই হউক, আমিও অদ্যকার মত তোমাদের অনুরোধে তোমাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলাম। ভাল, আমি এখনি রাজাকে বলিয়া আসিতেছি, তাহার পরে আহারাদি করিব। তোমরা এক্ষণে পাকাদি কার্য্য আরম্ভ কর, আমি রাজবাটী হইতে আসি। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে গেলেন, এবং তথায় পৌঁছিয়া দৌবারিকমুখে রাজাকে নিজ আগমন বার্ত্তা পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ গুরুদেবের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র দৌবারিককে বলিয়া দিলেন যে, তুমি গুরুদেবকে আমার

প্রণাম দিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে বাটীর মধ্যে আমার বিশ্রামগৃহে লইয়া আইস। দৌবারিক অবনতমস্তকে মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গুরুদেবকে মহারাজের প্রণাম জানাইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া মহারাজের বিশ্রাম গৃহে পৌঁছিয়া দিল। মহারাজও গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং গুরুদেবের শুষ্ক বদন দেখিয়া তাঁহার স্নান আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুদেব তদুত্তরে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আহারাদি আর কি করিব, পরিজনবর্গের আহার হওয়া দূরে থাকুক্ এখন পর্য্যন্ত পাকাদিও হয় নাই। আপনি যে নিদারুণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে কি আর আহারাদি করিবার ইচ্ছা থাকে?

গুরুদেবের আহারাদি হয় নাই শুনিয়া মহারাজ ইঙ্গিত করিবামাত্র রাজমহিষী দাসীগণ সমভিব্যাহারে গুরুদেবের নিকটস্থ হইলেন এবং স্বয়ং গুরুদেবের চরণ ধৌত করিয়া দিয়া নিজ অঞ্চলের দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া তাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। দাসীগণও অন্যান্য অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল। অপরাপর দাসীগণ স্বর্ণ কলস করিয়া জল আনয়ন পূর্ব্বক গুরুদেবের মস্তকে ঢালিতে লাগিল। গুরুদেবের স্নান হইলে পর তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। জলযোগ শেষ হইলে মহারাজ গুরুদেবের অসময়ে আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব পুত্রের সমস্ত বাক্য মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন।

মহারাজ গুরুমুখে গুরুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন দেব! আমার অন্তরের ইচ্ছা নহে যে, আমি আপনাদিগকে কোন কষ্ট দিই, তবে আমার রাজ্যসুখ আর ভাল লাগিতেছেনা, বরং উহা বিষের জ্বালার ন্যায় অসহ্য বোধ হইতেছে; উহা হইতে কিছু শান্তি না পাওয়াতেই এই কঠোর আজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছি। আমার এত ঐশ্বর্য্য থাকিতেও আমি কোন বিষয়েই সুখ পাইতেছিনা। এক শান্তির অভাবে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্ঞী আমার তৃপ্তির জন্য স্বয়ং চামর ব্যজন করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতেও তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ রাজবৈভবে আমার আর তৃপ্তি হইতেছে না। যদি কেহ আমায় শান্তি প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমার এ অতুল বিভব আমি অনায়াসে দান করিতে পারি, কেন না ইহাতে কিছুমাত্র সুখ বা শান্তি নাই। আমি বাল্যকাল হইতে এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া আসিতেছি কিন্তু এক দিনের জন্যও নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারি নাই। বরং রাজ্য রক্ষার জন্য যে বিষময়ী চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা চিতা অপেক্ষাও গরীয়সী। অতএব দেব! গুরুপুত্রকে আমার ভূমি-লুণ্ঠিত প্রণাম কহিবেন এবং অদ্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন। তিনি যাহা করিতে বলিবেন বা করিবেন তাহাতে আমি কোন কথা কহিব না। তাঁহার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে আমি তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে তাহা আনাইয়া দিব। আর যদি আমার শান্তিলাভ হয় তাহা হইলে এই

সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আমি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শান্তির সেবা করিব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।

এমন সময় রাজ্ঞী স্বয়ং আসিয়া মহারাজকে জানাইলেন গুরুদেবের আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আহারের স্থান হইবে কি না।

রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া মহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন, আহারীয় সমস্ত প্রস্তুত, আপনি অনুমতি করিলেই আহারের স্থান করা হয়।

গুরুদেব বলিলেন, আজ আর এখানে আহার করিব না, কারণ বাটীতে কেহই এখনও জলস্পর্শ করেন নাই। আমি না খাইলে তাঁহারাও কেহ কিছু খাইবেন না। অতএব অদ্য বাটী যাই। আহারাদি সমাপনান্তে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের সমীপে আবার উপস্থিত হইতেছি।

গুরুদেব এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে মহারাজ ও রাজ্ঞী উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গুরুদেব রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া নিজ বাটীর দিকেই চলিলেন। কিন্তু আশার কি মোহিনী শক্তি! এখন ব্রাহ্মণের আর পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই, এখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী যে বলিয়াছিলেন পুত্র ছদ্মবেশে পাগলের ন্যায় আচরণ করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিয়া থাকে এখন সেই কথা ব্রাহ্মণের স্মরণ পথে আসিল। ব্রাহ্মণ এখন ভাবিতেছেন যে, যদি ব্রাহ্মণীর এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে আর কি! পুত্রের কল্যাণে এ যাত্রা সকলকার জীবন রক্ষাত হইলই, তাহার উপর আবার

রাজ্যলাভ !! কেননা রাজা ত বলিয়াছেনই যে পুত্র শান্তি প্রদান করিতে পারিলে তিনি পুত্রকে সমস্ত রাজ্যের ভার দিবেন। পুত্রের রাজ্যলাভ হইলে তাহা প্রকারান্তরে আমারই হইল !! তাহা হইলে আর আমার ভাবনা কি? বিশ্বনাথ কি আমায় এমন দিন দিবেন !! যদি দেন তাহা হইলে কাশীতে গিয়া বিশ্বনাথের পূজা দিয়া তথায় একটী শিবস্থাপন করিয়া আসিব। ব্রাহ্মণ ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্ল-বদনে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

ব্রাহ্মণী পাকাদি কার্য্য শেষ করিয়া বহির্দ্বারে ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে আনন্দবদনে আসিতে দেখিয়া হাস্যবদনে বলিয়া উঠিলেন ওগো কর্ত্তা বাড়ী আস্‌ছেন। সকলেই কর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, সুতরাং কর্ত্তা বাড়ী আসিতেছেন শুনিয়া সকলেই বহির্বাটীতে আসিলেন। পুত্রও আজ এখনও বাটীতে আছেন। তিনিও সকলের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু আহারাদি এখনও কাহারও হয় নাই। কর্ত্তার আহার না হইলে কেহই আহার করিবেন না।

কর্ত্তা বাটীতে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণী ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে রাজবাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ত্তাও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া এবং রাজার ও রাজ্ঞীর শীলতা ও ভক্তির পরিচয় দিয়া অবশেষে আনন্দ সহকারে গোপনে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন যে, যদি বিশ্বনাথ দিন দেন আর তুমি যাহা বলিয়াছ যে পুত্র পাগল নহে তাহা যদি সত্য হয় এবং পুত্র যদি রাজাকে শান্তি প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের রাজ্যলাভ!

কেননা রাজা বলিয়াছেন যে, পুত্রের দ্বারা তাঁহার শান্তি লাভ হইলে তিনি পুত্রকে রাজ্যভার দিবেন। যদি ইহা ঘটে তাহা হইলে আমি কাশী গিয়া বিশ্বনাথের পূজা দিয়া কাশীতে শিবস্থাপন করিয়া আসিব। তাহা হইলে আর আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় ভাবিতে হইবে না। আমি বসিয়া স্বচ্ছন্দ মনে মা'র নাম জপ করিতে পারিব। অতএব তুমি শীঘ্র শীঘ্র আহারাদির আয়োজন কর, আহারান্তে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট যাইতে হইবে।

ব্রাহ্মণী বলিলেন, তুমি এর মধ্যেই কাল্‌নিমের লঙ্কাভাগ আরম্ভ কর্‌লে যে! র'সো, আগে কার্য্যসিদ্ধিই হ'ক্‌, তার পর ত তুমি কাশী যাবে!! এখন কাশী যেতে হবে কি ফাঁশী যেতে হবে তারই ঠিকানা নাই; এর মধ্যেই এত আনন্দ ভাল নয়। এখন মা জগদম্বাকে ডাক, যাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। এখন ওসব কথা মুখে এনোনা।

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণী ত বলিলেন জগদম্বাকে ডাক, কিন্তু জগদম্বা সাড়া দেন কৈ? ডাকিতে ত আর বাকী নাই, অনেক ডাকিয়াছি। ভাল, ব্রাহ্মণী যখন বলিতেছেন তখন না হয় আবার ডাকা যা'ক্‌। ব্রাহ্মণ স্বগত এইরূপ বলিয়া "মা জগদম্বা কার্য্য সিদ্ধি কর মা" বলিয়া জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিলেন। আহারের স্থান হইলে ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত আহার করিতে বসিলেন এবং আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, বাবা গোপাল! রাজাকে শান্তি দিতে পারিবে ত? না, কেবল যাওয়া আসা সার এবং শেষে যে দশা সেই দশাই হইবে?

পুত্র বলিলেন, আপনি আহার করুন; গুরুর কৃপায় যাহা হয় তাহাই হইবে।

পুত্রের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন ও আবার কি কথা! তুমি পারিবে না? গুরুকৃপা আবার কি? এই ত আমিও রাজার গুরু, আমি,ত কিছুতেই রাজাকে শান্তি দিতে পারি নাই। রাজার প্রতি আমার কৃপাও যথেষ্ট আছে, তথাপি রাজার শান্তি লাভ হয় নাই। তুমি পারিবে কি না তা বল। গুরুকৃপায় আবার কি হইবে?

পুত্র বলিলেন, বাবা, সদ্‌গুরুকৃপায় কর্ম্ম প্রাপ্তি হইলে সবই হইতে পারে। কর্ম্মই সদ্‌গুরু এবং যিনি সেই কর্ম্ম বলিয়া দেন তিনিও সদ্‌গুরু।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমরা কি কর্ম্ম বলিয়া দিই না? তবে আমরা কি অসৎ গুরু, না আমাদের কোন দোষ আছে?

পুত্র বেগতিক দেখিয়া বলিলেন বাবা! আপনি আহার করুন, এখন সে সব কথা কি বলিব? যাহা হয় তাহা দেখিবেন। এখন আর ওসকল কথায় কাজ নাই, শেষে কার্য্য দেখিয়া যাহা বলিতে হয় বলিবেন।

ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের আহার হইলে, আহারান্তে ব্রাহ্মণ ধূম পান করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে এক আধ্‌টা পান খাইতে লাগিলেন; কিন্তু মনে আর তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। কেবল ভাবিতেছিলেন কিসে এ দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহার মনের অনেকটা সাম্যাবস্থা। কেননা এখন তাঁহার মনে এক একবার আশার সঞ্চারও হইতেছে,

আবার পরক্ষণেই সেই আশা তিরোহিত হইয়া দুশ্চিন্তার উদয় হইতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে বিশ্রাম করিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে বেলা আর বেশী নাই, সূর্য্যদেব যেন পশ্চিম দিকে প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের কি আহারাদি সমাপন হইয়াছে?

ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, কেহই আর আহারাদি করতে বাকী নাই, সকলেরই আহারাদি শেষ হ'য়ে গেছে। তুমি এই বেলা পুত্রকে নিয়ে রাজবাড়ী যাও।

ব্রাহ্মণীর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন এবং পুত্র সম্মুখে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, বাবা! এইবার রাজবাটী চল, আর বেলা নাই, সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

পুত্র বলিলেন, আমি প্রস্তুতই আছি, আপনি অনুমতি করিলেই যাইতে পারি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, তবে কাপড় চোপড় পরিয়া আইস এবং তোমার কপালে তিলক নাই দেখিতেছি ঠাকুরঘরে গিয়া চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া তিলক সেবা করিয়া আইস।

পুত্র বলিলেন, কাপড় চোপড় আর কি পরিব, কাপড় ত পরিয়াই আছি। আর কপালে আবার তিলক সেবা কি করিব, লোক ভুলান সাজে আর আবশ্যক কি?

পিতা কহিলেন, ওরে বাপু! তুমি ওসব কিছু বুঝনা। তোমার ত শাস্ত্রাদির কোন জ্ঞান নাই; দুইটা শ্লোক বলিয়াও রাজাকে নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিবে না, অথচ ভাল কাপড় পরিতে ও তিলকসেবা করিতে চাহিতেছ না, তবে কি দেখাইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিবে?

পুত্র বলিলেন, বাবা! ওসব কিছুরই আবশ্যক নাই; বাহ্য আড়ম্বরে রাজার মনে শান্তি হইবে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে রাজা এত দিন শান্তি লাভ করিতেন।

ব্রাহ্মণী সেই খানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, গোপাল যা বল্‌ছে তা মন্দ কি? ও যা বলে আজকের মতন তুমি না হয় তাই কর্‌না। এখন ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার সময় নয়। ও যদি ঐতেই ফল দেখায়, তা হ'লে কাজ কি আমার ফোঁটা চটায়? তোমরাও ত অনেক ফোঁটা টোটা ক'রে যেতে, তা'র ফলে ত কাটা যেতে বসেছি। ভাল, ও ফোঁটা না কেটেই বা কি করে তাই কেন দেখনা। ও যা কর্‌তে চায়, তাতে বাধা দিও না এবং কোন কথাও কহিও না। তুমি বরং ফোঁটা টোটা বেশ ক'রে কেটে যাও। যদি কেউ কিছু বলে তা হ'লে তাকে বল্‌বে যে ও বালক আপনার কাজ কর্ম্মেই থাকে, এর পরে সব কর্‌বে।

ব্রাহ্মণীও যখন এইরূপ বলিলেন, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে, তবে এখন আমার সঙ্গে আসিতে বল, বেলা সব যায়।

গোপাল নিকটেই ছিলেন, মা ডাকিতেই কাছে আসিলেন। মা গোপালের দাড়ি ধরিয়া বলিলেন, বাবা গোপাল! তুমি তোমার জনকের সঙ্গে রাজবাড়ী (যাও বলিতে নাই) এস। বাবা, দেখো এই সমস্ত পরিবারের জীবন তোমার উপর নির্ভর কর্‌ছে; বাবা! যা'তে সকলের জীবন রক্ষা হয় তা করিও। বাবা! দেখো যেন পিণ্ডলোপ না হয়।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণী পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া স্বামীর সহিত বিদায় দিলেন। পুত্রও মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাতার দক্ষিণ পদ ও বাম হস্ত দ্বারা বাম পদ ধারণ পূর্ব্বক মাতার পদযুগলের ঘ্রাণ লইয়া পিতাকেও তদ্রূপ ভাবে প্রণাম করিয়া পিতার সহিত রাজবাটীতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে পিতার সহিত আর কোন কথা হইল না। ব্রাহ্মণের বাটী হইতে রাজবাটীও বেশী দূর নহে। সুতরাং পিতা পুত্রে শীঘ্রই রাজবাটীর দ্বারে পৌছিলেন। দ্বারপালেরা রাজগুরুকে দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয় রাজাকে কি জানাইবার আজ্ঞা হয়? ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত নিজের আগমনবার্ত্তা রাজাকে জানাইতে বলিলেন। দৌবারিক তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের আগমনবার্ত্তা লইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং অবনতমস্তকে রাজাকে সেই সংবাদ দিল। রাজাও চাতকের ন্যায় তাঁহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দৌবারিকমুখে এই সংবাদ পাইবামাত্র রাজা স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূমিতেই পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাজার মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ইঙ্গিতের দ্বারা পুত্রকেও তদ্রূপ করিতে বলিলেন। পুত্র দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! মস্তক কিরূপে পদ দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়!! জীবমাত্রই শিবস্বরূপ; বিশেষতঃ নিজের মাথায় নিজে কেহ পা দেয় না এবং দিবার আবশ্যকও হয় না। পিতা ইহা কিরূপে করিলেন, এই ভাবিয়া স্তম্ভিত

হইলেন। কিন্তু পিতাকে কিছু না বলিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন এবং আমার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া শান্তি লাভ করুন। আমি আপনার শীলতায় বড় প্রীত হইয়াছি। রাজাও আজ্ঞামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে গুরুদেবকে ও গুরুপুত্রকে গৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে পর, রাজা গুরু ও গুরুপুত্র তিন জনে একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহে তিন খানি আসন পাতা ছিল। রাজা গুরুদেবকে ও গুরুপুত্রকে আসনে বসাইয়া আপনি ভূমিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণ আজ আর বেশী কথা কহিতেছেন না, কেননা, দ্বারদেশে পুত্রের কার্য্য ও তাঁহার প্রতি রাজার ভক্তি দেখিয়া অবধি কেবল পুত্রের কার্য্য দেখিয়া চলিতেছেন ও পুত্র রাজাকে কি বলেন তাহাই শুনিয়া যাইতেছেন। রাজাকে ভূমিতে বসিতে দেখিয়া গুরুপুত্র তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! নিরাসনে বসা উচিত নহে, আসনে উপবেশন করুন, তাহাতে আপনার অমঙ্গল হইবে না, বরং মঙ্গলই হইবে। রাজা গুরুপুত্রের অনুমতিক্রমে উভয়কে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদিও আমি পিতার মুখে আপনার বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছি, তথাপি আপনার মুখে একবার ঐ সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। গুরুপুত্র এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজা নিজের সমস্ত বিষয় তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কহিলেন যে, আমি উহাঁদের দ্বারা কিছুতেই শান্তি না পাইয়া অসহ্য অশান্তির জ্বালায় এইরূপ কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছি; কেন না, এই কঠোর দণ্ডের

ভয়েও যদি উঁহারা আমার শাস্তির উপায় করিতে পারেন। নতুবা আমার অন্তরের ইচ্ছা নহে যে, উঁহাদের কোন দণ্ড দিই। গুরুর কার্য্য শিষ্যের তাপ নিবারণ করা। কিন্তু আমার সে তাপ নিবারণ হইল কৈ? উঁহারা আমায় যাহা যাহা বলিয়াছেন, কষ্টকর হইলেও শান্তির আশায় আমি তৎসমুদায়ই করিয়াছি। তবে যদি এমন হইত যে, উঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা না করিয়া আমি মিথ্যা ভাণ করিতাম, তাহা হইলে আমার অন্যায় হইত বটে। এই সময় রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, আমি আপনাকে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এক শান্তি ব্যতীত আর কিছুরই আবশ্যক নাই। আপনি কৃপা করিয়া তাহারই উপায় বলিয়া দিউন।

গুরুপুত্র রাজার এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমি আপনাকে ইহার সদ্‌যুক্তি বলিয়া দিব। কিন্তু আপনি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা রহিত করিবেন। রাজা অবনতমস্তকে তাহাতে স্বীকৃত হইলে গুরুপুত্র বলিলেন, অদ্য রাত্রি এক প্রহরের পর আপনাকে আমার সহিত যাইতে হইবে, সঙ্গে কেহই থাকিবে না, কেবল মাত্র আমার পিতা থাকিবেন। ইহাতে আপনি সম্মত আছেন কি? রাজা অবনতমস্তকে তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন, কিন্তু কোন কথা কহিতেছেন না, কেননা ব্রাহ্মণী কোন কথার উত্তর করিতে নিষেধ

করিয়া দিয়াছেন। তবে রাজার সহিত পুত্রের এ পর্য্যন্ত যে কথোপকথন হইতেছে, ব্রাহ্মণ তাহাতে বরং তৃপ্তিই লাভ করিতেছেন। বিশেষতঃ যখন রাত্রি এক প্রহরের পর যাইতে হইবে এই কথা শুনিলেন, তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, পুত্র যে সময় অবধারিত করিলেন তাহা অপ্রশস্ত নহে। বোধহয়, এইবার মা জগদম্বার পূজার ব্যবস্থা করিয়া পূজার দ্রব্যাদির বিষয় রাজাকে বলিবে, নতুবা আমায় সঙ্গে লইতে বলিবে কেন? ভাল, দেখাই যাউক কি করে, কোন কথায় কাজ নাই।

তদনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার দুইটী দ্রব্যের প্রয়োজন আছে। দুই গাছি বড়, নূতন ও শক্ত দড়ি চাই। রাজাও তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে শীঘ্র ঐ রূপ দুই গাছি দড়ি আনিতে অনুমতি করিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ ভাবিতেছিলেন, পুত্র রাজাকে এইবার পূজার দ্রব্যাদির কথা বলিবেন, কিন্তু যখন পুত্রের মুখে দড়ির কথা শুনিলেন, তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি? দড়ী কেন? পূজায় ত কখনও দড়ির আবশ্যক হয় না! আঁটকুড়ির বেটা দড়ির কথা বলে কেন? আমি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিলাম যে, পুত্র লেখা পড়া জানে না, তাহার শাস্ত্রাদি দেখা শুনাও নাই, উহার দ্বারা আর কি উপায় বা উপকার হইতে পারে? এখন ফলেও তাহাই দেখিতেছি!! এত জিনিষ থাকিতে দড়ি কি করিবে? দড়ি দ্বারা রাজাকে কি শাস্তি দিবে? কথায় যে বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" এখন তাই দেখিতেছি। স্ত্রীবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া

আজই বুঝি রাজার হস্তে প্রাণ যায়!! এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ এক এক সময় ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নিজ মনের ভাব ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে যান, আবার পরক্ষণেই ব্রাহ্মণীর নিষেধ বাক্য যেমন মনে পড়ে, অমনি সে ভাব গোপন করিয়া চুপ করিয়াই থাকেন।

এমন সময় ভৃত্য দুই গাছি দড়ি লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজার হস্তে উহা অর্পণ করিল। রাজা গুরুপুত্রকে দড়ি দুই গাছি দেখাইলেন এবং উহাতে কার্য্য হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুপুত্র দড়ি দেখিয়া বলিলেন যে, উহাতে চলিবে।

ব্রাহ্মণ এই সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "চলিবে বৈকি, তোমার গোষ্ঠির মাথা চলিবে"। কিন্তু ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, কেন না, কথা কহিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ আছে। সুতরাং যাহা কিছু সবই তাঁহার মনে মনেই হইতেছে।

এমন সময় গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, সময় আগত প্রায় সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

রাজা বলিলেন, আমি প্রস্তুতই আছি, তবে চলুন।

রাজার এই কথার পর পুত্র পিতাকে বলিলেন, বাবা! আপনিও চলুন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের বাক্যে পূর্ব্ব হইতেই চটিয়াছিলেন। এখন বেশী কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন, আমি না গেলে চলে না? রাত্রিকাল, বুড়ো মানুষ, আমি কি যাইতে পারিব?

পুত্র বলিলেন, আপনি আসুন, আমি আপনার হাত ধরিয়া লইয়া যাইব।

এই কথায় ব্রাহ্মণ অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিন জনেই নিঃশব্দে চলিলেন। এখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পথে লোকও কম চলিতেছে। পুত্র পিতাকে ও রাজাকে লইয়া সহরের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া সম্মুখস্থ এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ পিতা তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা গোপাল! এ বনের মধ্যে কোথায় লইয়া যাও? শুনিয়াছি এই বনে বড় হিংস্র জন্তুর ভয়। বাবা! শেষ দশাটায় পাছে বাঘের পেটে যাইতে হয় সেই ভয় বড় হইতেছে।

পুত্র কহিলেন, বাবা! কিছু ভয় করিবেন না, আমি থাকিতে আপনার এবং মহারাজের কোন ভয়ই নাই। আপনারা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত ভাবে আমার সঙ্গে আসুন। পিতাকে এই কথা বলিয়া রাজাকেও বলিলেন, মহারাজ! আপনিও কোন ভয় বা চিন্তা করিবেন না।

রাজা গুরুপুত্রকে যে আজ্ঞা বলিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত চলিতেছেন ও ভাবিতেছেন, "রামে মেলেও মেরেছে, রাবণে মেলেও মেরেছে," আজ অব্যাহতি নাই। হয় রাজার হাতে, না হয় বাঘের হাতে, একটা না একটা হইবেই হইবে। যে রকম গতিক, তাহাতে শুভ লক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না। দেখাই যাউক কি হয়,

এখন ত আর কোন উপায় নাই। কপালে যাহা আছে তাহা হইবেই।

এমন সময় পুত্র বলিলেন, আর যাইতে হইবে না। এক্ষণে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনারা উভয়ে এই উভয় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করুন্। ব্রাহ্মণ পুত্রের কথা শুনিয়া একটী বৃক্ষমূলে বসিলেন এবং রাজাও অন্য একটী বৃক্ষমূলে বসিলেন। পুত্র উভয়ের সম্মুখেই বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে পুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে আপনার শ্রম দূর হইয়াছে কি? রাজা বলিলেন, দেব! আমার পথশ্রান্তি দূর হইয়াছে। ইহাতে গুরুপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! তবে কি আমি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি? রাজা আনন্দের সহিত কহিলেন, আপনি অনায়াসে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বসিয়া মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এবং পাছে পিছন হইতে কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার নিজ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ শঙ্কিত ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন যে, যদি ব্রাহ্মণীর কথা না শুনিতাম তাহা হইলে আর অদ্যই প্রাণ যাইত না, এক সপ্তাহ ত বাঁচিতাম। সপ্তাহ কাল সময় পাইলে কিছু না কিছু চেষ্টাও করিতে পারিতাম। অন্য কিছু করিতে না পারিলেও অন্ততঃ গ্রহ শান্তিও ত করিতে পারিতাম। পাগলের হাতে পড়িয়া তাহাও গেল। রাজা

কেমন সুবিধার কথা বলিতেছেন! পাগলা কি কার্য্য জানে, যে তাহার অনুষ্ঠান করিবে? যদি কার্য্যের অনুষ্ঠানই জানিত, তাহা হইলে রাজার নিকট হইতে আর দড়ি চাহিত না! দড়ির দ্বারা যে উহার কি পিণ্ড চট্‌কাইবে তাহা ওই জানে। যাহা হউক এ যাত্রা মনের কথা মনেই রহিল, ব্রাহ্মণীর জন্ম আর ব্যক্ত করিতে পারিলুম না। পাছে ব্রাহ্মণী রাগ করেন, এই ভয়ে ব্রাহ্মণ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন।

গুরুপুত্র রাজার কথায় প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক গাছি দড়ি লইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি গাত্রোত্থান করুন্। রাজা গুরুপুত্রের আজ্ঞামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্ষণকালের জন্ম আপনাকে এই বৃক্ষে বাঁধিতে পারি কি?

রাজা অকুতোভয়ে বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এই কথা বলিয়া তিনি বৃক্ষের পার্শ্বে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। গুরুপুত্র রাজাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। রাজার উভয় হস্ত একত্র করিয়া একটী ফাঁস দিলেন; পরে ঐ দড়ি হস্তে জড়াইয়া জড়াইয়া কণ্ঠদেশে আনিয়া কণ্ঠের ঊর্দ্ধে গলার কাছে, যেখানে টিপিলে জিহ্বা বাহির হয় সেই স্থানে, একটী গ্রন্থি দিলেন। পুনরায় ঐ দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া হৃদয় দেশে আনিয়া তথায় একটী গ্রন্থি দিলেন। অবশেষে ঐ দড়ি হৃদয় হইতে জড়াইয়া জড়াইয়া কোমরের নীচে গুহ্যদেশে আনিয়া সেই স্থানে একটী গ্রন্থি দিয়া বৃক্ষের সহিত জড়াইয়া ফাঁস দিয়া রাখিলেন।

কেবল মাত্র চরণ খোলা রহিল। কিন্তু এমন কৌশলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন যে, সেই কৌশলটী দেখাইয়া দিলেই চরণের সাহায্যে সমস্ত গ্রন্থি খোলা যাইতে পারে। গ্রন্থি খুলিতে পারিলে ফাঁস আর কতক্ষণ থাকে? তাহা সহজ উপায়েই খোলা যায়।

এ দিকে, পুত্র রাজাকে বন্ধন করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, তবে কি পুত্র রাজাকে বাঁধিয়া বধ করিবে? ওঃ! তাহা হইলে ত পুত্রের এ সঙ্কল্প বড় ঘৃণিত! ইহাই যদি পুত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত কখনই ঐ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে দিব না। ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পুত্র পাগল, উহার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, সুতরাং ও সব করিতে পারে। এমন রাজাকে কি কখন বধ করিতে আছে? রাজা ভক্তিমান্, দয়ালু প্রজা-বৎসল ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এই শান্তিপ্রিয়তাই মজাইয়াছে। এইবার বুঝি ইহার হাতেই বা তাঁহাকে মজিতে হয়, কিন্তু তাহা কিছুতেই করিতে দেওয়া হইবে না। আমি বৃদ্ধ, সুতরাং আমিত তাহার জোরে পারিব না। তবে এক কথা আছে, প্রথমে সাহসে ভর করিয়া ভয় দেখাইয়া উচ্চরবে ধমকাইয়া উঠিব। তাহাতে যদি না হয় শেষে হাতে পায়ে ধরা ত আছেই। এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, পুত্র রাজার বন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া আবার যেন কি আনিতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণ জানেন্ না যে, এইবার তাহার পালা সুতরাং তাঁহার মনে পূর্ব্ববৎ চিন্তাই হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, পুত্র বুঝি, এইবার রাজাকে বধ করিবার জন্ত অস্ত্র

আনিতে যাইতেছে। কিন্তু পুত্র যে তাঁহাকেই বাঁধিবার জন্য দড়ি আনিতে যাইতেছেন ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, পাগ্‌লা তুই যে বড় রাজাকে গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিলি? তোর মতলব কি? তুই এমন ভক্ত, প্রজাবৎসল ও আমাদের অন্নদাতা রাজাকে বধ করিবি না কি? এই কথা বলিতেছেন এবং ভয়ে ও রাগে কাঁপিতেছেন।

এমন সময় পুত্র দড়ি লইয়া পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, মা আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন, আপনি কথা কহিতেছেন কেন? বিরক্তই বা হইতেছেন কেন? আমি রাজাকে মারিবওনা, কাটিবও না। আমি তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিতে আসিয়াছি তাহাই করিব। কিন্তু আপনি এইরূপে বাধা দিলে শাস্তি প্রদানের বিঘ্ন হইতে পারে।

এখন ব্রাহ্মণীর কথা ব্রাহ্মণের স্মরণ পথে আসিল সুতরাং ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া বলিলেন,—আচ্ছা, বাপু তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, তবে রাজাকে প্রাণে মারিও না। এই কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনিও একবার অনুগ্রহ করিয়া রাজার ন্যায় বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়ান। আমি ক্ষণকালের জন্য আপনাকেও বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিব।

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক স্তব্ধের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, বাবা! আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি বৃদ্ধ, আমার

বাঁধিও না। ইতিপূর্ব্বে আমি যে তোমায় বকিতেছিলাম, তাহা কেবল রাজার প্রতি স্নেহবশতই। বাবা আর আমি তোমায় কখনও কিছু বলিব না।- আজিকার মতন আমায় ছাড়িয়া দাও। বাবা! পুত্র হইয়া কি পিতাকে বাঁধিতে আছে? লক্ষ্মী বাপধন, আমায় ছাড়িয়া দাও।

পুত্র পিতার এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? আমি জানি যে পিতাকে বাঁধিতে নাই। তবে কি করি রাজাকে শাস্তি প্রদানের অনুরোধে ও কতকগুলি জীবনের উদ্ধারের জন্যই আমাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পিতঃ! তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন্। বিশেষতঃ মা বলিয়াছিলেন যে, আমি যাহা করিব তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না।

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই সকল কথায় বলিলেন, বাবা! ব্রাহ্মণী বাধাই দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমাকে বাঁধিতে ত আর বলেন নাই। আচ্ছা বাবা, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর এবং আমাকে বাঁধিলেই যদি ভাল হয়, তবে বাঁধ।

পুত্র যখন পিতাকে রাজার ন্যায় বাঁধিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ পিতা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ পুত্রের একটু আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিলেন। পুত্র এত বাঁধিলেন তথাপি সে বন্ধনে কোন জ্বালা বোধ হইল না। বরং শরীর যেন শীতল হইয়া আসিতেছে বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্র যখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁধিতেছিলেন, তখন তিনি পুত্রের শরীর হইতে যেন একটী কোমল জ্যোতিঃ

বাহির হইতে দেখিলেন। সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা কাহারও মায়ার দ্বারা যেন ভুলাইয়া দিল।

পুত্রও বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া দশ বার হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি এইবার আমার সহিত আসুন, আমি আপনাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। বিলম্ব করিবেন না, যত শীঘ্র পারেন আমার সঙ্গে আসিবার চেষ্টা করুন্।

রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন, ঠাকুর! আপনি যে আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, বন্ধন খুলিয়া না দিলে আমি কিরূপে আপনার চরণসমীপে যাইতে পারি? বিশেষতঃ বন্ধনের প্রথমাবস্থায় বন্ধনজ্বালা অনুভব করিতে পারি নাই কিন্তু এখন বন্ধনের অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকায় জ্বালা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দেব! এ বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিয়া আমার বন্ধনজ্বালা নিবারণ করুন্। আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আপনার নিকটস্থ হইতে পারি। ঠাকুর, নতুবা আপনার নিকটে যাওয়া অসম্ভব। পরন্ত গ্রন্থির দ্বারা এ রজ্জু যেরূপ ভাবে বৃক্ষের সহিত জড়ান ও বাঁধা আছে তাহাতে কাহারও সাহায্য ব্যতীত উহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই।

রাজার ঐ সকল কথায় গুরুপুত্র বলিলেন, আমার পিতাকেই বলুন, উনিই আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন কিন্তু ভয়ে আর কোন কথা কহিতেছেন না। কিন্তু মন ত আর চুপ করিয়া থাকিবে না।

বিশেষতঃ মনের উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য নাই। সুতরাং মনে মনে বলিতেছেন, আজ পাগলের হাতে পড়িয়া এই জঙ্গলের মধ্যেই প্রাণটা বা যায়। পাগলার কোন কাণ্ড জ্ঞান নাই তাই রাজাকে বলিতেছে, বাবা আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন। অরে মূর্খ! বাবাও যে বদ্ধাবস্থায় আছে, বাবা কেমন করিয়া রাজার বন্ধন খুলিয়া দিবে? তাই না হয় অগ্রে আমার বন্ধন খুলে দে, তাহার পরে আমি গিয়া রাজার বন্ধন খুলে দিব। একবার খুলে দিলে হয়, তাহা হইলেই রাজার বন্ধনটা খুলে দিয়া একবারে টানা দৌড় মারিব, আর কোন দিকেই তাকাইব না। বোকা পাগলা! তুই যে নিজেই আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিস্, আবার বলিতেছিস্ বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আমার সহিত আসুন!!! আঃ! এমন পাগলের হাতেও মানুষ পড়ে!! ব্রাহ্মণীর কথাতেই কেবল এই সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ!! নচেৎ বাটীতে থাকিলে ত আর এ অবস্থা হইত না। এ ত পাগল। পাগল যদি এই অবস্থায় রাখিয়া পলাইয়া যায় তাহা হইলেই প্রতুল। রাজাও বন্ধনাবস্থায় আছেন আমিও বন্ধনাবস্থায় আছি। এই অবস্থায় যদি কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, হয় রাজার হাতে না হয় বাঘের হাতে মরিতে হইবে। এখন দেখিতেছি যে, রাজার হাতে মরিতে হইল না, পুত্রের দোষে বাঘের হাতে প্রাণটা বা যায়!! যাহা হউক কোন কথায় কাজ নাই, কি জানি যদি পাগল এবার মেরেই বসে।

এমন সময় রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন ঠাকুর! [illegible]

যে আমার মতন বদ্ধাবস্থায় আছেন। তিনি কি প্রকারে আমাকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিবেন? ঠাকুর, আপনার বন্ধন নাই, আপনি মুক্ত অবস্থায় আছেন সুতরাং আপনি বা আপনার ন্যায় কোন মুক্ত ব্যক্তিই আমার এই বন্ধন খুলিয়া দিতে পারেন। নচেৎ আপনার পিতা নিজে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া কি প্রকারে আর একজনের বন্ধন মোচন করিবেন? অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বন্ধনজ্বালা হইতে মুক্ত করিয়া শান্তি প্রদান করুন্। আপনার পিতার দ্বারা এ বন্ধন মোচন হইবে না, কেন না তিনিও বদ্ধ আছেন। একজন অন্ধ যেমন অপর এক জন অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদেব নিজে বদ্ধ হইয়া কি প্রকারে আমার বন্ধন খুলিবেন? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি অগ্রে কাহারও দ্বারা নিজের বন্ধন মোচন করাইয়া মুক্ত হউন, তাহার পর তিনি আমাকে মুক্ত করিতে পারিবেন। নচেৎ নহে।

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন, কিন্তু পুত্রের ভয়ে ও ব্রাহ্মণীর ভয়ে কোন কথা কহিতেছেন না। কিন্তু মনে মনে রাজাকে এই সকল কথার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন ও বলিতেছেন রাজ-বুদ্ধি না হইলে কি আর এমন কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয়? মহারাজ একবার কোন গতিকে পাগলাকে ভুলাইয়া নিজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আমিও তাঁহাকে আমার বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিব। তাহার পর বাটী গিয়া ত আমাকে বধ করিবেন। আমার পক্ষে তাহাও মঙ্গল, কেন না তবুও ত আরো একবার বাটীর সকলকে দেখিয়া মরিব।

রাজা কখনই এমন পাষণ্ড নহেন যে, আমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে একাকী ফেলিয়া যাইবেন। পাগলাকে কিছু বলা হইবে না, কারণ, পাগলা বোধ হয় আমার উপর চটিয়াছে। কি জানি যদি সেই রাগে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত না করে। না, এতদূর বোধ হয় করিবে না। বৃদ্ধ পিতাকে কি আর বাঘের দ্বারা খাওয়াইবে? তাহা হইলে উহার জননীই বা উহাকে কি বলিবে? উহার গর্ভধারিণীর ভয়েও আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। আর একান্তই যদি না খুলিয়া দেয় তাহা হইলে রাজা যেমন মিষ্ট কথায় পাগলাকে বশ করিবার চেষ্টায় আছেন আমিও তাহাই করিব। পাগলা নিশ্চয়ই রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে আমারও একটা না একটা কিনারা হইবে। দেখা যা'ক মা জগদম্বার কৃপায় কতদূর কি হয়।

গুরুপুত্র রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য?

পুত্রের এই কথা শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতেছেন, আরে গেল পাগলা বলে কি? সত্য কি মিথ্যা, আয় আমি তোকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিই। একবার আমায় খুলিয়া দে, তাহার পর তোকে এই রজ্জু দিয়া বেশ করিয়া বাঁধি, তখন জানিতে পারিবি রাজা সত্য বলিলেন কি মিথ্যা বলিলেন। পাগলা নিজে কিনা মুক্ত অবস্থায় আছে, তাই আমাদের এই বদ্ধাবস্থার কষ্ট দেখিয়াও দেখিতেছে না। যাহার জ্বালা সেই জানে। আমরা বন্ধনজ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, পাগলা মজা করিয়া বলিতেছে ইহা কি সত্য!

গুরুপুত্রের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহারাজ বলিলেন, দেব! ইহা যে নিশ্চয়ই সত্য তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

তদনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহা যদি সত্যই হয়, তবে আপনি আমার বৃদ্ধ পিতাকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন কেন?

রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন, দেব! দণ্ডাজ্ঞা করিবার কারণ আমিত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি; আমার অন্তরের ইচ্ছা শান্তিলাভ; ইহারা যখন কোন কর্ম্মের দ্বারা আমায় শান্তি দিতে পারিলেন না, তখন আমি অসহ্য অশান্তির জ্বালায় অস্থির হইয়া মনে করিলাম যে, গুরুদেবের প্রতি এইরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে দণ্ড ভয়েও যদি তিনি আমার শান্তির কোন উপায় করিতে পারেন; নতুবা গুরু বা ব্রাহ্মণ বংশ নাশ করা আমার অন্তরের অভিপ্রায় নহে।

তদুত্তরে গুরুপুত্র রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি শান্তি লাভের জন্য যে উপায়টী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত মন্দ নহে। তবে আপনার বিবেচনার কিছু ত্রুটি হইয়াছে। আপনি এই মাত্র বলিলেন যে, নিজে বদ্ধ থাকিতে অপরের বন্ধন মোচন করা যায় না। আপনি যে সকল ব্রাহ্মণের দ্বারা যাগ যজ্ঞাদি করাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বদ্ধজীব, সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড জানেন না। আপনি যেমন রজ্জু দ্বারা এই বৃক্ষে বাঁধা আছেন, তাঁহারাও তেমনি মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা এই সংসার বৃক্ষে আবদ্ধ আছেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই এই বন্ধন দশা হইতে মুক্ত হইবার কৌশল অবগত নহেন, অথচ তাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া আপনাদিগকে

জ্ঞানী মনে করিয়া সমস্ত কর্ম্ম কাণ্ডই করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-কাণ্ড করিতে বা করাইতে হইলে নিজে যোগী হওয়া চাই। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড যোগিব্যতীত অপরে অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, সে সকলের ফলও বিপরীত ফলিয়া থাকে। এজন্য সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা শান্তি না হইয়া বরং অশান্তিই হইতে দেখা যায়। মহারাজ ইহা অবশ্যই ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, যেহেতু তাঁহারা আপনাকে কর্ম্মকাণ্ডের আর কিছুই করাইতে বাকী রাখেন নাই অথচ আপনার কিছুমাত্র শান্তি লাভ হয় নাই। বরং তাঁহারাই মহারাজের অশান্তির হেতু। তাঁহারা মুক্তিমার্গ বা শান্তি লাভের উপায় অবগত নহেন, সুতরাং মুক্তও নহেন। যাঁহারা নিজে বন্ধনদশাগ্রস্ত তাঁহারা কাজে কাজেই অপরের বন্ধন মোচনে অশক্ত। নিজের বা অপরের বন্ধন মোচন করিতে হইলে প্রাণায়ামরূপ যোগকৌশল জানা উচিত। এই অপূর্ব্ব যোগরূপ কৌশলই সহজে মুক্ত হইবার এক মাত্র উপায়। এই যোগরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের অভাবে যাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম পণ্ড হইতেছে। কালক্রমে ব্রাহ্মণ-পুত্রগণ বিলাসিতায় মত্ত হইয়া সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মশূন্য হওয়ায় তাঁহাদের বচন মাত্র সার হইয়াছে। নিজের জানা থাকুক্ বা নাই থাকুক্ লোককে দশবিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজে কোন কর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে জানেন না। তবে ব্যবসায় রক্ষার অনুরোধেই কেবল লোক দেখান দুই একটা বাহ্য কর্ম্ম করেন মাত্র। কেননা তাহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই।

ইঁহারা পুঁথিতে জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন! বচনে ব্রহ্মজ্ঞানের ছড়াছড়ি, কার্য্যে জীবভাবের পরিচয়!! মহারাজ! আপনি বদ্ধজীবের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি করাইয়াছিলেন, সুতরাং তদ্দ্বারা আপনার শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইঁহাদের দ্বারা কর্ম্ম করাইলে বরং পতিত হইয়া অশান্তিরূপ নরকে বাস করিতে হয়। মহারাজেরও তাহাই ঘটিয়াছে। রাজা পরীক্ষিতেরও আপনার ন্যায় অশান্তি হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ যখন শুনিলেন যে, ব্রহ্মশাপে সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার প্রাণ যাইবে, তখন তাঁহার মনে অসহ্য অশান্তির উদয় হয়। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভাস্থ সকলের নিকট নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর, সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ বা যজ্ঞের দ্বারা, কেহ বা দানের দ্বারা, কেহ জপাদির দ্বারা, আবার কেহ বা ব্রতনিয়মাদির দ্বারা সেই শাপ হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে যখন তিনি শুনিলেন যে, ইঁহারা সকলেই শান্তি প্রদানে অশক্ত, একমাত্র ব্যাসপুত্র শুকদেবই তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারেন এবং তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা তাঁহার শান্তি লাভ হইবে না, তখন তিনি শুকদেবকে আনয়ন করাইলেন। শুকদেব রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর অনেকেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করেন। তিনি পাগল ছিলেন বটে, কিন্তু কাজের পাগল ছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিয়া পরম যোগী হইয়াছিলেন। তিনি না পড়িয়া সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়াছিলেন

এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভও করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে নিজের বিষয় আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে অশান্তি দূর হয়, ব্যাকুলহৃদয়ে এমত উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শুকদেবও রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পুরাণাদি শাস্ত্রের সার মর্ম্ম আত্মযোগের উপদেশ দিলেন। মহারাজ! সমস্ত পুরাণেই এই আত্মযোগের রহস্য ব্যক্ত আছে; কিন্তু তাহার কার্য্য প্রণালী একমাত্র যোগীরাই জানেন, তদ্ব্যতীত অন্যে অবগত নহে। আত্মযোগের উপদেশ দিয়া শুকদেব রাজার আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া দিলেন। এইরূপে আত্মদর্শন করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ পরম প্রীতি লাভ করিয়া শুকদেবকে কহিলেন, প্রভো! আজ আমি আপনার কৃপায় যে অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিলাম ইহাতে আপনাকে চরিতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি। কিন্তু নিত্য কিসে আমার এই রূপের দর্শন লাভ হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপদেশ প্রদান করুন। তখন শুকদেব রাজাকে বলিলেন, আমি অদ্য আপনাকে যে আত্মকর্ম্মের উপদেশ দিলাম ঐ কর্ম্ম দ্বারাই আপনার নিত্য ঐ রূপ দর্শন হইবে। আপনি এই কর্ম্মের অভ্যাস করুন; উহাই আপনাকে শান্তি প্রদান করিবে যেহেতু কর্ম্মই ব্রহ্ম। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট হইতে এইরূপে উপদেশ পাইয়া পরম সুন্দর যোগরূপ কৌশলের দ্বারা ভববন্ধন গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ! যোগিব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট আত্মকর্ম্মের উপদেশের আশা করা দুরাশামাত্র। ইঁহাদের নিকট শাস্ত্রীয় রচনব্যতীত ভবনদী পার হইবার

সাঁতারক্রপ কৌশল জানা যায় না। গুরুপুত্র এই কথা বলিয়া দৃষ্টান্তচ্ছলে এই গল্পটী বলিলেন—

মহারাজ! কোন সময়ে এক পণ্ডিত নৌকারোহণে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে, নাবিক! তুমি দর্শন শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ কি?" নাবিক উত্তর করিল "আজ্ঞা, আমি নাবিকের কার্য্য করিয়া থাকি, দর্শনশাস্ত্র জানিব কি রূপে?" পণ্ডিত বলিলেন, "এঃ! তবে তোমার জীবনের সিকি অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে"। কতকদূর যাইয়া পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বাপু তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছ কি?" নাবিক বলিল, "আজ্ঞা না মহাশয়, আমি নাবিক ও সব শাস্ত্রের ধার ধারি না"। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "এঃ! দেখিতেছি তোমার জীবনের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা বাপু! তুমি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র কিছু পড়িয়াছ?" নাবিক বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল— "আজ্ঞা না মহাশয় ও সব কিছু জানি না। আপনি বারে বারে ওই সবই জিজ্ঞাসা কর্বেন, আমি নাবিক আমার ও সবে দরকার কি? ওর দ্বারা আমার কি লাভ হ'বে?" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "এঃ! দেখিতেছি, তোমার জীবনের তিন অংশ নষ্ট হইয়াছে।" এমন সময় দৈবাৎ নৌকার তলা ফাটিয়া নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। নৌকা জলে মগ্নপ্রায় হইলে নাবিক চীৎকার করিয়া পণ্ডিতকে বলিল, "মহাশয়! আপনি সাঁতার জানেন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "না বাপু, আমি সাঁতার জানি না"।

ইহাতে নাবিক কহিল, "মহাশয়! এক সাঁতারের অভাবে এখন আপনার সমুদায় জীবনটাই নষ্ট হ'ল এবং বেদপুরাণ জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি সমস্তই বৃথা নষ্ট হইয়া গেল! নৌকার তলা ফেটে গেছে নৌকা ডুবু ডুবু হয়েছে"। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে হতাশ হইয়া নাবিককে বলিলেন, "নাবিক! আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি সাঁতার না শিখিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি।" নাবিক পণ্ডিতের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহা সফল হইল না। পণ্ডিত মহাশয় নৌকার সহিত জলমগ্ন হইয়া অতল জলে তলাইয়া গেলেন। নাবিক সাঁতার জানিত, সুতরাং সে অনায়াসে গা ভাসান দিয়া পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ লাভ করিল।

এই কথা শুনিয়া রাজা গুরুপুত্রকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দেব! সাঁতার জানিলেও ত দুই এক জনকে ডুবিয়া মরিতে দেখা যায়?

গুরুপুত্র উত্তর করিলেন, হাঁ, তাহা দেখা যায় বটে, তাহাই যোগভ্রষ্টের অবস্থা। সকলেই যে এক জন্মে পরমগতি লাভ করিবেন এমন নহে। যদিও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা এক জন্মেই পরমগতি লাভ করেন না, তথাপি তাঁহারা সাধারণ জীবের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শান্তি লাভ করিয়া যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শেষে পরমগতি লাভ করেন। এরূপ জন্মও দুর্লভ।

এই সকল কথার পর রাজা গুরুপুত্রকে কহিলেন, দেব! আপনি বলিয়াছেন যে, যোগরূপ কৌশল ব্যতীত শান্তি লাভের

অন্ত উপায় নাই। দেব! যদি তাহাই হয় তাহা হইলে পূজা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল কি মিথ্যা?

শুরুপুত্র বলিলেন, মহারাজ! এই সকল কর্ম্মও মিথ্যা নহে। তবে এই পূজাদির মধ্যে যে সকল মন্ত্র ও ভূতশুদ্ধি ন্যাস প্রভৃতি বায়ুক্রিয়া নিহিত আছে তৎসমুদায়ই যোগক্রিয়া। এই জন্যই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের দ্বারা ঐ সকল পূজাদির অনুষ্ঠান করাইবার বিধি নাই। এবং এই জন্যই এখনও কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারাই ঐ সকল করান হইয়া থাকে। যোগীরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পদবাচ্য এবং তাঁহারাই কেবল ঐ সকল পূজাদি প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিকভাবে করিতে সমর্থ। উপস্থিত কালে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরল। ব্রাহ্মণের এই অভাব হেতু শ্রাদ্ধাদিতে আজ কাল কুশের ব্রাহ্মণের পূজা করা হয়। প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে ঐ সকল কর্ম্ম তামসিক ও রাজসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং তামসিক ও রাজসিক কর্ম্মের ফল কখনও শান্তি হইতে পারে না। এই সকল কর্ম্ম যোগীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে যাহাতে ঐ গুলি বাহ্য যাগ না হইয়া অন্তর্যাগে পরিণত হয় তিনি এরূপ ভাবে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং শিষ্যকেও সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের উপদেশ দিয়া শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নতুবা বাহ্য-যাগে কিম্বা তামসিক বা রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা শান্তি লাভের আশা করা দুরাশামাত্র। ইহা অপর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন, কারণ মহারাজ নিজেই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। মহারাজ নিজেই ত এতদিন পূজা জপ যাগ যজ্ঞ অনেক করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম বাহ্য তামসিক ও রাজসিক

ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আপনার শান্তি লাভ হয় নাই। বরং অসহ্য অনুতাপ ও শান্তির স্থলে অশান্তিই হইয়াছিল।

রাজা আরও জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর! প্রাণায়ামাদি বায়ুক্রিয়ার দ্বারাই যে শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? আমার বোধ হয় প্রাণায়ামাদি বায়ুক্রিয়া সাধন করাও কঠিন। ইহা অপেক্ষা কি আর এমন সহজ ক্রিয়া নাই যদ্দারা শান্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়?

গুরুপুত্র বলিলেন মহারাজ! প্রাণায়াম যোগসাধনই শান্তি লাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির এক মাত্র মুখ্য কারণ। আপনি যাহাকে সহজ মনে করেন তাহা প্রকৃত সহজ নহে। ভগবৎ সাধন করিতে গেলে বাক্য বা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা করা গৌণ সাধন; কেন না প্রাণ হইতে ঐ সকল গৌণ। প্রাণের অস্তিত্বেই বাক্য মন ইন্দ্রিয় বা শরীরের অস্তিত্ব এবং প্রাণ হইতেই উহাদের উৎপত্তি। প্রাণের উৎপত্তি অব্যক্ত হইতে। সুতরাং বাক্য মন ইন্দ্রিয় ও শরীর ইহারা সকলেই অব্যক্ত হইতে প্রাণ অপেক্ষা দূরে অবস্থিত। বিশেষতঃ প্রাণকে স্থির করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না। ইহাতে আপনি বলিতে পারেন, "কেন, কোন একটা বিষয়ে বা ভগবৎ মূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাস করিব। ক্রমশঃ এই রূপ অভ্যাসের দ্বারা আমার মন স্থির হইবে?" ইহা মুখে বলিতে ভাল, কার্য্যে পরিণত করা কত কঠিন তাহা যিনি ভুক্তভোগী তিনিই জানেন। অপরের জ্ঞাতব্য নহে। জীব মাত্রেতেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা এক

একটাই দুর্জ্জয়। মনে করুন্ যখন ইহারা সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিবে, তখন কে রক্ষা করিবে? মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; প্রাণের চঞ্চলতা না গেলে, সেই মন কিছুতেই স্থায়িরূপে এক বিষয়ে স্থির থাকিবে না। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। অতএব প্রাণায়াম-যোগাভ্যাস ব্যতীত আর কিছুতেই সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনে করুন, আপনি একটা তরকারী পাক করিবেন। তরকারী পাক করিতে গিয়া হাঁড়িতে ঝাল মসলা লবণ জল তৈল বা ঘৃত ও তরকারী দিয়া হাঁড়ি উনানে চড়াইয়া দিলেন, কিন্তু অগ্নিব্যতীত ঐ সকল তরকারী কি সিদ্ধ করা যায়? নিশ্চয়ই ঐ গুলি অগ্নিব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। তদ্রূপ তেজোরূপ প্রাণকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়গণকে সিদ্ধ (জয়) করিতে পারা যায় না। প্রাণের সাহায্যব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না, তরকারীর ন্যায় কাঁচা থাকিবে। অসিদ্ধ তরকারী যেমন মনুষ্যের আহারে না আসিয়া পশুদিগের আহারে আইসে, তদ্রূপ অসিদ্ধ (অজিত) ইন্দ্রিয়গণও আত্মার উপকারে না আসিয়া পশুরূপী রিপুগণের উপকারে আইসে অর্থাৎ একপ ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির দোষে রিপুকুলের প্রাধান্য বিস্তার করাইয়া আত্মার অধোগতি করায় মাত্র। আত্মার উন্নতিই আত্মার উপকার, অধোগতিই আত্মার অপকার। সেই আত্মাই প্রাণরূপে সমস্ত জীবেই রহিয়াছেন। যাঁহারা তমঃ বা রজোগুণান্বিত তাঁহারা কেহই পরিণামদর্শী নহেন। তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করেন ঐ সকল পরিণামে ক্লেশকর কিন্তু আশু মুগ্ধকর বা সুখকর। তাঁহারা যাহাতে প্রথমে একটু কষ্ট দেখেন, তাহাকেই কষ্টকর

মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং অযথা তাহার নিন্দা করেন। সুতরাং প্রাণায়ামরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মেও প্রথমে কিছু কষ্ট মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক কর্ম্ম প্রথম আরম্ভ মুখে কিছু কষ্টকর কিন্তু পরিণামে সুখকর। একটী সোজা কর্ম্ম ভ্রমবশতঃ উল্টা অভ্যাসে সড়গড় হইয়া গেলে, তাহাকে সোজা করিতে যেমন একটু কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়ামরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্ম প্রথমে একটু কষ্টকর বোধ হইয়া থাকে। নচেৎ অন্য কোন প্রকার কষ্টকর নহে। জীব মাত্রেই প্রাণের কর্ম্ম আপনা আপনি হইতেছে। ইহাতে কোন কামনা নাই। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, সঙ্গরহিত রাগদ্বেষবর্জ্জিত ও পরিণামে সুখকর তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। একমাত্র প্রাণ কর্ম্মেই এই গুলি সব দেখা যায়। ইহার সহবাসে যিনি থাকেন তিনিও তদ্ভাবাপন্ন হন কেননা যাহার যেমন ভাবনা তাহার গতিও তদ্রূপ। পরে তাহাতে থাকিতে থাকিতে তিনি তাহার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন। গুরূপদেশে প্রাণকে অন্তমুখী করিয়া প্রাণের বৃদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম। গুরূপদেশ ব্যতীত প্রাণায়াম করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রাণায়ামে বায়ুরোধ নাই। যাঁহারা প্রাণায়াম জানেন না, তাঁহারাই কিম্ভূত কিমাকার করিয়া বায়ুরোধ ও তদ্দ্বারা সাধারণের সন্দেহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই প্রাণায়ামের অপর একটী নাম সহজ কর্ম্ম। জন্মের সহিত যাহা পাওয়া যায় তাহাকেই সহজ (সহ + জন + ড = সহ জায়তে ইতি) বলে। এক মাত্র প্রাণকেই জন্মের সহিত পাওয়া যায়। প্রাণই বীর্য্যরূপে

জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং সেই বীর্য্যরূপী প্রাণের দ্বারা দেহ ইত্যাদি হয়। সুতরাং প্রাণই সহজ এবং এই প্রাণের কর্ম্মই সহজ কর্ম্ম। মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সহজ কর্ম্ম আর কিছুই নাই। এই সহজ কর্ম্মের দ্বারা যে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ হয় তাহাকেই সহজাবস্থা বলে। মহারাজ! এই সহজাবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা নিজ বোধ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না। সেই সহজাবস্থাই পরম সুখপ্রদ এবং উহা একমাত্র সহজ প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ হইবার নহে। পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত স্থলে প্রাণকে তেজোরূপ বলিয়াছি। এক্ষণে মহারাজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। প্রাণ তেজোময় এবং সেই তেজের উত্তাপও আছে। গাত্রে যে উত্তাপ প্রকাশ হয় তাহা প্রাণ হইতেই আসিতেছে। প্রাণ বহির্গত হইলেই ঐ তাপ একবারে ঠাণ্ডা হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। মহারাজ! সনকাদি ঋষিগণ সকলেই এই সহজ প্রাণায়ামরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তবে মোহবশত যাঁহাদের অন্তরে এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখভোগকেই মোক্ষ বলিয়া ধারণা আছে তাঁহারাই ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য ও নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রচারের জন্য এই প্রাণায়ামরূপ মহাধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন মাত্র। এই প্রাণায়াম সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং এক এক সম্প্রদায়ের যে এক একটী অভীষ্ট দেবতা আছেন সেই সকল অভীষ্ট দেবতারাও এই প্রাণায়াম যোগাভ্যাস করিতে বিধি দিয়াছেন ও তাঁহারা স্বয়ংও এই প্রাণায়ামরূপ আত্ম-

কর্ম্মের দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, শ্রীরামচন্দ্র, সূর্য্য, গণেশ, মনু, ইক্ষ্বাকু, জনক, নারদাদি ঋষিগণ, শুকদেব, দত্তাত্রেয়, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষ নাথ, গুরু রামানন্দ, তুলসী দাস, কবির, নানক, সুরদাস প্রভৃতি সাধুগণ এবং ইদানীন্তন সাধুদিগের মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌরাঙ্গদেবের শিষ্যগণ, চণ্ডিদাস, আউল চাঁদ (বাউল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক) এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই এই প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালেও সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যোগিগণ বিদ্যমান আছেন। কাহারও বা সিদ্ধাবস্থা চলিতেছে, কেহবা মুক্তাবস্থায় আছেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা গেল না। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণ নিজে নিজে এই প্রাণায়াম করিয়া উহা আমাদিগকে করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন তখন ইহাতে কোন সন্দেহ করা হিন্দু মাত্রেরই উচিত নহে। বিশেষতঃ দেবতা ও ঋষিগণ সকলেই কি বোকা ছিলেন এবং আমাদের বুদ্ধি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বেশী? এই প্রাণায়াম অবশ্য করণীয় না হইলে তাঁহারা হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই তাহার ব্যবস্থা দিবেন কেন? হায়! হায়! দুই একটা শ্লোক বা দুই এক পাতা পুঁথি পড়িয়া আমাদের এত অহঙ্কার হইয়াছে যে, আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি যে প্রাণায়ামের দ্বারা আমাদের শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? তাহাও না হয় স্বীকার করা যাইত যদি ঐ সকল মহাত্মাদিগের ন্যায় এ পর্য্যন্ত কেহ কোন কার্য্য দেখাইতে পারিতেন। অতএব ঋষিবাক্য অভ্রান্ত—আমাদেরবোকাই ভ্রান্ত।

রাজা গুরুপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! আপনার নিকট হইতে সারগর্ভ তত্ত্বোপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে তাহা আমি মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না। ঠাকুর! অদ্য আপনি যেরূপ কৌশলে জলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে, আপনি ব্যতীত আর কেহই আমাকে শান্তিমার্গ দেখাইতে পারিবে না। রাজা পরীক্ষিৎ যেমন শুকদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন আমিও তেমনি আপনার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া নিশ্চয় শান্তি প্রাপ্ত হইব। শুকদেবও পাগল ছিলেন, আপনিও পাগল। তবে আপনারা কর্ম্মের পাগল। আপনারা কর্ম্মব্রহ্মে তন্ময় হইয়া পাগল হইয়াছেন, আর যাহারা সাধারণ পাগল তাহারা পার্থিব বিষয়ে তন্ময় হইয়া পাগল হইয়া থাকে। আপনাদের মত দুই এক জন পাগল সংসারে প্রকাশ হইলে সংসারের অন্ধকাররূপ তমোগুণের নাশ হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনারা সর্ব্বত্র থাকিয়াও সর্ব্বত্র প্রকাশমান নহেন। আপনারা যে সকল সাংসারিক জীবের হৃদয়ে প্রকাশ-মান তাঁহারাই জগতীতলে ধন্য। নাথ! আমি অধম অপেক্ষাও অধম। রাজা পরীক্ষিৎ পূর্ব্বসুকৃতিবলে ঋষিপুত্রকর্ত্তৃক অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় ঋষিপুত্র ভক্ত রাজার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার ছলে শাপ দিয়াছিলেন। ঋষিপুত্র শাপ না দিলে ত রাজা

পরীক্ষিৎ শুকদেবের চরণ দর্শন পাইতেন না এবং শুকদেবের চরণ দর্শন না পাইলেও তাঁহার শান্তি লাভ হইত না। অতএব আমার বিবেচনায় ঋষিপুত্র ভক্ত রাজাকে শাপ দিয়া প্রকারান্তরে বর প্রদানই করিয়াছিলেন। কিন্তু হে নাথ! আমার দশা কি হইবে? আমিও ত গুরুদেবকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষিতের ন্যায় বরবৎ ব্রহ্মশাপ ত প্রাপ্ত হই নাই? আমার পূর্ব্ব সুকৃতি আছে কি না তাহাও জানি না। ইহ জন্মেও কোন সৎকর্ম্ম করিয়াছি কি না মনে হয় না, বরং দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। নাথ! আমার কি গতি হইবে? আমি কি আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইব না? আমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে আপনার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিতেও সাহস হয় না। নাথ! আমি আপনার শরণাগত, শিষ্যেরও অনুপযুক্ত; আমাকে রক্ষা করুন।

গুরুপুত্র রাজার এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রাজাকে ধন্যবাদের সহিত আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন আপনি ক্ষণকালের জন্য স্থির হউন, আমি পিতাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া আপনাকে আত্মজ্ঞানলাভজনক কর্ম্মের উপদেশ দিব। গুরুপুত্র উপদেশ দিবেন এই কথা শ্রবণমাত্র আনন্দে রাজার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুবারি পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রাজা গুরুপুত্রের বাক্যানুসারে নির্ব্বাত দীপের ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ, পুত্রের এই সকল বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়া পুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, পুত্র রাজাকে যে সকল কথা বলিতেছে, তাহা কোথাও পড়া দূরে থাকুক্ কখন শুনিও নাই। এরূপ ভাবের কথা পুত্র কোথায় শিখিল? আমি জানিতাম এ পাগল, এখন দেখিতেছি আমিই পাগল, পুত্র ত পাগল নহে। ব্রাহ্মণীও একবার বলিয়াছিল, পুত্র ছদ্মবেশে আমাদের ছলনা করে, ও পাগল নহে। তখন মনে করিয়াছিলাম ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোক ও স্নেহের খাতিরে বলিতেছে; এখনত দেখিতেছি ব্রাহ্মণী যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক। ব্রাহ্মণীই ধন্যা; সে রত্নগর্ভা, তাহার পুণ্যেই এই অমূল্য রত্ন লাভ হইয়াছে। আমার যাহা বিদ্যাবুদ্ধি তাহা আজ সব ধরা পড়িয়াছে। এতকাল মনে করিতাম আমি রাজগুরু, আমার ন্যায় দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত আর কে আছে? হায়, হায়! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যাভিমানে, ধিক্ আমার দশকর্ম্মান্বিত উপাধিতে। আমার কোন কর্ম্মেরই জ্ঞান নাই। আমি লোভের বশীভূত হইয়া নানারূপ মদে মত্ত হইয়া সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বৃথাভিমানে মত্ত হইয়াছিলাম। হায়, হায়! ব্রাহ্মণী যদি এই অমূল্য রত্ন গর্ভে ধারণ না করিত, তাহা হইলেত সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হইত, কেহই রক্ষা করিতে পারিত না। রক্ষা করা আমার ত সাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যা, আমি অত্যন্ত নারকী; কোন ক্ষমতা নাই, কোন ক্ষমতা ছিলও না, কিন্তু বিষ নাই কুলার মত চক্র ছিল। হা ধিক্! এখন যেন পূর্ব্বকথা মনে করিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছে।

এমন সময় পুত্র নিকটে আসিয়া পিতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম

করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনাকে এতক্ষণ বদ্ধ রাখিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছি; তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়া বন্ধন মোচন করিতে অনুমতি করুন।

পিতা পুত্রকে বলিলেন, বাবা! তুমি আর আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না। বাবা! তোমার মুখে জলন্ত দৃষ্টান্তের সহিত যে সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিলাম, তাহা কখন কর্ণেও শুনি নাই। বাবা! বলিতে কি এখন তোমার বা রাজার নিকট কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা নাই। বাবা! বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সন্ধ্যাহ্নিক গায়ত্রী জপ প্রভৃতি করিয়া আসিতেছি, এই সব করিয়া মাথার চুল পাকিয়া গেল, কিন্তু বাবা! শান্তিলাভ দূরে থাক্ একমুহূর্ত্তের জন্যও অশান্তি দূর হয় নাই; সময় সময় ভক্তিশ্রদ্ধার সহিতও সন্ধ্যাহ্নিক করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয় নাই। এক্ষণে তাহার কারণ বুঝিলাম। পূর্ব্বে জানিতাম না যে সন্ধ্যাগায়ত্র্যাদির মধ্যেও যোগক্রিয়া আছে; কেবল পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিতাম মাত্র। আমার মন অন্যদিকে বিষয়চিন্তা করিত, কিছুতেই তাহাকে স্থায়িরূপে কোন এক বিষয়ে রাখিতে পারিতাম না। মুখে শব্দ করিয়া দুর্গা-নামাদি জপ করিয়া যাইতাম, মন সম্মুখের দ্রব্যে বা হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাবা! সন্ধ্যাহ্নিক পূজা ইত্যাদি যে যোগক্রিয়া না জানা থাকিলে হয় না, তাহা জানিতামও না; কেবল জিনিষপত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম; সুতরাং নিজেও শান্তি পাইতাম না ও যাঁহার জন্য করিতাম তিনিও শান্তি পাইতেন না। বাবা! আমি এক্ষণে সব বুঝিয়াছি;

আর আমি যোগক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধমনোরথ না হইয়া বাহ্যকর্ম্মে লিপ্ত হইব না। বাবা, তুমি আমার পুত্র নহ, আমিই তোমার পুত্র, তুমিই আমার পিতা। বাবা! আমি তোমাকে এ দড়ির বাঁধন খুলিয়া দিতে বলি না; তবে রাজাকে যেমন শান্তি লাভের জন্য যোগরূপ কৌশলের উপায়সকলের উপদেশ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তদ্রূপ যদি আমার কাছেও প্রতিশ্রুত হও যে, "তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে ও আমাকে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিবে, তাহা হইলে তুমি আমার দড়ির বন্ধন খুলিয়া দিয়া, যাহাতে আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বাবা! শান্তিবিষয়ক যেরূপ উপদেশ করিয়াছ, তাহা আমার ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ। বাবা! আমরা পূজার অন্তে বা কোন যাগ যজ্ঞাদির অন্তে যজমানের গায়ে শান্তিজল মন্ত্র পড়িয়া ছিটাইয়া দিতাম, তাহাতে,না যজমানের না আমার শান্তি হইত। এক্ষণে বুঝিলাম, তাহাতে যজমানের অশান্তি হইত, কেননা সে পয়সা খরচ করিয়া শান্তিজল লইয়া শান্তি না পাওয়ায় বরং তাহাতে তাহার অর্থকষ্ট ও মনঃকষ্ট দুই রকম কষ্টই হইত। আমার তবু অর্থকষ্ট দূর হইত; কিন্তু তাহা কত দিনের জন্যই বা? ফুরাইলেই আবার সে কষ্ট সেই কষ্ট।" এক্ষণে বাবা! আমি তোমার কাছে সেই রকম শান্তির প্রার্থী নহি। রাজাকে যেরূপ শাস্ত্রোক্ত যোগক্রিয়া এবং তদ্দ্বারা শান্তি-লাভের যেরূপ উপদেশ দিবে বলিয়াছ আমি তাহারই প্রার্থী।

পুত্র বলিলেন, পিতঃ। শান্তি কাহারও দিবার অধিকার নাই। একমাত্র আত্মকর্ম্মই শান্তি দিতে সক্ষম; কর্ম্মই ব্রহ্ম এবং সেই

কর্ম্মই আত্মকর্ম্ম। যিনি আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করেন বা তাহাতে লাগিয়া থাকেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন কারণ সেই কর্ম্ম শান্তিময়। জীব সেই কর্ম্মে লাগিয়া থাকিতে থাকিতে শিব ভাব প্রাপ্ত হয়। শিবভাবই মঙ্গলময় ভাব এবং তাহাই শান্তি। কর্ম্মের দ্বারা জীবভাবের নাশ হইয়া যখন শিবভাব প্রাপ্তি হয় তখনই পরা শান্তি লাভ হয়। পিতঃ! ইহাত দিবার নহে, কর্ম্ম করিয়া ইহা লাভ করিতে হইবে। আপনি আমার পিতা গুরু; আমি আপনাকে আত্মবিষয়ক কর্ম্মের উপদেশ করিব না; কেননা আমি আপনাকে উপদেশ করিলেও কালে তাহাতে আপনার অশ্রদ্ধা আসিতে পারে। তবে আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, আমি আপনাকে ও মাতাঠাকুরাণীকে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে উপদেশ দেওয়াইয়া দিব। রাজাও আমার নিকট উপদেশ চাহিতেছেন, কিন্তু আপনাকে যখন আমার গুরুর নিকট লইয়া যাইতে হইতেছে, তখন তাঁহাকেও গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইব এবং তিনিও তাঁহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই কথা শুনিয়া একবার মনে মনে ভাবিলেন যে, রাজাকে আর সেখানে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাজা আমাদের শিষ্য; তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলে শিষ্য ঘরটী যদি যায়? ব্রাহ্মণ তখনই আবার নিজ মনকে ধিক্কার দিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন, হা ধিক্, তুমি এখনও আমার শান্তিপথের কণ্টক হইতেছ! তুমি শিষ্যেরও উপযুক্ত নও, তথাপি এখনও তোমার গুরু হইবার অভিলাষ! শিষ্য করিবার ইচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হও; ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং

পুত্র যাহা বলিতেছে তাহাতে বাধা দিও না। ব্রাহ্মণ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পুত্র বলিলেন, পিতঃ! মনের ধর্ম্মই এইরূপ। মনকে জয় করিতে না পারিলে ভগবদ্‌রাজ্যে বা শান্তিরাজ্যে কাহারও যাইবার অধিকার নাই।

এই সকল কথার পর পুত্র পিতার অনুমতি ক্রমে তাঁহার বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিলেন এবং পিতা পুত্র উভয়ে রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

গুরুপুত্র তখন রাজাকে বলিলেন, মহারাজ এইবার আপনার বন্ধনরজ্জু খুলিব এবং রজ্জুবন্ধনের কৌশলও বুঝাইয়া দিব; পরে যদি কোন দৈব প্রতিবন্ধক না ঘটে তাহা হইলে আপনাকে ও আমার পিতাকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেবের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিয়া আপনাদের সকলকে উপদেশ দেওয়াইব।

গুরুপুত্রের এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, নাথ! আপনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?

গুরুপুত্র বলিলেন, মহারাজ! আমার ত আপনার উপর অকৃপা নাই বরং প্রীতিই আছে; আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে আপনার মঙ্গলব্যতীত অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কারণ আমার যিনি গুরুদেব তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময় আনন্দস্বরূপ। আপনারা তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইবেন।

রাজা বলিলেন, তিনি কি তাঁহার এ অধম অকৃতজ্ঞ সন্তানকে দয়া করিবেন?

গুরুপুত্র উত্তর করিলেন, তিনি কাহারও প্রতি নির্দ্দয় নহেন।

তিনি সকলকেই আত্মতুল্য দেখিয়া থাকেন। তবে যিনি যেমন ভাবে তাঁহার নিকট যান, তিনি তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তিনি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; দর্পণের সম্মুখে আমি যেরূপ ভাবে দাঁড়াইব, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বেও ঠিক তদ্রূপ ভাবই দেখা যাইবে। সুতরাং আমার গুরুদেবের সম্মুখে যিনি যেরূপ ভাবে উপস্থিত হন, তাঁহাকে তিনি সেইরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তিনি সকল ভাবে থাকিয়াও স্বয়ং ভাবাতীত। আরও বলিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছেন, জীবমাত্রেই এই প্রকারে মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা সংসার-রূপ বৃক্ষে আসক্তির সহিত বদ্ধ আছে। মায়ার কোন রূপ নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, আসক্তি পূর্ব্বক মোহিত হইয়া তাহার অস্তিত্ব বোধ করার নাম মায়া। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে মায়া থাকে না। যাহার আসক্তি আছে, তাহার নিকট মায়াও আছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কাহারও নিকট মায়া আছে, কাহারও নিকট নাই। যাঁহার আসক্তির নাশ হইয়াছে তাঁহার নিকট আসক্তি বা মায়া থাকিয়াও নাই। মহারাজ! আপনাকে কৌশলটী দেখাইয়া দিলে আপনি অনায়াসেই বন্ধন খুলিতে পারিবেন; কিন্তু মহারাজ যদি কৌশলটী জানিয়াও, বদ্ধাবস্থাকে ভাল মনে করিয়া বন্ধন না খুলেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার গুরুদেবের কোনও দোষ নাই। কারণ, তিনি আপনাকে বন্ধন খুলিবার উপায় দেখাইয়া দিলেও যদি আপনি তাহা না খুলেন, তাহা হইলে সে দোষ কাহার? অনেককেই প্রায় এরূপ দেখা যায় যে, তাঁহারা গুরূপদেশে বন্ধন খুলিবার উপায় জানিয়াও সংসারে

অত্যন্ত আসক্তি হেতু বন্ধন খুলিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের বন্ধন খুলিবার ইচ্ছা মুখে আছে কিন্তু কাজে নাই; সুতরাং তাঁহারা শান্তির অভাবে অশান্তিই ভোগ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের শান্তি লাভ হয় না। এক্ষণে মহারাজকে গ্রন্থি খুলিবার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! আপনার চরণে কোন বন্ধন নাই—ইহা আপনি দেখিতেছেন। এই চরণের সাহায্যে গ্রন্থি মোচন করিতে হইবে। পায়ের দ্বারা চলা যায় বলিয়া উহাকে চরণ বলে; ইহা বাহিরের চরণ। এইরূপ আর একটী চরণ ভিতরে রহিয়াছে, তাহাই ভগবচ্চরণ; তাহা জীবমাত্রেই শ্বাসরূপে রহিয়াছে। তাহা দ্বারা চালিত হয় বলিয়া তাহাকেও চরণ বলে। গুরূপদেশে এই আভ্যন্তরিক চরণের সাহায্যে তিন গ্রন্থি মোচন করিতে হইবে। আপনার কণ্ঠদেশের বাহিরে যেরূপ গ্রন্থি আছে, উহার ভিতরেও তদ্রূপ জিহ্বারূপ গ্রন্থি আছে। গুরূপদেশে সেই জিহ্বারূপ গ্রন্থি ভেদ করিয়া জিহ্বাকে যথাস্থানে রাখিতে হইবে। পরে আপনার হৃদয়ের বহির্দ্দেশে যে গ্রন্থি আছে, তাহার ভিতরের কার্য্য হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ। গুরূপদেশে অন্য প্রকার কার্য্যের দ্বারা হৃদয়ের বামভাগস্থিত পাপ পুরুষকে নষ্ট করিয়া হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে। নারদের উপদেশে মন্ত্ররূপ চরণের সাহায্যে ধ্রুব হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করিয়াছিলেন। পরে গুহ্যদেশের বাহিরে যেমন একটী গ্রন্থি আছে, উহার ভিতরে তেমনি মূলাধার গ্রন্থি আছে। গুরূপদেশে চরণের সাহায্যে উহা ভেদ করিতে হইবে। যে মায়ারূপ রজ্জু ফাঁসের দ্বারা জীবকে সংসারে জড়াইয়া রাখে,

এই তিন গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলেই তাহা আপনিই খুলিয়া যায়, অর্থাৎ গ্রন্থিভেদ হইয়া গেলেই সহজাবস্থার প্রকাশ হয়। সহজাবস্থা স্থায়ী হইলেই আর মায়া থাকে না, তখনই জীবের মুক্তাবস্থা। এই অবস্থায় পরম শান্তি লাভ হয়। আমি আপনাকে ভববন্ধনরজ্জু খুলিবার উপায় বলিলাম। অতঃপর আমার গুরুদেবের নিকট হইতে কার্য্যগ্রহণ করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন" এইরূপ দৃঢ়তার সহিত কর্ম্ম করিয়া গেলেই আপনার শান্তি লাভ হইবে। এই বলিয়া গুরুপুত্র মহারাজের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা গুরুদেব ও গুরুপুত্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। পরে গুরুদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর। রাজা তদ্‌বাক্যে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে ও নিজ পিতাকে বলিলেন, অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে চলুন গৃহে প্রতিগমন করা যাউক্; যদি কোন দৈব প্রতিবন্ধক না ঘটে, তবে কল্য প্রভাতে উঠিয়া গুরুদেবের বাটী যাইব।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় থাকেন?

গুরুপুত্র কহিলেন, তিনি কোন তীর্থস্থানে বাস করেন।

রাজা বলিলেন, তাঁহার কি পুত্রদারাদি আছে?

গুরুপুত্র কহিলেন, হাঁ আছে।

রাজা বলিলেন, তাহা হইলে আমি রাজ্ঞীকেও ত সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি?

গুরু পুত্র বলিলেন, অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন।

অনন্তর সকলেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা গৃহে আগমন করিয়া রাজ্ঞীকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কহিলেন, কল্য প্রাতঃকালে গুরুপুত্রের গুরুদেবের নিকট যাইতে হইবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যাইতে পার।

রাজ্ঞী রাজার মুখে গুরুপুত্রের আশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রাজার হৃদয়দেশে নিজ মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, নাথ! আমার অদৃষ্টে কি গুরুপুত্রের গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইবে? এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞীর নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা পতিত হইয়া রাজার হৃদয়দেশ প্লাবিত করিল।

রাজা রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, গুরুপুত্র যেরূপ ভাবে বলিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্টে তাঁহার গুরুদেবের চরণ দর্শন লাভ হইতে পারে।

এদিকে ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত গৃহে উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমারই পুণ্যে এবং পুত্রের কল্যাণে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। তুমি রত্নগর্ভা; তুমি যে পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছ, সেই পুত্রের গুণেই আমাদের তিন কুলের উদ্ধার হইবে। ব্রাহ্মণি! তুমিই ধন্যা, অনেক পুণ্যফলে তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছি। তাহার পর ব্রাহ্মণীকে পুত্রের ক্ষমতার বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, কল্য প্রভাতে আমাদের উভয়কে পুত্রের গুরুদেবের নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব অদ্য সকাল সকাল বিশ্রাম করা যাউক। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ শয়ন করিলে পর, ব্রাহ্মণী পুত্রের নিকট

আসিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বাবা গোপাল! তুমিত আমাকে ও তোমার জনককে তোমার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইবে, কিন্তু বাবা! বৌমাকে কি লইয়া যাওয়া হইবে না? আমরা সকলেই উপদেশ পাইব আর বৌমা কি উপদেশ পাইবেন না?

পুত্র বলিলেন, মা! বৌ উপদেশ পাইয়াছে এবং উপদেশ পাইয়া অনেক উন্নতি লাভও করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বৌমাকে ডাকিলেন।

বৌমা নিকটে আসিয়া শ্বশ্রূদেবী এবং নিজ স্বামীকে প্রণাম করিয়া শ্বশ্রূদেবীকে বলিলেন, মা! দাসীকে কেন ডাকিয়াছেন?

ব্রাহ্মণী বলিলেন, মা! তুমি আমার দাসী নও মা! তুমি আমার লক্ষ্মী। এস মা তুমি আমার বাম ক্রোড়ে ব'স। বৌমাকে নিজ বাম ক্রোড়ে বসাইয়া ব্রাহ্মণী পুত্রকে বলিলেন, বাবা গোপাল! কি পুণ্য যে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাবা! আজ আমার কি শুভদিন! বাবা, আমি যেন বৃন্দাবনের গোপালকে কোলে করিয়া আমার কোল পবিত্র করিতেছি। বাবা, আমি ধন্যা; আমি গোপালের মা, কিন্তু বাবা দেখিস্, বৃন্দাবনের গোপাল যেমন ছলনা করিয়া যশোদার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিল, তুই যেন আমায় সেইরূপে কষ্ট দিস্ না। বাবা তুই আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্ যে, তুই আমায় কখনও পরিত্যাগ করিবি না।

পুত্র দেখিলেন যে বড় বেগতিক, মা মায়ার বশীভূত হইয়া স্নেহবশতঃ এইরূপ বলিতেছেন। পুত্র তখন মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা! আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন শয়ন

করা যাউক। মা! আমি কিছু জানি না, গুরুদেব সব ঠিক করিয়া দিবেন।

মা মনে করিলেন, গোপালের ঘুম পাইয়াছে তাই গোপাল শয়নের কথা বলিতেছে। কিন্তু গোপাল যে ঘুমকে ঘুম পাড়াইয়াছে তাহাত আর মা জানেন না ; তাই বলিলেন বাবা গোপাল! তবে আজ শয়ন কর, রাত্রি অনেক হইয়াছে। বিশেষতঃ পরিশ্রমও অত্যন্ত হইয়াছে ; আজ আর কোন কথায় কাজ নাই, আমিও শয়ন করিতে যাই।

এই কথা বলিয়া মাতা উভয়ের মুখচুম্বন করিলে পর, পুত্র ও পুত্রবধূ কোল হইতে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিয়া গৃহে যাইলেন। মাতাও আপনার গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন।

এদিকে গোপাল মনে করিলেন, গুরুদেবকে না বলিয়া একবারে ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া কি ভাল? না—বোধ হয় তাহা ভাল নহে। একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পর তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ করা উচিত। গোপাল যোগবলে সমস্ত ঘটনা গুরুদেবকে জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্য কি ইহাদিগকে লইয়া আপনার সমীপে যাত্রা করিব? তাহাতে এই উত্তর হইল —না, তুমি বলিয়া রাখিও যে, আমি কল্য প্রাতঃকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিব, তাঁহাদের আসিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি অতি গোপনভাবে যাইব, তাঁহারাও যেন কোন গোল না করেন। গোপাল গুরুদেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সস্ত্রীক নিজ সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, পুত্র পিতাকে গুরুদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আপনি এই সংবাদ রাজাকে বলিয়া আসুন। ব্রাহ্মণ পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজাকে গুরুদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেলেন—এমন সময়ে গুরুদেব যোগবলে গোপালের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব গাত্রোত্থান করিতে আদেশ করিলে, গোপাল উত্থিত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। গুরুদেব গোপালকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার সহিত সাধনসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণী ও পুত্রবধূ গুরুদেবের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উভয়েই তথায় আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব উভয়কে গাত্রোত্থান করিতে বলিলেন ও উভয়ের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তোমার সাধনের কুশল ত?

পুত্রবধূ করযোড়ে বলিলেন, ঠাকুর! আপনিত সকলই জানিতেছেন; আমি পতির আজ্ঞামত যথাসাধ্য উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। ভাল মন্দ আপনিই জানেন। তবে আমি নিত্য অপার আনন্দ লাভ করিতেছি এবং তাহাও আপনার কৃপাবলেই হইতেছে।

এই সময়ে গোপালের পিতা বাটীতে আসিলেন এবং শুনিলেন যে, গুরুদেব তথায় আসিয়াছেন। পুত্র পিতাকে আসিতে দেখিয়া পিতাকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেবের নিকট

আনয়ন পূর্ব্বক পরিচয় করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ গুরুদেবের চরণে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন।

গুরুদেব ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন। ব্রাহ্মণ নিকটে বসিয়া গুরুদেবকে দেখিতে লাগিলেন ও গুরুদেবের শরীরে শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন, আমি যাহা দেখিতেছি তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। বাবা! আমার অদৃষ্টে যে এরূপ দর্শন হইবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। বাবা! ইহা কেবল তোমার ও ব্রাহ্মণীর কল্যাণে হইল। ব্রাহ্মণী তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার আজ শিবদর্শন লাভ হইল।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া, অনিমিষ লোচনে গুরুদেবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; মুখে আর কথা সরিতেছে না—যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে; সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। শরীর যেন আর তাঁহার নহে; কোথায় যে রহিয়াছেন তাহা ঠিক বোধ করিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, এমন সময়ে গুরুদেব আদেশ করিলেন যে, রাজাকে সংবাদ দাও এবং তাঁহাকে এই স্থানে আসিতে বল; আমি সকলকেই এই স্থানে উপদেশ দিব।

এইবার ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাবা গোপাল! তুমি রাজাকে সংবাদ দাও, আমি গুরুদেবের নিকট হইতে আর কোথাও যাইব না।

পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া রাজবাটী অভিমুখে গমন করিলেন। রাজদ্বারে উপস্থিত

হইয়া রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দৌবারিক রাজাকে গুরুপুত্রের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। রাজা শ্রবণমাত্র শশব্যস্তে গুরুপুত্রের নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, গুরুপুত্র তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন্। রাজা গুরুপুত্রের বাক্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তদুত্তরে গুরুপুত্র বলিলেন, গুরুদেব আপনাদের উপদেশ দিবার জন্য পিতৃদেবের বাটীতে আসিয়াছেন; আপনি রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে পারেন। আমি গুরুদেবের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি।

রাজা গুরুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি আপনার সঙ্গেই যাইব; রাজ্ঞীর যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। পরে রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন, আমি গুরুদেবের বাটীতে চলিলাম, তথায় আমার কিছু প্রয়োজন আছে। রাজ্ঞীও তথায় যাইবেন; তুমি তাঁহার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। কেবলমাত্র দশ পনর জন পদাতিক সৈন্য ও দুইজন দাসীর অধিক অনুচর তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিবে না। যেন অধিক গোলযোগ না হয়। অতঃপর রাজা গুরুপুত্রের অনুমতি লইয়া স্বয়ং রাজ্ঞীকে এই শুভ সংবাদ দিতে গমন করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা রাজ্ঞীকে বলিলেন, আমি গুরুপুত্রের সহিত চলিলাম, তুমিও আমার পশ্চাৎ গুরুদেবের বাটীতে এস। মন্ত্রীকে আমি তোমার গমনের

বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছি; অধিক বিলম্ব করিও না। গুরুপুত্রের নিকট শুনিলাম যে, আমাদের উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব তথায় আসিয়াছেন; অতএব আমি অগ্রে চলিলাম।

রাজ্ঞী রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দচিত্তে বলিলেন, নাথ! দাসীও আপনার অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু নাথ! দেখিবেন দাসী যেন বঞ্চিত না হয়, দাসীর বল বুদ্ধি ভরসা সমস্তই আপনিই। এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী রাজাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে রাজা রাজ্ঞীর নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া গুরুপুত্রের সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

ওদিকে মন্ত্রী ও রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র যানাদি প্রস্তুত করাইয়া দাসীমুখে রাজ্ঞীকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীও প্রস্তুত ছিলেন এবং সংবাদ পাইবা মাত্র দুই জন দাসী সঙ্গে করিয়া যানারোহণ পূর্ব্বক গুরুদেবের বাটীতে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজা পৌছিতে না পৌছিতে রাজ্ঞীর শিবিকা গুরুদেবের বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল। রাজাও সেই সময়ে আসিয়া পৌছিলেন। রাজ্ঞীর সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, রাজা তাহাদিগকে একটু দূরে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। রাজা রাজ্ঞীকে নিজে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া,রাজ্ঞীর সহিত অগ্রে নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। পরে গুরুদেব রাজাকে ও রাজ্ঞীকে পুত্রের গুরুদেবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে তাঁহার পদতলে প্রকৃষ্টরূপে দণ্ডবৎ পড়িয়া রহিলেন।

গুরুপুত্রের গুরুদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

বৎস! গাত্রোত্থান কর, এবং গাত্রোত্থান করিয়া আত্মকর্ম্ম লাভ করিয়া সেই কর্ম্মের সাহায্যে মুক্তিলাভ কর। আমি তোমার কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি। তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এবং কর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমি বহুদূর হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তৎপরে রাজ্ঞীকে বলিলেন, মা! তুমিও গাত্রোত্থান কর ও আমার নিকট হইতে পতির সহিত আত্ম-কর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ কর।

গুরুদেবের অনুমতি পাইয়া রাজ্ঞী উঠিয়া অবনত মস্তকে রাজার বামপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর গুরুদেব রাজা ও রাজ্ঞীকে আপনার নিকটে বসাইলেন এবং উভয়ের অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া রাজাকে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করাইয়া দিলেন। রাজা স্বশরীরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া সেই রূপেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন, তুমি এই যে রূপ দর্শন করিলে, তাহা রাজা পরীক্ষিৎও শুকদেবের নিকট হইতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি এই রূপে তন্ময় হইয়া রূপাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটী বিষয় তোমায় বলিয়া রাখি—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি;" এই আত্মকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে, সেই সকল তোমাকে কাটাইয়া চলিতে হইবে। তোমার নিজেরই মন তোমায় ফাঁকি দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে ও নানা প্রকার প্রলোভন, ও সন্দেহ আনিয়া দিবে, কিন্তু তুমি

এই যে অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে, তাহা কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও কিছুতেই পরিত্যাগ করিও না। পাষণ্ড মন তোমাকে নানা প্রকার কৌশলে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, যে জ্যোতিঃ তোমার দর্শন হইল তাহা আত্মজ্যোতিঃ নহে। তুমি কিছুতেই পাষণ্ড মনের কথায় ভুলিও না। তখন তুমি জোরের সহিত বলিও—ইহা যদিই আত্মজ্যোতিঃ না হয়, তাহা হইলেও ত ইহা বাহ্যজ্যোতিঃ নহে, ইহা ত আমার শরীরাভ্যন্তরিক জ্যোতিঃ। মনকে বাহ্য বিষয়ে অবলম্বন দিলে সে কিছুতেই স্থির হইবে না, একটার পর একটা এইরূপ নানা বিষয়ে মত্ত হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ নিজ মনকে বহির্বিষয় হইতে যত অন্তর্বিষয়ে রাখিতে পারিবে, ততই শান্তির নিকটে যাইবে। অন্তর্বিষয়ে আসক্ত না হইতে পারিলে, বহির্বিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারিবে না। বহির্বিষয়ে অনাসক্ত হইলেই বহির্জগতে শান্তিলাভ করিবে। তাহার পর অন্তর্বিষয়ে উপরি উক্ত আত্মজ্যোতিতে থাকিতে থাকিতে যখন জ্যোতির অতীত অবস্থায় যাইবে তখনই রূপাতীত অবস্থা লাভ করিবে। এ অবস্থায় অন্তর্বহিঃ নাই, অর্থাৎ অন্তর্বহিঃ সমান হইয়া যায়। তখন সকল বিষয়েরই অতীত অবস্থা লাভ হয়—ইহাই পরম শান্তির অবস্থা। এইবার তোমায় আত্মকর্ম্ম এই প্রাণায়াম দিতেছি—ইহার দ্বারা তোমার মনের দৃঢ়তা হইবে এবং ইহার অবলম্বনে তুমি ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবে। ভবসমুদ্র পার হইবার ইহাই একমাত্র তরণি। ইহাই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ইহা ব্যতীত আর সাত্ত্বিক কর্ম্ম নাই। ইহা আপনা আপনিই হইতেছে ও

ইহাতে কোন কামনা নাই, সঙ্গেরও ইচ্ছা নাই, দ্বেষ বা প্রীতিও নাই। তুমিও যদি ইহার সহবাসে থাকিতে পার, তাহা হইলে তুমিও সঙ্গরহিত ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইবে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। ভরত রাজা যেমন হরিণ শিশুর সহবাসে থাকিতে থাকিতে তাহাতেই তন্ময় হইয়া হরিণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তেমনি যিনি যাঁহার সহবাসে থাকেন, তিনিও তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যান। অতএব এই সহজ প্রাণায়ামের সহবাসে থাকিতে থাকিতে আপনিও ইহাতে তন্ময় হইয়া সহজাবস্থা, গুণাতীত অবস্থা, কৈবল্য অবস্থা, লাভ করিতে পারিবেন। এইগুলি এক অবস্থারই নামান্তর মাত্র।

পরে গুরুদেব রাজাকে একটী কর্ম্ম করাইয়া একটী অবস্থা দেখাইয়া দিলেন। রাজা তাহাতে নিজে এক অপূর্ব্ব স্থির আনন্দ অনুভব করিলেন। গুরুদেব রাজাকে বলিয়া দিলেন আপনি এই অবস্থা স্মরণে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। কর্ম্মের দ্বারায় ইহা আপনিই হইবে। এই আত্মকর্ম্মের সহিত আপনাকে সমস্ত উপদেশ বলিলাম। এক্ষণে আপনি কর্ম্মের দ্বারায় শান্তিলাভ করুন। এই কর্ম্মের দ্বারায় দেবগণ, সাধুগণ, ঋষিগণ সকলেই সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। আপনিও সংশয়রহিত হইয়া করিলে ইহার দ্বারা সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তা-বস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। মুক্তাবস্থাই পরম শান্তির অবস্থা। এক্ষণে আপনার যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয় থাকে, তাহা আমাকে বলুন, আমি তাহা ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

রাজা শুকদেবকে বলিলেন, নাথ! আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয় হইতেছে না; কারণ, আপনি ত আমাকে সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। যাহা কখনও কর্ণেও শ্রবণ করি নাই, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দিলেন। যাহাদের নিজের কিছু করিবার ইচ্ছা নাই, অথবা যাহাদের মোক্ষলাভের বা শান্তিলাভের ইচ্ছা নাই, তাহারাই নিজের দল-পুষ্টির মানসে নানা প্রকার অসার কূটতর্কের অবতারণা করিয়া বালকের ন্যায় ইহাতে সংশয় বা সন্দেহ করিয়া ও জন্মাইয়া লোকসংগ্রহ করিয়া থাকে। নাথ! আমার আর কোন বিষয়েই সংশয় বা সন্দেহ নাই, বরং অপার আনন্দই লাভ করিয়াছি—যে আনন্দ এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মেতেই প্রাপ্ত হই নাই। আমি নিজে অনেক যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হয় নাই। কিন্তু আপনি যে রূপদর্শন করাইয়া দিলেন ও যে কর্ম্মের উপদেশ দিলেন, তাহা অল্পকাল মাত্র করিয়াই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই কর্ম্ম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিলে যে নিশ্চয় শান্তিলাভ করিব, তাহাতে আর আমার অণু-মাত্র সন্দেহ নাই।

শুকদেব রাজাকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। আপনি যে ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন তাহাতে এই রূপই সম্ভব। আপনার নিজের গুণে তাহা হইয়াছে। উপদেশকালীন উপদেশ দাতা ও গ্রহীতা যেরূপ ভাবে থাকেন, তাহার ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গ্রহীতা যদি রাজসিক বা তামসিক ভাবে থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলও তদনুরূপ

হইয়া থাকে। এই কারণে উপস্থিত সময়ে দীক্ষাদি সব রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার ফলও তদনুরূপ হয়। পূর্ব্বকর্ম্মফলে উপদেশকালীন পার্থিব বিষয়ে আপনার মন ছিল না, সুতরাং আপনার ফলও উত্তম হইয়াছে।

রাজা বলিলেন, নাথ! পূর্ব্ব হইতে আপনি আমার সহিত 'তুমি' 'তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছিলেন, এক্ষণে আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন? আমি আপনার দাসানুদাস, আমাকে 'আপনি' বলায় ত আমার অমঙ্গল হইতে পারে?

গুরুদেব বলিলেন, আমার দ্বারা আপনার কোন বিষয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; বরং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহাই আমার দ্বারা হইবে। পূর্ব্বে যতক্ষণ আপনি উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, ততক্ষণ আপনার নিকট আমার প্রার্থনাও ছিল এবং আপনি আমাকে (বা আত্মাকে) অজ্ঞাত ছিলেন। অজ্ঞাত থাকায় আমা হইতে পর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ে ছিলেন। এইরূপ পর থাকায় 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন আপনি উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপনি আমাকে বা আত্মাকে জ্ঞাত হওয়ায় পর হইতে আপনার বা আত্মার হইয়া গেলেন। সুতরাং এক্ষণে আর 'তুমি' নাই—সব আপনার হইয়া গিয়াছে। এইরূপে যখন আপনি সাধন দ্বারা আমাকে অভেদ দেখিবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন সেখানে 'তুমি' 'আমি' নাই। সাধনদ্বারা যখন আপনার এই 'তুমি' 'আমি' যাইবে, তখন আপনার গতির পর পরমগতি অর্থাৎ পরম শান্তি লাভ হইবে।

রাজা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আমি পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যা আহ্নিক যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা কি এক্ষণে পরিত্যাগ করিব?

শুকদেব বলিলেন— না, ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমিত আপনাকে কোন বিষয় পরিত্যাগ করিতে বলি নাই; কারণ, ইচ্ছাত্যাগ না হইলে পরিত্যাগ হয় না—ইচ্ছাকেই ত্যাগ করা উচিত। সেই ইচ্ছাত্যাগও ইচ্ছা করিয়া করা উচিত নহে; কারণ, তাহাও ইচ্ছা। আর ইচ্ছা করিলেই যে ইচ্ছাত্যাগ হইবে তাহাও নহে। তবে আপনি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিয়া সাধারণকে দেখাইতে পারেন ও বলিতে পারেন যে, আমি বৈরাগী বা ত্যাগী; কিন্তু উহা মিথ্যাচার মাত্র। এই আত্মকর্ম্মের দ্বারা যখন স্বতঃ ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়, তখনই যথার্থ বৈরাগ্য বা ত্যাগের অবস্থা লাভ হয়। নচেৎ ইচ্ছা থাকিতে বৈরাগ্য বা ত্যাগ হইতে পারে না। ইচ্ছাই বন্ধের কারণ। সদ্ভাবেই হউক বা অসদ্ভাবেই হউক, জীবের দেহে এই ইচ্ছা যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল তাহার অশান্তির নাশ হইবে না। ইচ্ছার নাশ হইলেই অশান্তির নাশ হইবে। আপ্ত ব্যক্তির কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই; কেননা তিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকায়, তাঁহার প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। যাঁহারা আপ্ত তাঁহারাও এই আত্মকর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাপ্তির ইচ্ছার অতীতাবস্থায় যাইয়া আপ্ত হইয়াছেন, কারণ প্রাপ্তি হইলে আর প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না। তাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া

তদ্ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। আত্মার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই এবং আত্মার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকায় জগতেরও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই। আপনিও এক্ষণে আত্মকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া চলুন। আপনার যেরূপ প্রকৃতিতে জন্ম হইয়াছে, তাহাতে আপনি আপনার বংশের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল বাহ্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্ব হইতে করিয়া আসিতেছেন, ঐ সকল একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া, করিয়া চলুন। তাহার পর ঐ সকল যখন বাহ্ কর্ম্ম বলিয়া আপনার নিজবোধ হইবে, তখন ঐ গুলি আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে, ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না। সন্ধ্যার উপাসনাও যোগক্রিয়া। যাঁহাদের যোগক্রিয়া লাভ হয় নাই, তাঁহাদিগের জন্যই এই বাহ্ সন্ধ্যা রহিয়াছে। সাধক গুরূপদেশে এই বাহ্ সন্ধ্যার স্থলে যোগক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। অন্তঃসন্ধ্যাকে সাধন দ্বারা বদ্ধ্যা করিয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বাহ্ সন্ধ্যায় তাহা হয় না। সন্ধ্যার উপাসনা ত্রিকালীন করিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু কোন কোন বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বাহ্যদৃষ্টিতে বলিয়া থাকেন, সন্ধ্যা দুইবার করা উচিত, কারণ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা নাই। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যদি মধ্যাহ্নসময়ে বিধি থাকে, তাহা হইলে মধ্য রাত্রিতে সন্ধ্যা না করা হয় কেন? তাহা হইলে ত্রিসন্ধ্যার স্থলে চতুঃসন্ধ্যা হয়। এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে উষাকালে এক সন্ধ্যা, আর সূর্য্যাস্তের সময় গোধূলি এক সন্ধ্যা। এই উভয় সন্ধিক্ষণে কালের যে মিলন

বা লয় তাহাই উভয় সন্ধ্যা। এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়াহ্ন এই উভয় সময়ে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে বলেন। বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না এবং যুক্তিবিরুদ্ধও নহে। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা এই যুক্তিকে ভুল বলিয়া থাকেন। সন্ধ্যার যে ত্রিকালীন বিধি আছে তাহাই ঠিক। কারণ, কাল অনন্ত; সেই কাল ঘটস্থ হওয়ায় তাহার সংখ্যা হইতেছে। সেই সংখ্যা হইতেই সাংখ্য। সেই কাল ত্রিভাগ হওয়ায় ত্রিকাল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইহাতে তিনটী সন্ধিস্থল বা মিলনস্থল রহিয়াছে। ঘটস্থ কালরূপী প্রাণ ঈড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী হইতে যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে যায়, তখন অর্থাৎ চন্দ্র নাড়ী ছাড়িয়াছে, অথচ সূর্য্য নাড়ীতে পৌছে নাই এই সন্ধিক্ষণই এক সন্ধ্যা। ইহাই সুষুম্নার বা সত্ত্বগুণের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতি লাভ করিতে না পারায় সূর্য্যনাড়ীতে প্রাণের গতি হইল। আবার পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ী হইতে ঈড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ীতে যাইবার সময় প্রাণ যখন মধ্যাবস্থায় আইসে তখন এক সন্ধ্যা; কারণ, তখন সূর্য্য নাড়ীতেও প্রাণের গতি হইতেছে না এবং চন্দ্র নাড়ী ঈড়াতেও গতির আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং সন্ধ্যা উভয়বিধ হইল—প্রাতঃ ও সায়াহ্ন সন্ধ্যা। এইবার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কথা বলিব। ইহা যোগিব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা কল্পনাকরিলে হইবে না, কার্য্যে পরিণত করা উচিত। একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রকৃত সন্ধ্যা করিতে সমর্থ। যোগীই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। তৎপুত্রও ব্রাহ্মণ নহেন,—ব্রাহ্মণপুত্র মাত্র। ব্রাহ্মণ বিরল

হওয়ায় অন্তঃসন্ধ্যা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। সাধক এই উভয়বিধ সন্ধ্যার উপাসনা বা সেবায় রত থাকিতে থাকিতে, যখন মধ্যাবস্থা বা সুষুম্না অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করেন, তখন তিনি এই সত্ত্বগুণে বা সুষুম্নায়ও একটী সন্ধ্যা দেখেন। তাহা সত্ত্বগুণ হইতে গুণাতীত অবস্থায় যাওয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণেও নাই, গুণাতীত অবস্থাতেও স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই,—একবার সত্ত্বগুণে আবার সত্ত্বগুণ বা সুষুম্না ছাড়িয়া গুণাতীত অবস্থায় আসা। এই সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সুষুম্না এবং গুণাতীত অবস্থা এই দুয়ের মধ্যেও এক সন্ধি আছে। ইহাই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। যোগী এই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া ক্রমে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিসন্ধ্যা। এই সকল সন্ধি স্থলে অণুস্বরূপে সূক্ষ্মভাবে স্থিরকাল রহিয়াছে। ইহাই সন্ধিক্ষণ বা মাহেন্দ্রক্ষণ। যোগিব্যতীত অপরে এই কালকে অবগত নহে। যোগী সহজ প্রাণায়ামের অভ্যাসে মাহেন্দ্রক্ষণের বিস্তার করিয়া সেই অবস্থায় সর্ব্বদা থাকেন। বায়ু রোধ করিয়া যে প্রাণায়াম করা হয়, তাহার দ্বারা এ অবস্থা লাভ দুঃসাধ্য। সহজরূপ অন্তর্মুখ প্রাণায়াম ব্যতীত ইহা আর কিছুতেই লাভ হইবার নহে। এইরূপ অন্তঃসন্ধ্যার উপাসনায় সাধক সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। তবে যিনি অন্তর্বিষয়ক আত্মযোগের উপদেশ পাইয়া বাহ্য সন্ধ্যায় মগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র। পাছে কেহ আত্মযোগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য যজ্ঞে মগ্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় স্বয়ং মহাদেব ও ঋষিগণ বাহ্য যাগযজ্ঞকে ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্ন বলিয়াছেন। অতএব আপনি আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইয়া অনাসক্ত

ভাবে বাহ্য কর্ম্ম করিয়া চলুন। ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকারও আছে; সেই উপকার এই—যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিতে চাহে না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবারজন্য বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া আটকাইয়া রাখা। তাহার পর তাহারা যখন বুঝিবে যে বাহ্য কর্ম্মে সুখ নাই, তখন তাহারা আপনা আপনিই সাত্ত্বিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যে সকল বাহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইয়া সে সকল করিয়া চলুন। কিছুই ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না। তবে আত্মকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই মগ্ন হইবেন না। আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইতে পারিলেই আপনা আপনিই বাহ্য কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া যাইবেন, আপনাকে ইচ্ছা করিয়া কিছুই পরিত্যাগ করিতে হইবে না—সে সকল আপনিই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। জোর করিয়া কোন বিষয় পরিত্যাগ করিলেই অশান্তি হইবে। তাহা করিবেন না। তবে যে সকল কর্ম্ম সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত, সে গুলি অন্তরে পরিত্যাগ করা না হইলেও অর্থাৎ মনে মনে করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যে পরিণত করা উচিত নহে; কারণ, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট বা কুশিক্ষা হয়, সে সকল করা উচিত নহে। অন্তরের অসদিচ্ছা সকল গোপন না করিয়া উপদেষ্টার নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি তাহার উপায় বলিয়া দিবেন। উপদেষ্টার উপদেশ মত চলিলে, অন্তরে কোন কুপ্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু উপদেশ অনুসারে না চলিলে অনিষ্টই হইতে পারে। উপদেশ মত ঠিক চলিলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই নাশ হইয়া যাইবে।

রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! শাস্ত্রাদি কি কি পাঠ করিতে হইবে? বিশেষতঃ যখন কোন কাজ কর্ম্ম থাকিবে না, তখন চুপ করিয়া বা আমোদ আহ্লাদে সময় না কাটাইয়া, সাধুসঙ্গরূপ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা ত অনেক উপকার হইতে পারে?

গুরুদেব বলিলেন, শাস্ত্রাদির মধ্যে একমাত্র গীতা পাঠ করিতে পারেন। অপরাপর শাস্ত্রের দ্বারা আপনার কিছুই লাভ হইবে না, বরং অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে না পারায় ঘোর সংশয়ে পতিত হইয়া, নিজে জ্ঞানী হইয়াছি এই অভিমানে, কর্ম্মে অনাস্থা হওয়ায় ঘোর বিপদে পড়িবেন। তবে যদি কোন সংযমী পুরুষের নিকট শাস্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কারণ, শাস্ত্র সকলও সংযমী পুরুষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। সংযমীর ভাব সংযমীই অবগত হইতে পারেন। কিন্তু সংযমী পুরুষের ভাব অসংযমী কিরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে? শাস্ত্রের সূক্ষ্মভাব অবগত না হইয়া যদি জড়ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অমঙ্গল ব্যতীত কিছুমাত্র মঙ্গলের আশা নাই। তাহা আপনাতেও ঘটিয়াছে—আপনি শাস্ত্রের জড়ভাবের অর্থমত কার্য্য করিয়া কি কিছু শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আপনিও ত পুরাণাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাহা দ্বারা আপনার কি লাভ হইয়াছিল? বরং অশান্তির জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া আপনাকে কঠোর দণ্ড প্রচার করিতে হইয়াছিল। আপনার দণ্ড প্রচারের ক্ষমতা ছিল, তাই দণ্ড প্রচার করিয়া পূর্ব্ব সুকৃতি বলে আত্ম-কর্ম্ম লাভ করিলেন। যদি আপনার পূর্ব্ব সুকৃতি না থাকিত,

তাহা হইলে হয়ত আপনার মতি অন্যরূপ হইয়া, নরহত্যা নরহত্যাও হইতে পারিত ; কারণ আপনার সে ক্ষমতাও আছে। যাহাদিগের দণ্ড দিবার কোন ক্ষমতা নাই, তাহারা খড়িয়া মার খায়। মনে করুন্ পুরাণের লীলাখণ্ডের দ্বারায় কাহার কি লাভ হইতে পারে ? লীলাখণ্ডে আত্মযোগের বিভূতি বর্ণন আছে। উক্ত বিভূতি সকলই আত্মযোগের অন্তর্গত। আত্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিভূতির (যোগৈশ্বর্য্য বিশেষের) উপাসনা করা যায়, তাহাতে না হয় ঐশ্বর্য্যই লাভ হইল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যে শান্তি কোথায় ? এই জগৎ যাহা দেখিতেছেন, ইহাই পুরাণ। ইহার মধ্যে আত্মা রহিয়াছেন। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি জগতের রূপে মোহিত না হইয়া আত্মাকেই দেখিতেছেন। যাঁহারা আত্মাকে জানেন না, তাঁহারা আত্মাকে না দেখিয়া আত্মার বিভূতি এই মায়ারূপ জগৎ দেখিতেছেন। এই মায়ারূপ জগতে ভাল মন্দ দুইই আছে। যাঁহারা জগৎরূপ পুরাণের আত্মাকে অবগত নহেন, তাঁহারাই এই মায়িক ভাল মন্দের জন্য অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এই জগৎরূপ পুরাণ অবলম্বন করিয়া পুরাণগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। আত্মানারায়ণের বিভূতিই এই দৃশ্যমান্ জগৎ। দৃশ্যমান্ পদার্থ মাত্রই মায়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যিনি আত্মাকে দেখিতেছেন, তিনিই আত্মানারায়ণের মায়ারূপ লীলা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইতেছেন ; কারণ, আত্মাতে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকায় তাঁহারা আত্মময় জগৎ দেখিতেছেন অর্থাৎ সাধারণে যেরূপ ভাবে জগৎ দেখিতেছেন এরূপ ভাবে নহে। তাঁহাদের ভাবে অভাব বা জ্বালা নাই। এ অবস্থা

নিজবোধরূপ। সে অবস্থা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই অবগত হইয়াছেন। সে অবস্থা বলিয়া বুঝাইবার নহে, আত্মকর্ম্ম করিয়া বুঝিতে হইবে, নচেৎ বুঝিবার উপায় নাই। কর্ম্ম না করায় যাঁহারা এই সূক্ষ্মভাব অবগত নহেন, তাঁহারা পুরাণোক্ত আত্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আত্মার বিভূতিরূপ লীলা পাঠ করিয়া কোন শান্তি লাভ করিতেছেন না। জীব মাত্রেই যেমন আত্মানারায়ণের বিভূতিরূপ জগতে আসক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে, তদ্রূপ তাঁহারা পুরাণগ্রন্থস্থিত আত্মযোগ অবগত না হওয়ায় কেবলমাত্র পুরাণোক্ত বিভূতিরূপ লীলা খণ্ডে আসক্ত হইয়া শান্তির অভাবে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। তবে যিনি মায়ার বশীভূত হইয়া স্বর্ণের শিকলে বদ্ধ থাকিয়া আপনাকে সুখী মনে করেন, তাঁহাকে ভ্রান্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? নিজে অসংযত অবস্থায় কিংবা অসংযমীর নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠ করিলে সাধুসঙ্গ হইবে না, কারণ, আত্মাই একমাত্র সাধু। সেই আত্মবিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্র পাঠ অবিদ্যায় পরিণত হইবে। সুতরাং সাধুসঙ্গ না হইয়া অসাধু সঙ্গ হইবে, তাহাতে লাভ কি? অতএব আপনি শাস্ত্র পাঠ নিজে করিবেন না, তবে যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনার গুরুপুত্র গোপালের নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠ করিবেন।

রাজা গুরুদেবকে বলিলেন, নাথ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সমস্ত সত্য; কারণ, আমি পূর্ব্বোক্ত গুরু পুরোহিতের নিকট হইতে শাস্ত্রাদি অনেক শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের সাহায্যে শাস্ত্রপাঠও করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিরূপ শান্তি

লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার পূর্ব্বে যে সংশয় ছিল, তৎসমস্তের খণ্ডন হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে আর আমার নিজে শাস্ত্রপাঠ করিবার ইচ্ছা নাই। তবে যদি আত্মকর্ম্মের অভ্যাসীদের শাস্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে উহা করিতে বাধ্য। তাহা যখন নহে, তখন আমার শাস্ত্রপাঠে আবশ্যক নাই। তবে যদি কখনও শাস্ত্রপাঠের আবশ্যক হয় তাহা হইলে, আপনার আজ্ঞানুযায়ী গুরুপুত্রের নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করিব। শাস্ত্রের এমন উৎকৃষ্ট তাৎপর্য্য থাকিতেও প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে শাস্ত্রপাঠে সংশয় দূর না হইয়া বরং অনেকেরই সংশয় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এক কালে আমারই এরূপ সংশয় হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। নাথ! আপনি যে আমায় গীতা পাঠ করিতে অনুমতি করিতেছেন তাহা ত আমি বুঝিনা, তাহারই বা আমি কি করিব? আর গীতার মধ্যে কোন্ গীতাই বা পাঠ করিব তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন।

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন—আপনি গীতার মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সার। ইহা যোগী, ঋষি, ও দেবগণের হৃদয়সর্ব্বস্বধন। ইহার মূল শ্লোক আত্মকর্ম্মের অন্তে নিত্য পাঠ করিবেন। তাহা হইলে আত্মকর্ম্মে যেমন যেমন উন্নতি করিবেন, ইহারও ভাব তদনুরূপ বুঝিতে পারিবেন। যোগিব্যতীত এই গীতার ভাব কেহই অবগত নহেন। আত্মকর্ম্মের দ্বারা আপনিও ক্রমশঃ এই গীতা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

শরীরবিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান, সত্ত্বঃ রজঃ তম গুণভেদে কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি বিষয়গুলি যেরূপ ভাবে লিপি-বদ্ধ আছে, তদ্রূপ আর কুত্রাপি—কোন শাস্ত্রেই নাই। ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—যেখানে যে কোন শাস্ত্র আছে তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য ইহার মধ্যেই আছে। ইহাতে আত্মকর্ম্মের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত আছে। জীবভাবাপন্ন ব্যক্তি হইতে মুক্তভাবাপন্ন শিবস্বরূপ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা নিত্য পাঠ্য পুস্তক। এই সকল কারণে আপনাকে নিত্য গীতা পাঠ করিতে বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিজের দোষ নিজে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু ইহা একটু শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলেই আমাতে কি কি দোষ আছে বা আমি কিরূপ ভক্ত, কিরূপ শ্রদ্ধাবান্, কিরূপ কর্ম্মী, কিরূপ জ্ঞানী, অর্থাৎ আমি তামসিক-ভাবাপন্ন, কি রাজসিক ভাবাপন্ন, কি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে বক্তি আমার দোষ দেখাইয়া দেয়, সে আমার প্রিয় কি প্রকারে হইতে পারে? এই কারণে গীতা অনেকেরই প্রিয় হইতে পারে না। এই সকল কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আরও অনেক শাস্ত্রাদি আছে তৎসমুদায় গীতা অপেক্ষা ভাল বৈ মন্দ নহে। ইহার কারণ এই যে, হয়ত আমি যে সকল কর্ম্ম করিতেছি বা যে সকল শুষ্ক জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি, বা সন্ন্যাস ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ভগবান্ গীতাতে তাহাকেই মিথ্যাচার বা তামসিক কর্ম্ম বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা আমার প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না। তাই বলিয়া থাকি গীতা অপেক্ষা আরও অনেক

ভাল ভাল শাস্ত্র আছে, ঐ সকল পাঠ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং গীতা ছাড়িয়া ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রসকলের চর্চ্চা করিয়া থাকি। কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্ম সকল না করিলে দর্শনে যে অদর্শন হইবে, সে বোধ আমার নাই। তাহা থাকিলে গীতাকে কণ্ঠে মালার ন্যায় ধারণ করিয়া গুরূপদেশে গীতোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম। কিন্তু যিনি একবার অহংমদে মত্ত হইয়া রাজসিক বা তামসিক কর্ত্তা হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে ছোট হওয়া বড় কঠিন। অতএব আপনি আপনাকে অণুজ্ঞান করিয়া অর্থাৎ জীবমাত্রেই আপনার গুরু, আপনি অণু অপেক্ষাও অণু, ইহা সর্ব্বদা অন্তরে রাখিয়া, গীতাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া গীতোক্ত আত্মকর্ম্ম যাহা পাইলেন তাহা করিয়া চলুন। আর গীতার শ্লোক ও ভাবার্থ গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখুন—ইহাই আমার উপদেশ। এক্ষণে আপনার যদি আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

রাজা কহিলেন, নাথ! আপনার নিকট হইতে যে সকল কথা শ্রবণ করিলাম, গুরুপুত্রও আমাকে এ সকল বাক্যের কতক কতক বলিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতেছি আপনারই কথা। সেই গুলি পুনর্ব্বার আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করায় আরও দৃঢ় হইয়া গেল। এক্ষণে আমার মনে আর একটী বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। নাথ! আপনি স্বয়ং বা গুরুপুত্র ইহার মীমাংসা করিয়া না দিলে, আমি নিজে ইহার মীমাংসা করিতে পারিব না।

বিশেষতঃ আপনার শ্রীমুখ হইতে ইহার মীমাংসা শুনিতে আমার মন ব্যগ্র হইতেছে। আপনার অনুমতি পাইলে আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারি।

গুরুদেব বলিলেন, আপনার যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা আছে, সে সকল অশঙ্কিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে মনে কিছু দ্বিধা বোধ করিবেন না; আপনি অনায়াসে বলিতে পারেন।

রাজা বলিলেন, নাথ! যখন যোগক্রিয়া ব্যতীত কাহারও শান্তি লাভ হইবে না, তখন দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করিবার তাৎপর্য্য কি? বিশেষতঃ মহাভারতে অনেক রাজার অনেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে এবং তাঁহারা যে সকল যাগযজ্ঞাদি করিয়াছিলেন তৎসমস্তই ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু নাথ! দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি পূজা সকল কোন রাজা যে করিয়াছিলেন তাহা ত কই দেখা যায় না। এমতস্থলে মহাভারতে উক্ত পূর্ব্বতন রাজগণ কেহই যখন ঐ সকল পূজাদি করেন নাই, তখন এক্ষণে ঐ গুলি করা হয় কেন?

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন, ঐ সকল পূজার মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য পূজাবিধি সকল প্রচারিত হইয়াছিল। সাধুগণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন, আবার মধ্যে মধ্যে অপ্রকাশ হন। তাঁহাদের অপ্রকাশ অবস্থায় নানা প্রকার অধর্ম্মরূপ আসুরিক সম্প্রদায় প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মরূপ কর্ম্মলোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মশূন্য অধর্ম্মরূপী সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশে কর্ম্ম লুপ্তপ্রায় দেখিয়া

সাধুগণ মানবকে অন্তঃকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত পূজাদি প্রচার করিয়াছিলেন। দেবদেবীর পূজা ঔষধের অনুপান স্বরূপ। বিকারগ্রস্ত রোগী যখন কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহে না, তখন যিনি সুচিকিৎসক তিনি কেবল সুমিষ্ট ও আশুসুখকর অনুপান দিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া থাকেন, কেননা ঔষধ না খাইলে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ যাঁহারা ভবব্যাধির চিকিৎসক, তাঁহারা আশুমনোহর-দৃশ্য ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচাররূপ অনুপানকে সম্মুখে দিয়া ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার-মাতৃকান্যাস, মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ইত্যাদি ঔষধরূপ যোগ-ক্রিয়া অর্থাৎ স্থির প্রাণের ক্রিয়া সকল তাহার মধ্যে রাখিলেন এবং তাঁহারা নিজে সেই সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। যোগিব্যতীত ঐ সকল কার্য্য অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, ঐ গুলির মধ্যে যে সকল বায়ুক্রিয়াদি সন্নিবেশিত আছে, তৎসমুদায় কল্পনা করিলে হয় না, কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। ঐ গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অগ্রে যোগক্রিয়া সকল নিজে অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে। সিদ্ধ হইতে না পারিলে উক্ত কর্ম্মসকল কিছুতেই সফল হইবে না। সাধা-রণের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সমাধা হইতে পারে না বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে ঐ গুলি ন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন প্রকাশিত ছিলেন, তখন ঐ সকল কার্য্য ঠিকভাবে হইত; কারণ, তাঁহাকে কিছুই কল্পনা করিতে হইত না—এমন কি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তাঁহাকে কল্পনা করিতে হইত না। তবে সাধারণের অন্তর্লক্ষ্য না থাকায় পাছে তাহারা আত্মকর্ম্মে

তাচ্ছল্য করে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ম শিলা বা দারুনির্ম্মিত বা মৃন্ময় মূর্ত্তি গঠন করাইতেন। ঐ সকল মূর্ত্তি মূলে মৃৎ শিলা বা দারু নহে। যোগী আত্মকর্ম্মকালীন যে সকল রূপ দর্শন করেন, ঐ সকল মূর্ত্তিও সেই সেই রূপের অন্তর্গত। সুতরাং মূলে ঐ মূর্ত্তি গুলি কল্পনা বা মিথ্যা নহে। একারণ ঐ সকলকে মিথ্যা বলা উচিত নহে। তবে উপস্থিত কালে ঐ গুলি মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। কেননা ব্রাহ্মণ বিরল হওয়ায় ও লোকে কর্ম্মশূন্য হওয়ায় ঐ গুলি তামসিক ভাবে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখন আর পূজা হয় না, কেবল বাহ্য আচার লইয়াই টানাটানি পড়িয়াছে। কর্ম্মের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই দৃষ্টি। যদ্দ্বারা পূজাকার্য্য সমাধা হইবে সেই মন্ত্রবিধির লোপ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যদি আপনি বলেন যে, ব্রাহ্মণ পূজা করিতে না জানিলে তিনিই পতিত হইবেন, কর্ত্তার আর তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? কর্ত্তা যখন নিজে ভক্তিপূর্ব্বক বহুকষ্টে পূজার দ্রব্যাদির আয়োজন করিলেন, তখন তাহা কি সব বৃথা যাইবে? সাধারণতঃ এই রূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাও অজ্ঞানের কথা; কারণ কাহার জিনিস কে কাহারে দেয়? বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইবার বিধি আছে, তখন যাঁহার জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম করানই কর্ত্তার কর্ত্তব্য। কর্ত্তা যদি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থামত কার্য্য না করান, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য পণ্ড হইবে। উপস্থিত কালে সাত্ত্বিক কর্ত্তার অভাব হওয়ায়, সাত্ত্বিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা

দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ত্তাও যেমন রাজসিক ও তামসিক, তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তিও তেমনি রাজসিক ও তামসিক। সুতরাং কর্ম্মও রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মের ফলস্বরূপ শান্তিও তদ্রূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ শান্তির স্থলে অশান্তি ইত্যাদি দেখা যায়। শাস্ত্রে সাত্ত্বিক কর্ত্তার যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহা আর প্রায় দেখা যায় না। সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইবারও কাহারও চেষ্টা নাই। সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকিলে সাত্ত্বিক কর্ত্তাই বা হইবে কোথা হইতে? সুতরাং রাজসিক বা তামসিক কর্ত্তাই প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইতে হইলে আসক্তিশূন্য, অহঙ্কার ও অভিমান শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত, এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকাররহিত হইতে হইবে। এইরূপ কর্ত্তাকেই কেবল সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আজ কাল এরূপ কর্ত্তা প্রায় দেখা যায় না। রাজসিক ও তামসিক কর্ত্তাই অধিকাংশ দেখা যায়। বিষয়ানুরাগ, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, লাভালাভে আনন্দ ও বিষাদ এই সকল ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই রাজসিক কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। আর ইন্দ্রিয়াসক্তি, বিবেকহীনতা, ঔদ্ধত্য, শঠতা, পরাপমানকারিতা, অলসতা, দীর্ঘসূত্রতা এই সকল ভাব তামসিক কর্ত্তার লক্ষণ। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে, যদি কেহ ভক্তি পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন, তাঁহার কি সব বৃথা হইবে? তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে ভক্তি বলে, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত ভক্তি নহে। ভগবান্ শ্রীশ্রীনারায়ণে তন্ময় হইলে যে অবস্থা হয় সেই

অবস্থার নাম ভক্তি বা প্রেম। ইহা সাধনব্যতীত হইতেই পারে না। আমি যাঁহাকে প্রেম বা ভক্তি করিব, তাঁহার সহবাসে যদি আমি না থাকি, তাহা হইলে আমার ভক্তি বা প্রেম কি প্রকারে হইতে পারে? মনে করুন একটী বালিকা যদি চিরকুমারী অবস্থায় থাকে; তাহা হইলে পতিসহবাসের অভাবে তাহার যেমন পতিভক্তি হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ আমারও পতির অবর্ত্তমানহেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া অসম্ভব। ইহাতেও যদি বলা যায় যে, আমি পতির রূপ-চিন্তায় মগ্ন হইয়া পতি-সহবাস-সুখ অনুভব করিব, তাহা হইলেও পতির অদর্শনহেতু আমাকে পতির রূপ কল্পনা করিতে হইবে। কল্পনা সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। কল্পিত রূপের চিন্তা করিলে যে মগ্নাবস্থা হয় তাহাও কাল্পনিক মগ্নাবস্থা। বিশেষতঃ কল্পিত বিষয়ের চিন্তার দ্বারা সহবাস সুখ হইলেও সে সহবাসে কোনও ফললাভ হয় না। স্বপ্নবিকারে যেমন সহবাসসুখ ইত্যাদি সবই হইয়া থাকে কিন্তু ফলস্বরূপ পুত্রলাভ না হইয়া বরং দিন দিন শরীর ক্ষীণ হইয়া অশান্তি ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, কাল্পনিক সহবাস সুখের পরিণামেও তদ্রূপ ফল-স্বরূপ প্রবোধরূপ পুত্র লাভ না হইয়া অশান্তি ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। সুতরাং উহা কোন কাজেরই হয় না। কর্ত্তা সাত্বিকভাবাপন্ন না হইয়া রাজসিক বা তামসিকভাবাপন্ন হইলে, তাঁহার কার্য্যের ফলও রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ ফল পরিণামে সুখকর না হইয়া তদ্বিপরীতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহা

পরিণামে বিষতুল্য হয়, কোন কর্ম্মেরই হয় না এবং কর্ত্তাকেও সেই বিষের জ্বালায় ছট ফট করিতে হয়। পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে সকল বায়ুক্রিয়া নিহিত আছে, বিনা অবরোধে যাঁহার বায়ু স্থির হইয়াছে, তিনি ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা ঐ গুলি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। একারণ গুরূপদেশে অগ্রে প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে পরিণত করিলে, তবে ভূতশুদ্ধি ও অপরাপর কার্য্য গুলি করিতে সক্ষম হওয়া যায়—নচেৎ নহে। যোগাভ্যাস ব্যতীত পূজা করিতে গেলে যজমান ও পুরোহিত উভয়েরই পতন নিশ্চয়। এক জন অন্ধ যেমন আর এক জন অন্ধের পরামর্শে চলিলে উভয়েরই পতন হইয়া জীবননাশ হইবার সম্ভাবনা, ইহাতেও তদ্রূপ। যে মহৎ উদ্দেশে দেবদেবীর পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া আমোদ আহ্লাদে মিলিয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহ্য বিষয় কিছু সম্মুখে দিয়া জীবকে আত্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই পূজার উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষণে তাহা বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে এবং অকার্য্য না হইলেও অকার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি অন্ততঃ আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণপুত্রগণকেও যদি আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার রাজত্বের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে এবং জীবেরও উপকার করা হইবে। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা; কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মরক্ষা হয় না। রাজা বা সমাজপতি ব্যতীত সেই কর্ম্ম রক্ষা হয় না। অতএব লোকে যাহাতে আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আপনার প্রাণপণে

বিধিমতে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এক আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানব্যতীত পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান ও আশ্রমধর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। আত্মকর্ম্মের অভাবে ঐ সমস্তই রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইতেছে এবং দেশে অনাচার অশান্তি প্রভৃতি যে কিছু অমঙ্গল দেখা যায় তৎসমুদায়ই এক আত্মকর্ম্মের অভাবেই হইয়া থাকে। কথার ছড়াছড়িতে কিছুতেই ঐ সকল অমঙ্গলের নাশ হইবে না। সকলে নিজে নিজে আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তবে মঙ্গল হইতে পারে; নচেৎ কেবল তৎকথার আলোচনায় কিছুই হইবে না। পঞ্চম বর্ষের বালক হইতে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। তবে বৃদ্ধাবস্থায় আরম্ভ করিলে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কষ্টসাধ্য। কেননা, শরীরের অধিকাংশ সারভাগ ক্ষয় হওয়ায় বৃদ্ধ প্রায় জরাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার শরীরের বল, মনের বল কিছুই থাকে না। বরং দেহ অনেক ময়লায় পরিপূর্ণ থাকায় মনও অশান্তিপূর্ণ থাকে। এ অবস্থায় আত্মকর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপ লাঙ্গলের দ্বারা দেহ কর্ষণ করিতে কিছু বেশী সময় লাগে। দেহরূপ ক্ষেত্রকর্ষণ করা না হইলেও বীজরোপণ হয় না। একবার এই ব্রহ্মবীজ রোপণ হইলে কিছুতেই আর তাহার নাশ হয় না। সময়াভাব বশতঃ যদি ইহ জন্মেই সিদ্ধাবস্থা লাভ না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বজন্মের সেই বীজ পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া পরে ফল দান করিয়া থাকে। তবে জরাগ্রস্ত অতিবৃদ্ধ যদি গুরুবাক্যমত চলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ইহজন্মেই জরাদি হইতে নিশ্চয় মুক্ত হইতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল প্রায় অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাল্যকালে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি!! ধর্ম্মকর্ম্মের সময় বাল্যকাল নহে!!! ইহা নিতান্ত ভ্রম ধারণা; কারণ, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় ভবিষ্যতে বালকগণের পরিণাম ভয়ানক ও শোচনীয় হইয়া থাকে। বিশেষ ধর্ম্ম ব্যতীত বালকগণের শারীরিক ও মানসিক বল হইতেই পারে না। সুতরাং চিররুগ্ন হইয়া তাহাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মহীন বালকগণের দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হয় না। তবে তাহারা অল্প যে কয়েক দিন জীবিত থাকে, সেই কয়েক দিনের জন্য পিতামাতার কিঞ্চিৎ অর্থের উপকারে আসিতে পারে এই মাত্র। এই ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে পিতামাতাকেও আবার অনেক স্থলে পুত্রের নিকট অতি দীন ভাবে পুত্রের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে দেখা যায়। বালকদিগকে এইরূপ কুশিক্ষা দিবার দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পুত্রের নিকট পিতামাতার স্বার্থ প্রত্যাশা—পুত্র বড় হইয়া চাকরি করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিলে তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবন সুখে কাটাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মোপদেষ্টার স্বার্থ ও শিক্ষাদানের দোষ। যাঁহারা ধর্ম্মো-পদেশ দেন, তাঁহাদের শিক্ষার দোষেই যত কিছু অনিষ্ট ঘটিতেছে। শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান, বাহ্য ভক্তি বা বাহ্য বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। পুত্র মোহমুদ্গর যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, সংসার অনিত্য—পিতাই বা কে,

মাতাই বা কে—সংসারে কোন সুখ নাই, সংসার বন্ধের কারণ, সুতরাং ইহা ত্যাগ করা উচিত—এই ভাবিয়া অন্তরে শুক পুরাণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পাষণ্ডের ন্যায় পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া বনে চলিলেন। এমত অবস্থায় কে বালকগণকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দিতে চাহিবে? সুতরাং পিতা মাতাও ধর্ম্মকর্ম্মকে কুশিক্ষা মনে করিয়া, পুত্রকে তাহার দিকেও যাইতে দেন না। ইহাতে পিতামাতার দোষ কি? যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষা দেন, তাঁহাদের দোষেই পিতামাতা পুত্রকে ধর্ম্মকর্ম্মের শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতেন যে, পুত্রকে ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা দিলে তাঁহাদের স্বার্থে কোন বাধা পড়িবে না, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন কেন? তাঁহারা যদি জানিতেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা পুত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাদের ও দেশের গৌরবের বিষয় হইয়া তাঁহাদিগকে ও স্ত্রীপুত্রাদি অন্যান্য পরিজন বর্গকে পরিত্যাগ না করিয়া বরং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় কেহই বালকগণকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন না। শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা যে বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য ভক্তি বা বাহ্য বৈরাগ্য হয় তৎসমুদায়ই দেশের অমঙ্গলের হেতু। কেননা, এই সকলের দ্বারাই শান্তি লাভ হইবে এইরূপ মনে করিয়া লোকে আর কেহই আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু এই সকলের দ্বারা ত কাহারও শান্তি লাভ হইতেছে না? শান্তি হইবেই বা কিরূপে? বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যবৈরাগ্য বা বাহ্য ভক্তির সহিত যাগ যজ্ঞ পূজাদি করিলে তাহা হইতে কি

কখনও শান্তি লাভ হইতে পারে? এক আত্মকর্ম্মের অভাবে সব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আত্মকর্ম্মই একমাত্র পরাবিদ্যা, তদ্ব্যতীত সবই অবিদ্যা। বালককাল হইতে গুরূপদেশানুযায়ী এই আত্মকর্ম্মরূপ পরাবিদ্যা অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই যে সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করা যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ মোহবশতঃ গুরূপদেশমত ঠিক চলিতে না পারেন, তাহা হইলে ইহজন্মে তাঁহার সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা লাভ হয় না বটে, কিন্তু তিনি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক বলে শ্রেষ্ঠ হইয়া ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরে দেহত্যাগ হইলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের দ্বারা সুকৃতিশালী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাভ্যস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অতএব ধর্ম্মকর্ম্ম বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে যদি কোন দৈবকারণে বাল্যকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কোন কালে হউক, শ্রবণ মাত্রেই, আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া জীবের কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় আর কালাকাল দেখা উচিত নহে। গুরূপদেশে আত্মকর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই, গুরূপদেশমত কার্য্য করা উচিত। আত্মকর্ম্ম করিতে হইলে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহরত্নাদি কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় না। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রত্ন ইহারা বন্ধের কারণ নহে—আসক্তিই বন্ধনের হেতু। ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিলে আসক্তির নাশ হয় না, বরং অন্তরে আরও অশান্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইচ্ছা বা জোরের সহিত, অথবা লোকলজ্জাভয়ে বা পুত্রকলত্রনাশে যে কর্ম্ম-

ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ—প্রকৃত ত্যাগ নহে। আর যে সকল বিষয় আমার নাই বা জুটে না অথবা যাহা বহু কষ্টেও আমার সংগ্রহ করা কঠিন এরূপ বিষয়ের যে ত্যাগ তাহাও তামসিক। এইরূপ ত্যাগে না ইহকালে না পরকালে, কোন কালেই সুখ নাই—চতুর্দ্দিকেই অশান্তি। যাহার দ্বারা আসক্তির নাশ হয় তাহা করা হয় নাই, ভ্রমবশতঃ অজ্ঞানীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, শত্রুবোধে যাহারা মিত্র তাহাদিগকে জোর করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে, এবং যাহারা প্রকৃত শত্রু তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই কেবল লোকদেখান বৈরাগ্যের এবং ভক্তির চিহ্ন আছে মাত্র। ইহাতে দেশের এবং নিজের অমঙ্গল ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে আত্মকর্ম্মই একমাত্র সাত্বিক কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকায় সাত্বিক কর্ত্তার অভাবহেতু সাত্ত্বিক ত্যাগও দৃষ্টিগোচর হয় না। সাত্বিক কর্ত্তার বহুরূপীর ন্যায় সাজগোজের আবশ্যক নাই। তাঁহারা বহুরূপীর দলে আসিলেইবা তাঁহাদের কথা শুনে কে? সুতরাং তাঁহারা যিনি যেখানে আছেন সেই স্থানেই থাকেন, কাহাকেও ডাকিতে যান না, কেহ তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহারা তাহাকে অগ্রাহ্যও করেন না। এইরূপ সাত্বিক কর্ত্তার উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কালে দেশ কর্ম্মশূন্য ত্যাগীতে ভরিয়া যাইবে। অতএব পূজা যাগ যজ্ঞাদির যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান আছে, সে সকল যাহাতে রাজসিক বা তামসিক ভাবে পরিণত না হয় তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সে গুলি সাত্বিক

ভাবে পরিণত করিতে হইলে, অগ্রে গুরূপদেশে সাত্ত্বিক কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, নচেৎ ঐ গুলি রাজসিক বা তামসিক ভাবে পরিণত হইবে। চিরকালই যদি রাজসিক ও তামসিক ভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাতেই পড়িয়া থাকা যায়, তাহা হইলে আর কি হইল? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই মোহবশতঃ মন্ত্রহীন রাজসিক ও তামসিক পূজাদিতে মাতিয়া থাকেন, তাহার উদ্ধারের চেষ্টাও করেন না। ব্রাহ্মণপুত্রগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য-প্রায় হওয়ায় মন্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে। কাহারও তাহাতে লক্ষ্য নাই, সাত্ত্বিক ভাবের পূজাও আর দেখা যায় না এবং সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক আত্মকর্ম্মের অভাবে সব নষ্টপ্রায় হইতেছে। সাধনমার্গে প্রায় কাহারও দৃষ্টি নাই, তবে যাহা কিছু আছে তাহাও লোক দেখান মাত্র, কার্য্যতঃ কিছুই নাই। এ কথা আপনাকে বুঝাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না, কারণ আপনি ভুক্তভোগী। এই আপনাকে দেবদেবীপূজার সহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক ত্যাগ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের বিষয় সমস্ত বলিলাম ও বুঝাইলাম, এখন যদি আপনার কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকে, তাহা হইলে আপনি আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

রাজা বলিলেন—নাথ! যাহা আপনি বলিলেন, আমার বিবেচনায় তাহা যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন নাই। তবে আপনি যে বলিলেন যে এই

আত্মকর্ম্মের অভ্যাসীদের পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই ছাড়িতে হয় না তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নাথ! গুরুপুত্র কেন পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে প্রকারান্তরে একরকম পরিত্যাগ করিয়া পাগলবেশে রহিয়াছেন? ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরুদেব বলিলেন—আপনার গুরুপুত্র গোপাল যে পাগলবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, গোপালের পিতা গোপালের প্রতি পীড়ন করায়, তিনি অনিচ্ছায় সহিত পাগলের বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রাদি পাঠ করাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়ন করিতেন এবং ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার মিথ্যা আড়ম্বরের শিক্ষা দিতেন। এইগুলি সাধন মার্গের অনুপযোগী। আরও এক কারণ এই যে, গোপাল সাধন ভজন করিয়া থাকেন, এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিলে, পিতার নিকট হইতে তাঁহার অনেক বিঘ্ন বাধা হইবার সম্ভাবনা। এই সকল নানা আশঙ্কায় গোপালকে পাগলের বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে গোপালের পিতা গোপালের পরিচয় পাইয়াছেন এবং নিজেও সাধন মার্গ অবলম্বন করিতেছেন, এখন পিতামাতার নিকট হইতে গোপালের আর কোন বাধা পাইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং এখন আর তাঁহার পাগলবেশ থাকিবে না। এখন হইতে গোপাল তাঁহার বংশোচিত প্রকৃতির অনুযায়ী সাধারণ ভাবেই থাকিবেন, তাঁহাকে আর পাগলবেশে থাকিতে হইবে না। এই সকল কারণ ব্যতীত তাঁহার পাগল বেশে থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই।

রাজা শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, নাথ! আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আপনার অনুমতি পাইলেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

শুকদেব বলিলেন, আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

রাজা শুকদেবের আজ্ঞা পাইয়া বলিলেন, নাথ! যাহা যাহা আমার উপযুক্ত আপনি তৎসমস্তই আমাকে বলিয়াছেন এবং আমিও তাহাতে অপার তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু নাথ! আহার নিদ্রা ও স্ত্রী সম্বন্ধে কিরূপ নিষেধ বিধি আছে তাহা আমি অবগত নহি, দাসের প্রতি কৃপা করিয়া যদি তদ্বিষয়ের কিছু উপদেশ দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।

শুকদেব বলিলেন, আহার ও স্ত্রীসম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করা উচিত, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে যে সকল আহারকে অখাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল আহার করা উচিত নহে। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। অধিক তিক্ত, অম্ল, কষায়, কটু বা রসশূন্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করা উচিত নহে। দধি হইতে জাত যে সকল দ্রব্য তৎসমস্তই ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু দধি ভোজন করা উত্তম নহে। অল্প পরিমাণে খাইবার আবশ্যক হইলে তক্র খাইতে পারেন। লেবু ও পুরাতন পাকা তেঁতুল খাইতে পারেন। কাঁচা তেঁতুল, কামরাঙ্গা, চালতা, করমচা ও আমড়া বর্জ্জনীয়। মৎস্য মাংস না খাওয়াই ভাল, তবে যাঁহাদের পুরুষানুক্রমে মৎস্য মাংস অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের একেবারে হঠাৎ উহা পরিত্যাগ করা উচিত

নহে। আত্মকর্ম্মের দ্বারা যখন আপনা আপনি খাইবার ইচ্ছা যাইবে, তখন ঐ সকল আপনিই পরিত্যক্ত হইবে। মাংসবৃদ্ধির জন্য প্রাণিবধ করিয়া মাংসাদি ভোজন করা উচিত নহে। ঘৃত বা দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন যে সকল দ্রব্য, আহারের মধ্যে সেগুলি উৎকৃষ্ট। শাকাদি অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে। ফলমাত্রেই অধিক পরিমাণে খাওয়া ভাল নহে। অল্প পরিমাণে খাইলে মন্দ নহে। কিন্তু যে সকল ফলে অধিক বীজ থাকে, সে সকল অগ্নিপক্ক করিয়া লইলে নিতান্ত মন্দ নহে। নচেৎ সূর্য্যপক্ক হইলে অল্পমাত্র খাওয়া উচিত। বহুবীজের ফলের মধ্যে বেল ও দাড়িম্ব উৎকৃষ্ট। তরকারীর মধ্যে পাঁচ তরকারী মিলাইয়া এক তরকারী করা উত্তম নহে। যে ঋতুতে যে ফল বা শাক জন্মে তাহার প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র ভাবে অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া তরকারী প্রস্তুত করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করা উত্তম। চাউলের মধ্যে আতপ চাউল উত্তম। গোধূম হইতে জাত আটা ময়দা সুজি উত্তম। ডালের মধ্যে খেঁসারি (খঞ্জকরী) এবং মুসুরী পরিত্যাজ্য। যে সকল দ্রব্য তৈল বা রসশূন্য অথবা বাসি বা দুর্গন্ধযুক্ত সে সকল পরিত্যাগ করাই উচিত অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য হইতে তৈল বা রস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে সে সকল দ্রব্য পরিত্যাজ্য। আতপ চাউলের অন্ন, ঘৃতসৈন্ধবের পাকের নিরামিষ তরকারী কিংবা চরু সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার। আহারের পর সুমিষ্ট পায়স ও মিষ্ট দ্রব্য অল্প পরিমাণে মন্দ নহে; কিন্তু অধিক পরিমাণে আহার করা উচিত নহে। ঘৃতশূন্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করা উচিত নহে। ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃত উত্তম,

মহিষের ঘৃত মধ্যম। দুগ্ধের মধ্যেও গরুর দুগ্ধ উত্তম, মহিষের দুগ্ধ মধ্যম। আহারান্তে তাম্বুল বা হরিতকী অল্প পরিমাণে উত্তম। কিন্তু গৃহীর পক্ষে হরিতকী অল্প বা বেশী পরিমাণে নিত্য ভাল নহে। আহারান্তে ধূমপান মন্দ নহে, কিন্তু সর্ব্বদা ভাল নহে। এক্ষণে আহারের কাল ও পরিমাণ বলিব। দিবাভাগে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা উচিত নহে। এক প্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে আহারের উত্তম কাল। ইহার পরে বা পূর্ব্বে অপ্রশস্ত কাল। এই অপ্রশস্ত কালে আহার করিলে শরীর রুগ্ন হইতে পারে। রাত্রিকালে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা উচিত। এক প্রহর অতীত হইলে আহার না করাই উচিত। ইহাই আহারের প্রশস্ত কাল। এইবার আহারের পরিমাণ বলিতেছি—অপরিমিত আহার করা উচিত নহে। পরিমিতভাবে আহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এরূপ ভাবে আহার করা উচিত, যাহাতে বায়ু চলাচলের বিঘ্ন বা ব্যাঘাত না ঘটে এবং আহার করিয়া আই ঢাই করিতে না হয়। এক সের পরিমাণ দ্রব্য খাইলে যাঁহার যথেষ্ট হইতে পারে, তাঁহার কর্ত্তব্য আহারীয় দ্রব্যে এবং জলে তিন পোয়া খাওয়া। ইহাই পরিমিত আহার। উপবাস করাও উচিত নহে। আহারের পরে স্নান করা উচিত নহে, স্নান করিয়া আহার করা উচিত। স্রোতস্বতী নদীতে অবগাহনস্নান বিধেয়। যদি অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে নদী থাকে, তাহা হইলেও নদীতে যাইয়া স্নান করা উচিত। নদীর অভাব হইলে বৃহৎ তড়াগাদি বা পুষ্করিণীতে স্নান বিধেয়। যদি ইহারও অভাব হয়, তাহা হইলে কূপাদির জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া সেই জল

ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে স্নান করা উচিত। যে স্থানে নদী নাই অথচ সংক্রামক পীড়া হইতেছে, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে স্রোতস্বতী নদী ব্যতীত অন্য যে কোন জল হউক না কেন, তাহা উষ্ণ করিয়া পরে শীতল হইলে সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত। কিন্তু যে সকল স্থানে মহামারী দুর্ভিক্ষ বা সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হয়, সাধকের সে সকল স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। স্নানান্তে অন্তঃপূজাদি অন্তঃকর্ম্ম সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য চন্দনাদি অঙ্গে লেপন করা মন্দ নহে। তৎপরে যুক্তভাবে আচমন করিয়া আহার করা উচিত অর্থাৎ আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া, আমি স্বয়ং আহার করিতেছি না—আত্মানারায়ণের ভোগ দিতেছি, এরূপ ভাবে আত্মাতে মনোনিবেশ করিয়া স্নান আহার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করা উচিত। আহারান্তে পরিশ্রম করা উচিত নহে; অন্ততঃ তিন ঘণ্টা কাল পরে পরিশ্রমাদি করা উচিত। দিবা-ভাগে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে আহারান্তে তাম্বুলাদি সেবনের পর মুখ হাত পা ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঐ সকল মুছিয়া শয্যার মধ্যে যাওয়া উচিত। বিছানায় যাইয়া উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া প্রথমে তিনটী প্রাণায়াম করিবেন, পরে গুরূপদিষ্টমতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া গুরু এবং নারায়ণকে তুল্য জ্ঞানে প্রণাম পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শয়ন করিবেন। প্রথমে চিৎ হইয়া গুরূপদেশমতে দ্বাদশটী প্রাণায়াম করিয়া প্রাণায়াম শেষ হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া যখন দেখিবেন নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে, তখন বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা

যাইবেন। কিন্তু এই নিদ্রাও অধিক কাল ভাল নহে। বৃথা আমোদাদিতে রাত্রিজাগরণও নিষেধ। যাঁহাদের সাধনের প্রথমাবস্থা তাঁহাদের দুই প্রহর কাল নিদ্রা হইলেই যথেষ্ট। উষা কালে গাত্রোত্থান করা উচিত এবং গাত্রোত্থান সময়ে গুরূপদিষ্ট-মন্ত্রে গুরু এবং নারায়ণকে অভেদজ্ঞানে প্রণাম করিয়া শয্যার বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পর মুখ হাত পা ধুইয়া রাত্রি-বাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক প্রহর কাল আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। স্নানের পর পুনর্ব্বার যথাসাধ্য আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পুনরায় গোধূলি সময়ে বা তাহার পরে এক প্রহর কাল আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় এইরূপ নিয়মে আহারাদি করিয়া গুরূপদেশমত ত্রিকালীন কার্য্য করিলে রোগ শোক বিনষ্ট হইয়া সাধকের এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থা হয়। এইরূপ করিতে করিতে সাধকের নিদ্রা যখন কমিয়া যায়, তখন তিনি মধ্য রাত্রিতে এক প্রহর কাল গুরূপদেশ-মত আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তবে যদি ইহাতে কেহ অশক্ত হন, আহারাদিতে বোধ হয় কেহই অশক্ত হইবেন না। কর্ম্মে অশক্ত না হইলেও 'সময় নাই' ইত্যাদি অনেক ওজর থাকিতে পারে। যাঁহারা এই কারণে অশক্ত, তাঁহারা উষা কালে চারি দণ্ড, স্নানের পর যথাসাধ্য, এবং সায়াহ্নে চারি দণ্ড এইরূপ করিতে পারেন। যদি কেহ ইহাতেও অশক্ত হন, তাহা হইলে উষাকালে এক দণ্ড স্নানের পর যথাসাধ্য, এবং সায়াহ্নে এক দণ্ড এইরূপ অল্পমাত্র কাল করিলেও অনেক মঙ্গল। কিন্তু ইহাতে এক জন্মে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা প্রাপ্তের আশা করা দুরাশামাত্র। তবে আত্মকর্ম্ম অল্পমাত্র

অনুষ্ঠান করিলেও শারীরিক স্বচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম করিতে যে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, তাহা আপনি জানিয়াছেন; সুতরাং ইহা কেবল করিবার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। যিনি শেষোক্ত ভাবেও করিতে অশক্ত তাঁহার করিবার ইচ্ছা নাই। করিবার ইচ্ছা নাই বলাও লজ্জাকর, তাই বলিতে হয় অশক্ত, নচেৎ অশক্ত কেহই নহেন। এক্ষণে আপনাকে স্ত্রী সম্বন্ধের নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঋতু-কালীন স্ত্রীর অনুরোধে ঋতুরক্ষার্থ স্ত্রীতে গমন করা বিধেয়, নচেৎ নিজে চেষ্টা করিয়া কাম চরিতার্থ করিবার জন্য বীর্য্য-ক্ষয় করা উচিত নহে। কিংবা আবশ্যক হইলেও গমন করা উচিত, কেননা সে অবস্থায় বদ্ধ রাখিলে বীর্য্য তরল হইয়া অপরিমিত ক্ষয় হইতে পারে। তাহাতে নানা প্রকার ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। তবে যাহাতে অযথা বীর্য্যপাত না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীর প্রতি পশুভাবের আচরণ করা উচিত নহে। স্ত্রী যাহাতে কামপত্নীতে পরিণত না হইয়া ধর্ম্মপত্নী হন, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা উচিত, অর্থাৎ স্ত্রী যাহাতে সর্ব্বদা গৃহকার্য্যের সহিত আত্মকর্ম্মে লিপ্ত হন, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী না হইলেও সংসারের কোন প্রকার সুখ শান্তি লাভ করা কষ্টকর।

রাজা গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—নাথ! আমার আর কোনও জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নাই। আমি আপনার নিকট হইতে সারগর্ভ যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার অপার আনন্দই লাভ হইতেছে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমি এই আত্মকর্ম্ম

যাহা পাইলাম, তাহা হইতে যেন আমাকে ভ্রষ্ট হইতে না হয়— আমার অপর কোন প্রার্থনা নাই।

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন, আপনি এই আত্মকর্ম্ম করিয়া চলুন, উহাই আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে ও আপনাকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। আপনি অন্ধের যষ্টির ন্যায় আত্মকর্ম্মকে ধরিয়া তাহাতে মন লাগাইয়া রাখুন, তাহা হইলে আর আপনার কোন প্রার্থনা থাকিবে না, কারণ, শান্তি প্রাপ্ত হইলে আর কোন প্রার্থনা থাকে না। অতএব সন্দেহরহিত হইয়া আনন্দের সহিত আত্মকর্ম্মের অভ্যাসে লাগিয়া থাকুন। তাহা হইলেই ইচ্ছা রহিত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই— ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

রাজা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুলোচনে কর-যোড়ে গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

তদনন্তর গুরুদেব রাজ্ঞীকে ও গোপালের পিতামাতাকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ রাজাকে যেরূপ ভাবে দীক্ষা দিয়াছেন, তদ্রূপ ভাবে উপদেশ দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। সকলেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

গোপাল অশ্রুবিগলিতনেত্রে করযোড়ে গুরুদেবকে বলিলেন, নাথ! যাঁহাদিগের হইতে আমি এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত হইবার উপায়ের উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে এবং আমাকে কৃতার্থ করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী—ইঁহারাও অন্নদাতা, সুতরাং

ইঁহাদের নিকট হইতেও আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিলেন। নাথ! আজ আমার একবালে পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ এই উভয় ঋণ হইতেই মুক্ত করিলেন। নাথ! মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। একমাত্র আত্মকর্ম্মের উপদেশ দান ব্যতীত অপর কিছুতেই এই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় না। নাথ! আজ আপনি আমায় ঐ সমস্ত ঋণ হইতেই মুক্ত করিলেন। যদিও আত্মকর্ম্মের উপদেশ দান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তথাপি পিতামাতাকে উপদেশ দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা করিয়া আমায় কৃতার্থ করিলেন। নাথ! আমার বলিবার কিছুই নাই, আপনি লোকশিক্ষার জন্য আমার মুখ দিয়া যাহা বলাইলেন তাহা বলিলাম। এই বলিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুরুদেব গোপালকে বলিলেন, যাহা কিছু হইবার তাহা হইয়া গেল, তজ্জন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। আপনার কর্ম্ম আপনি করিয়া চলুন, যাহা হইবার তাহা হউক।

তাহার পর গুরুদেব রাজাকে বলিলেন, আপনাকে যেমন যেমন উপদেশ করিয়াছি, আপনি সেইমত কার্য্য করিয়া চলুন। আর যদি কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হয়, আপনার গুরুপুত্রের নিকট সব জানিতে পারিবেন। যদি আমার নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়, যাইতেও পারেন। কিন্তু যাইবার আবশ্যক নাই—যে কর্ম্ম দিলাম, যদি ঠিক উপদেশমত চলেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই সব জানিতে পারিবেন। রাজীকে ও গোপালের পিতামাতাকে বলিলেন, আপনারাও যাহা প্রাপ্ত

হইলেন, তাহা করিয়া চলুন ; যাহা জানিবার তাহা ঐ কর্ম্মের দ্বারাই জানিতে পারিবেন। অধিকন্তু গোপালের নিকট হইতেও জানিতে পারেন। গোপালের স্ত্রীকে বলিলেন, মা! আপনি পতির সহিত যেরূপ ভাবে আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করিতেছেন, তদ্রূপ ভাবেই করিয়া চলুন। তাহাতে যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে।

গুরুদেব এই সকল কথা বলিয়া সকলকে বলিলেন, তবে এক্ষণে আমি চলিলাম এবং এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই গুরুদেবের শরীর অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া গোপালব্যতীত সকলেই ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে আর কথা নাই, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের বিচ্ছেদে সকলেই যেন অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু গোপাল কিছুমাত্র কাতর হন নাই, তাঁহার বরং আনন্দের বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কেননা, তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন, যে গুরুদেবের বিচ্ছেদে ইহঁাদের যে কাতরতা হইয়াছে, গুরুদেবের প্রতি প্রেম বা নিশ্চয় ভালবাসা না জন্মিলে তাহা কখনই হয় না। সাধকের গুরুর প্রতি প্রেম বা ভালবাসা নিতান্ত আবশ্যক। যে সাধকের গুরুর প্রতি অন্তরের সহিত প্রেম বা ভালবাসা জন্মে এবং যিনি তাঁহার অদর্শনে বিচ্ছেদযন্ত্রণাও অনুভব করেন, তাঁহার শান্তির পথ অতি নিকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গোপালও তাই গুরুদেবের অদর্শনেই ইহাদের বিচ্ছেদযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে

দেখিয়া, ইহা ভাবী মঙ্গলজনক বুঝিয়া আনন্দমনে বলিলেন, আপনারা যাঁহার অদর্শন বোধ করিয়া কাতর হইতেছেন, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, কারণ, তিনি মুক্তাত্মা। যাঁহার জ্ঞানরূপ চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনিই ইহা অবগত আছেন, অপরে নহেন। গুরুদেব আপনাদেরও উক্ত জ্ঞানরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন আপনারা আত্মকর্ম্মের দ্বারা সেই জ্ঞানরূপ চক্ষুর উন্মীলিত অবস্থাকে স্থায়ী করুন। অর্থাৎ চক্ষুস্বরূপ যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়াছেন এবং যে আত্মকর্ম্ম পাইয়াছেন, তাহাকে জড় না ভাবিয়া সেই আত্মকর্ম্মে তন্ময় হইলেই তাহার অতীত অবস্থা আসিবে। সেই অতীত অবস্থা স্থায়ী হইলেই জ্ঞানরূপ চক্ষুর উন্মীলিত অবস্থা স্থায়ী হইবে। তখনই অন্ধ মন চক্ষুষ্মান হইবে--নচেৎ নহে—এবং তখনই বুঝিতে পারিবেন যে গুরুদেব সর্ব্বত্রই আছেন। অতএব "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন" এই মহাবাক্যকে দৃঢ় করিয়া গুরুবাক্যমত কর্ম্ম করিয়া চলুন। তাহা হইলে অচিরেই চক্ষুষ্মান অবস্থা লাভ হইবে। এ অবস্থায় দেখিবার কিছু থাকে না, জানিবারও কিছু থাকে না। অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা হয়। এই অবস্থাই পরম শান্তির অবস্থা এবং ইহা দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়। অতএব আলস্য বা সন্দেহ না করিয়া "আপনার" কর্ম্ম করিয়া চলুন। আলস্য ও সন্দেহ এই দুইটী সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের পরম শত্রু। ভাগ্যবলে সাধনের প্রথম অবস্থায় যাঁহাদের এই দুই পরম শত্রু না থাকে, তাঁহারা অচিরে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া চলুন।

রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন, নাথ! আপনার কৃপায় আমার এই অমূল্যরত্ন আত্মকর্ম এবং শিবদর্শন উভয়ই লাভ হইল, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি।

গুরুপুত্র রাজাকে বলিলেন, কর্ম্ম করিয়া গেলে কেননা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? অচিরেই গুরুকৃপায় শান্তির অবস্থা যাহা পাইয়াছেন তাহা স্থায়ী হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার পর রাজা নিজ গুরুদেবকে বলিলেন, নাথ! আমি আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি—আমার জন্য আপনাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। অন্তরে না থাকিলেও আমি মুখে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমি আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি। নাথ! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন—এই কথা বলিয়া রাজা গুরুদেবের চরণে পড়িয়া রহিলেন।

গুরুদেব রাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি কোন বিষয়ে আমার নিকট অপরাধী নহেন, বরং আমিই আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি। গুরুর যাহা কার্য্য তাহা আমি নিজে জানিতাম না অথচ লোভের বশীভূত হইয়া আমি আপনার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সব কাজ জানি বলিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতাম। হা ধিক্! ইহাই কি গুরুর কার্য্য!! মহারাজ! আপনি আমাকে ওসব কথা আর বলিবেন না। আপনি আমার নিকট কোনও বিষয়েই অপরাধী নহেন। মহারাজ! আপনার কৃপায় আজ আমি

যাহা প্রাপ্ত হইলাম ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে আমি আপনার গুরু নহি, আপনিই আমার গুরুতুল্য। মহারাজ! আপনি যদি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা না করিতেন তাহা হইলে ত আমি ভববন্ধন ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায় এই যোগরত্ন লাভ করিতে পারিতাম না। মহারাজ! আপনি দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্র গোপালও প্রকাশিত হইল এবং তাহা না করিলে বোধ হয় গোপালও প্রকাশিত হইত না। সুতরাং আমাদেরও নরকভোগ যাইত না। মহারাজ! আপনারই কল্যাণে আমার ও ব্রাহ্মণীর ভবসাগরের তরণীরূপ এই অপূর্ব্ব যোগকৌশল লাভ হইল। অতএব আপনিই ধন্য!! গুরুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইলেন।

রাজা গুরুদেবের কোল হইতে উঠিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া রাজ্ঞীর সহিত গুরুপত্নীকে ও গুরুর পুত্রবধূকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি গুরুদেবের ও গুরুপুত্রের আজ্ঞা লইয়া রাজ্ঞীকে অগ্রে শিবিকারোহণ করাইয়া রাজবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে নিজের যাইবার জন্য অপর এক খানি শিবিকা আনয়ন করাইলেন এবং গুরুদেবকে ও গুরু-পুত্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উভয়ের অনুমতি লইয়া রাজবাটী গমন করিলেন।

এদিকে গোপালের পিতামাতা দিন দিন কর্ম্মের উন্নতি করিয়া বেশ শান্তি পাইতে লাগিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই গুরুপুত্রের উপদেশমত আত্মকর্ম্মের দ্বারা অপার শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের অবস্থা লাভ করিলেন। গোপালের

আর এখন পাগল বেশ নাই। তিনি শুকদেবের আগমন কাল হইতে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজের উন্নতির সহিত দেশেরও উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিলে দেশের ও নিজের উন্নতি কিছুতেই হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইলে সাত্বিক ভাবাপন্ন কর্ম্মীর উপদেশমত চলা উচিত। নচেৎ রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন কর্ম্মীর নিকট শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদেরও তাহাই ঘটিয়াছে। কেননা, যাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দীক্ষাদি দিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন, সুতরাং আমাদেরও গতি রজস্তমোগুণে হইতেছে। তাঁহাদের নিকট হইতে বেদপুরাণাদি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়া থাকি তাহার কিছুতেই মনের তৃপ্তি হইতেছে না। তৃপ্তি হইবে কোথা হইতে? পরিক্ষীৎ শুকদেবের নিকট হইতে পুরাণ শ্রবণ করিলেন, এবং শুকদেব তাঁহাকে প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়া ভগবান্ আত্মানারায়ণের রূপ দর্শন করাইয়া দিলেন। কিন্তু আজকালের পুরাণপাঠ ও পুরাণশ্রবণ অন্যরূপ। আমি পুরাণ শ্রবণ করিলাম এবং তাহাতে চারি পাঁচ হাজার টাকাও খরচ করিলাম অথচ গল্পের মতন বাহ্যবিষয় শ্রবণ করিলাম মাত্র। আবার যিনি পুরাণ শ্রবণ করাইলেন তিনি একবার মুখেও আনিলেন না যে প্রাণায়াম যোগাভ্যাসে রত না হইলে আমার পুরাণ শ্রবণ করা না করা দুইই তুল্য। একথা যদি আমি শুনিতাম তাহা হইলেও না হয় জানিতাম যে পুরাণ কেবলমাত্র শ্রবণ করিলে আমার কিছুই হইবে না। জানিলে

প্রকৃত কার্য্যের চেষ্টাও করিতে পারিতাম। এখন কেবল কথার ছড়াছড়ি ও গানের ছড়াছড়ি!! ঐ সকলে শান্তি কোথায়? ঐ সকলে যদি শান্তি হয় তাহা হইলে যাত্রা শুনিলে শান্তি না হয় কেন? সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সংযমী ব্যক্তি ব্যতীত অপরের নিকট বেদপুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া শান্তি পাইতে গেলে যাত্রা শ্রবণের ন্যায় কেবল সং দেখা ও গান শুনা হইবে মাত্র, শান্তিলাভ হইবে না। শান্তিলাভ করিতে হইলে পরিক্ষীতের ন্যায় আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা না করিলে কেবল বাহ্যভাবে বা বাহ্যজ্ঞানভক্তিতে কিছুই শান্তি লাভ হইবে না। আত্মকর্ম্ম প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত কিছুতে কথনও কাহারও শান্তিলাভ হয় নাই এবং কখনও হইবেও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই আত্মকর্ম্ম দেশে লুপ্ত-প্রায়। উহার অভাবে দেশে কাহারও শান্তি নাই। দেশের সর্ব্বত্রই অশান্তিরূপ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ—না আছে কাহারও শারীরিক বল, না আছে কাহারও মনের বল এবং না আছে শারীরিক সুস্থতা। সকলেই প্রায় একটা না একটা ব্যাধিতে আক্রান্ত। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাহারও প্রায় সর্ব্বদা আনন্দবদন দেখা যায় না। অন্তরে যেন কত অভাব, কত জ্বালা বিরাজ করিতেছে। অন্তরের ভাব মুখে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বদন করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরে শত্রুতা। সহোদর ভ্রাতায় সহোদর ভ্রাতায় পরস্পরে মিল নাই। স্ত্রীপুরুষে, পিতাপুত্রে, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠে, পরস্পর পৃথক ভাব। এক আত্ম-কর্ম্মের অভাবে সকল বিষয়েরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এই আত্মকর্ম্মের প্রভাবে যাঁহারা প্রভুশ্রেণীভুক্ত ছিলেন আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা আত্মকর্ম্মে তাচ্ছল্য করিয়া দাসেরও যোগ্য হইতেছেন না। হায়! হায়! কি শোচনীয় পরিণাম!! ধর্ম্মজীবনলাভ ব্যতীত মানবমাত্রেরই কোন বিষয়ের উন্নতি লাভ হয় না। যদিও দৈব আনুকূল্যে পার্থিব বিষয়ের উন্নতি কখন কখন দেখা যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন না হইলে তাহা রক্ষিত হয় না। এই কারণে উপস্থিত কালে পার্থিব বিষয়ও দুই এক পুরুষের বেশী স্থায়ী হইতে প্রায় দেখা যায় না। আত্মকর্ম্মের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এই আত্মধর্ম্মের অভাবে পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং পাশবিক ও আসুরিক ভাব সকল প্রবল হইয়া এক্ষণে এরূপ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এই সকলের দ্বারা মোহবশতঃ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মবোধ, কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম-বোধ, আত্মাতে অনাত্মবোধ, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যবোধ, আসুরিক ও পাশবিক ভাবকে দেবভাববোধ, জ্ঞানকে অজ্ঞান অজ্ঞানকে জ্ঞান, বিদ্যাকে অবিদ্যা অবিদ্যাকে বিদ্যা, অন্তঃকর্ম্মকে বাহ্যকর্ম্ম বাহ্যকর্ম্মকে অন্তঃকর্ম্ম-বোধ আমাদের সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার নিকট সত্য অগ্রাহ্য, ধর্ম্মও অগ্রাহ্য, আত্মাও অগ্রাহ্য, কর্ম্মও অগ্রাহ্য—প্রকৃত বিষয়মাত্রেই প্রায় অগ্রাহ্যের মধ্যে পড়িয়াছে। নিজে ত কিছু গ্রাহ্য করিব না তাহার উপর আবার যদি কেহ প্রকৃত বিষয় প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকেও নিজের দলে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহা হইতে ফিরাইয়া আনিব। এই সকল নানা কারণে আত্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সাধা-

রণের নিকট হইতে অপ্রকাশ হইতেছে। এই আত্মধর্ম্মের প্রকাশ করিতে হইলে এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও যাগ যজ্ঞ পূজাদি সাত্ত্বিক ভাবে করিতে হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আত্মকর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মের ও অপরাপর সাত্ত্বিক বিষয়ের যে সকল উপদেশ বলিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় পুরুষানুক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই চারি পুরুষের মধ্যে পূর্ব্ব গৌরব আবার প্রকাশিত হইতে পারে, নচেৎ নহে। অতএব গীতোক্ত উপদেশ সকল কণ্ঠস্থ করিয়া ঐ সকলকে কণ্ঠমালার ন্যায় কণ্ঠদেশে ধারণ করা কর্ত্তব্য। গুরূপদেশে গীতোক্ত কর্ম্ম সকলে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন এই মহাবাক্যে লক্ষ্য করিয়া গীতোক্ত আত্মযোগের সাধন করিলে এক দিন আবার নিজের ও দেশের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে—নচেৎ কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। নিশ্চয় বলিবার কারণ এই যে ব্রহ্মাদি দেবগণ*, নারদাদি ঋষিগণ, এবং সাধুগণও নিজে আত্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া সকলের করিবার জন্য শাস্ত্রে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা যদি সত্য হন এবং তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্য যদি সত্য হয় তাহা হইলে উপরে যাহা বলা হইল তাহাও নিশ্চয় এবং সত্য, কখনই মিথ্যা নহে। আর যদি আমি অহিন্দু হইয়াও বলি যে ইহা মিথ্যা তাহা হইলেও ইহা মিথ্যা নহে, কেননা শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্য ছাড়িয়া যুক্তি দ্বারা বুঝিতে গেলেও সাধনমার্গের প্রাণায়ামরূপ আত্মযোগ উপাসকশ্রেণীর

---

* ২০শ পৃষ্ঠা দেখ।

উপাসনার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখ্য উপায়। ইহা ব্যতীত যে সকল উপায় আছে তৎসমুদায়ই ভগ্ন বা জীর্ণতরীবৎ গৌণ উপায়। অহিন্দু বলিবার কারণ এই যে দেবগণের, ঋষিগণের ও সাধুগণের বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই তাঁহাকে অহিন্দু ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? প্রাণায়ামরূপ আত্মযোগ জীবমাত্রেরই মহাধর্ম্ম, কারণ প্রাণই জীবের একমাত্র জীবন—জীবের একমাত্র অবলম্বন। প্রাণের ত্যাগে যেমন দেহলীলা সম্বরণ করিতে হয় তদ্রূপ প্রাণকে ছাড়িয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে গেলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ না হইয়া চির অশান্তিসাগরে মগ্ন হইতে হয়। কারণ, প্রাণের সংযম না হইলে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কিছুতেই স্থায়ীরূপে সংযত হয় না। তবে বাহ্যিক রাজভয়ে বা লোকলজ্জাভয়ে বা যশঃ প্রত্যাশায় কিম্বা অজ্ঞানবশতঃ পুরাণ বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া লোককে বাহ্যবৈরাগ্য বা ভক্তির ভাব দেখান কঠিন নহে। কিন্তু তাহাতে নিজের অন্তরে সর্ব্বদাই অশান্তি থাকে। হায়! কি দুঃখের বিষয় যে তাহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না—সর্ব্বদাই মোহমদে আচ্ছন্ন থাকায় প্রণিধান করিয়াও বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারি না। আরও বিশেষ যাহাকে জোর করিয়া সংযত করিতে যাইতেছি আমা অপেক্ষা সে যে কোটি কোটি মত্ত হস্তির বল ধারণ করে তাহা আমার জানা নাই। এক সময়ে রতি ভীত হইয়া কামদেবকে বলিয়াছিল "নাথ! আমি শুনিয়াছি যে আমাদের বংশ লোপ করিবার জন্য আমাদের কুলে বিদ্যানাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা শুনিয়া

আমার শরীর ভয়ে ও শোকে কম্পিত হইতেছে"। তদুত্তরে কাম রতিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিল "প্রিয়ে! আমি এক শরে হরের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছিলাম কিন্তু একত্রে পঞ্চবাণ ক্ষেপণ করিলে হরিহরব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারি। অতএব তোমার চিন্তা কি"? কামের ন্যায় এরূপ প্রবল শক্তিবিশিষ্ট রিপুকুলকে ও ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক পুরাণ বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য ও লৌকিক রাজসিক বা তামসিক ভক্তির দ্বারা জয় করিতে যাওয়া কি আমার দুরাশা নহে? ইহাও যে আমায় আত্মকর্ম্ম হইতে বিরত করাইবার সেই কামের এক প্রকার অস্ত্র তাহা আমার জানা নাই!! কাম ধর্ম্মের ভাণে জীবকে স্বর্গাদির কামনায় আসক্ত করাইয়া প্রকারান্তরে রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে আত্মযোগের ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন বলিয়াছেন। সাধারণতঃ জীবমাত্রেরই মনে একটু আধটু ভক্তি প্রায় দেখা যায়। এমন কি ডাকাইতেরাও সময়ে সময়ে ভক্তিপূর্ব্বক পূজাদি করিয়া ডাকাইতি করিতে যায়। ইহাও ত ভক্তি। এরূপ ভক্তির দ্বারা কি আমার শান্তিলাভ হইবে? ভয়ে শোকে বা অভাবে কিম্বা পুত্রকন্যাদি আত্মীয় স্বজনের নিধন-হেতু অথবা কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের অপ্রাপ্তিজন্য যে সকল বৈরাগ্যের উদয় হয় সে সকল জীবভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা যদি ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি হইত তাহা হইলে আর সাধনের আবশ্যক কি? সাধনের দ্বারা প্রাণের সংযত অবস্থা না আসিলে ইচ্ছা রহিত অবস্থা আইসে না এবং ইচ্ছা রহিত অবস্থা না আসিলেও প্রকৃত

আন্তিক বৈরাগ্য বা ভক্তি কিছুতেই হইতে পারে না। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তি বা বৈরাগ্যে যদি ভগবৎপ্রাপ্তি হইত তাহা হইলে সংসার এতদিনে জীবভাবশূন্য হইয়া যাইত। কই এখনও ত তাহা হয় নাই—জীবভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। জীবের মুখেও শুনা যায় "আরে মহাশয় সবই অনিত্য, এক দিন সকলকেই যাইতে হইবে, এসব যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহা কিছুই নহে, তিনিই একমাত্র সত্য"। এইরূপ ত অনেকেরই মুখে শুনা যায়, কিন্তু কাহারও কি শান্তি আছে? কথায় শান্তি নাই। আমি ভ্রান্ত বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখে সব বলিয়া থাকি, কিন্তু শাস্ত্রাদি পাঠজনিত যে জ্ঞান ভক্তি বা বৈরাগ্যের উদয় হয় সে গুলি আত্মকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবার কামের যে এক প্রকার অস্ত্র তাহা আমি জানি না। কাম যে এইরূপ শুষ্ক জ্ঞান ভক্তি বা বৈরাগ্যের দ্বারা আমায় ভুলাইয়া সাধনমার্গে যাইতে দিতেছে না, কামের বাণে মোহিত হইয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রেও এই গুলিকে আত্মযোগের অভ্যাসিগণের জ্ঞানরূপ যোগবিঘ্ন বলিয়াছেন। এই জন্যই সাধক গুরূপদেশমত আত্মকর্ম্মে রত হইয়া ঐরূপ শুষ্ক ভক্তি বৈরাগ্য বা জ্ঞানের চর্চ্চায় রত হন না। কারণ, ঐগুলি বিঘ্নস্বরূপ। আত্মকর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ হইবে এবং আত্মকর্ম্ম ব্যতীত যাহা কিছুতেই লাভ হইবার নহে তাহা লইয়া বুদ্ধিমান লোকে কেবল কথার আলোচনায় বা তর্কে কেন সময় নষ্ট করিবেন? তাঁহারা তাহা করেন না, আত্মকর্ম্মেই রত হন। অতএব কথার ছড়াছড়ি না করিয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস

পূর্ব্বক গীতোক্ত কর্ম্মে নির্ভর করিয়া যাওয়া আমাদেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা ভগবান আত্মানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া অপার-শান্তিলাভ করিতে পারিব। তিনিই যে ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এই খানেই পাঠক ও পাঠিকাগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভগবান আত্মানারায়ণকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিলাম। অলমতিবিস্তরেণ।

পরিশিষ্ট।

সাধকের ও সাধারণের কর্ত্তব্য।

১। আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মে প্রাণ উৎসর্গ করা।

২। হিন্দুকুলে জন্মিয়া হিন্দুধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করা।

৩। আত্মবিদ্যালাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা।

৪। সদ্‌গুরুলাভের চেষ্টা করা।

৫। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য বিশ্বাস করা।

৬। সদাচারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া।

৭। পরধর্ম্মে বিরত থাকা।

৮। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলা।

৯। শাস্ত্রীয় কার্য্যের দ্বারা নিজের উন্নতি সাধনে যত্ন-বান্ হওয়া।

১০। আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা।

১১। আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা।

১২। নিত্যানিত্য বিচার করা।

১৩। দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করা।

১৪। যাহাতে পুনরায় মানব দেহ পাও এমন কার্য্য করা।

১৫। অহঙ্কার ত্যাগ করা।

১৬। পুণ্যকর্ম্ম শীঘ্র করা।

১৭। পাপকর্ম্ম কদাচ না করা।

১৮। সর্ব্বদা আপনাকে অনু হইতেও অণু মনে করা।

১৯। কাহাকেও আপন অপেক্ষা ছোট জ্ঞান না করা

২০। দেহের পরিণাম চিন্তা করা।

২১। কোন দেবদেবীকে উপহাস না করা।

২২। আচার্য্য, সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি ভক্তি করা।

২৩। গুরু বা ভগবানে "আমি" "আমার" বিষয় অর্পণ করা।

২৪। ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা না করা।

২৫। নিত্য গুরূপদিষ্ট মতে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা।

২৬। যে সকল বৃক্ষের পূজা হয় সে সকল বৃক্ষ, দেব-মন্দিরের ধ্বজা, মন্দির, গুরু, এবং পূজ্য ব্যক্তির ছায়া লঙ্ঘন না করা।

২৭। কাহারও মনে অযথা ক্লেশ না দেওয়া।

২৮। কাহারও অপমান না করা।

২৯। কাহারও নিন্দা না করা।

৩০। উচ্চহাস্যপরিহাসাদি না করা।

৩১। জীবের উপর ক্রোধ না করিয়া ক্রোধের উপর ক্রোধ করা।

৩২। ক্রোধিত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধিত না হওয়া।

৩৩। ক্রোধের উদয় হইলে, আপনাকে আপনি অণু মনে করা।

৩৪। ছয় রিপু দমন করিবার চেষ্টা করা।

৩৫। সর্ব্বদা কাম রিপুকে জয় করিবার চেষ্টা করা।

৩৬। কামের বা কামনার উদয় হইলে গুরু, আত্মা, নারায়ণ, ভগবান্‌কে স্মরণ করা।

৩৭। কোন প্রাণীর হিংসা না করা।

৩৮। কোন প্রাণীকে নিজের আমোদের জন্য ক্লেশ না দেওয়া।

৩৯। মানবগণের প্রতি বন্ধুভাব স্থাপনের চেষ্টা করা।

৪০। কোন জাতিবিশেষকে অন্তরে ঘৃণা না করা।

৪১। নীচ জাতির পীড়ন না করা।

৪২। নীচ জাতির সহবাস না করা।

৪৩। নীচ জাতিকে সদুপদেশ দেওয়া।

৪৪। সত্য বাক্য বলা।

৪৫। প্রিয়বাক্য বলা।

৪৬। অপ্রিয় বাক্য না বলা।

৪৭। সদা আপনাতে আপনি থাকিয়া মৌনী হওয়া।

৪৮। বৃথা বাক্য অধিক না বলা।

৪৯। কাহারও সহিত বিতণ্ডা না করা।

৫০। কাহারও সহিত ঝগড়া না করা।

৫১। না জানিয়া তর্ক না করা।

৫২। নিজের কৃত পাপ গোপন না করিয়া গুরুর নিকট প্রকাশ করা।

৫৩। গুরুর নিকট লজ্জা না করা।

৫৪। গুরুর নিকট বসিয়া কাহারও সহিত রহস্যাদি বৃথা আলাপ না করা।

৫৫। গুরুর নিকট হইতে সম্মান প্রার্থনা না করা।

৫৬। গুরুর নিকট সর্ব্বদা নত থাকা।

৫৭। কোন বিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে না করা।

৫৮। সর্ব্বদা ভাল দেখাইবার জন্য বেশ ভূষা না করা।

৫৯। সর্ব্বদা অপরিষ্কার ভাবে না থাকা।

৬০। অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় বস্ত্রাদি ব্যবহার না করা।

৬১। দুর্গন্ধময় স্থানে বাস না করা।

৬২। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান না করা।

৬৩। স্রোতস্বতী নদীতে স্নান বা গাত্র ধৌত করা।

৬৪। তীব্র স্রোতস্বতী নদীতে অবগাহন না করা।

৬৫। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তৈল মর্দ্দন বা স্নান না করা।

৬৬। স্নানান্তে অধিক কাল ভিজা কাপড়ে না থাকা।

৬৭। স্নানান্তে মস্তকে ভিজা কাপড় না রাখা।

৬৮। শ্রান্তি দূর না করিয়া, মুখ না ধুইয়া, উলঙ্গ হইয়া স্নান না করা।

৬৯। অধিক কাল জলমগ্ন অবস্থায় না থাকা।

৭০। স্নানান্তে চন্দনাদি কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা।

৭১। পরিমিত আহার করা।

৭২। অপরিমিত আহার না করা।

৭৩। যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে এরূপ আহার করা।

৭৪। বিনা পাত্রে, অপবিত্র পাত্রে, কুৎসিত স্থানে আহার না করা।

৭৫। কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন না করা।

৭৬। আহারের অগ্রভাগ পঞ্চপ্রাণকে না দিয়া আহার না করা।

৭৭। প্রথমে জলগ্রহণ না করিয়া আহার না করা।

৭৮। আহারের সময় কথা না কহা।

৭৯। *অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজন না করা।*

৮০। মধ্যাহ্ন সময়ে আহার করা।

৮১। সন্ধ্যাকালে আহার না করা।

৮২। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে আহার করা।

৮৩। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল দ্রব্য আহার না করা।

৮৪। বাসি বা দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য আহার না করা।

৮৫। তাম্বুলাদি অধিক পরিমাণে সেবন না করা।

৮৬। তাম্বুলাদি অল্প পরিমাণে সেবন করা।

৮৭। সর্ব্বদা ধূমপান না করা।

৮৮। আবশ্যক হইলে আহারান্তে ধুমপান করা।

৮৯। কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন না করা।

৯০। মলমূত্রের বেগধারণ না করা।

৯১। মলমূত্রের দ্বার পরিষ্কার রাখা।

৯২। অগ্নিসেবন না করা।

৯৩। গৃহদাহ সময়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করা।

৯৪। রৌদ্র সেবন না করা।

৯৫। অগ্রবাত, আতপ, শিশির, ঝড়—এই সকল সেবন না করা।

৯৬। অধিক পর্য্যটন না করা।

৯৭। অতিদ্রুত না চলা।

৯৮। অধিক পরিশ্রম না করা।

৯৯। একাকী শূন্য গৃহে শয়ন না করা।

১০০। বৃক্ষমূলে শয়ন না করা।

১০১। অনাবৃত স্থানে শয়ন না করা।

১০২। উচ্চ নীচ স্থানে শয়ন না করা।

১০৩। অতি কোমল শয্যায় শয়ন না করা।

১০৪। অতি কঠিন শয্যায় শয়ন না করা।

১০৫। ভূমিতে শয়ন না করা।

১০৬। সমতল স্থানে যথাযোগ্য শয্যায় শয়ন করা।

১০৭। শয্যার মধ্যে পুষ্প বা পাতা না রাখা।

১০৮। বালিশ-হীন শয্যায় শয়ন না করা।

১০৯। বিনামা ধারণ করা।

১১০। সচ্চরিত্র ও নম্র হওয়া।

১১১। শান্ত ও ধীর হওয়া।

১১২। ক্ষমাবান্ হওয়া।

১১৩। ধার্ম্মিক হওয়া।

১১৪। সাধু হইবার চেষ্টা করা।

১১৫। পথে চলিবার সময় সম্মুখের চারি হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকায় দৃষ্টি রাখিয়া চলা।

১১৬। সকল জীবকে সমান ভাবে দেখা।

১১৭। কাহারও ভয় উৎপাদন না করা।

১১৮। ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করা।

১১৯। কাহাকেও কটু কথা না বলা।

১২০। পরের কর্কশ বাক্য সহ্য করা।

১২১। সর্ব্বদা পরের উপকার করা।

১২২। কাহারও অনিষ্ট না করা।

১২৩। পরের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করা।

১২৪। পরৈশ্বর্য্যে কাতর না হওয়া।

১২৫। পরের ধন অপহরণ করিবার চেষ্টা না করা।

১২৬। সর্ব্বদা লোভ ত্যাগ করা।

১২৭। অর্থের সদ্ব্যয় করা।

১২৮। পরস্ত্রী মাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করা।

১২৯। অপরের স্ত্রীদেহে দৃষ্টি না করা।

১৩০। স্ত্রীজাতির নিন্দা না করা।

১৩১। গোপনীয় বিষয় স্ত্রীলোকের নিকট প্রকাশ না করা।

১৩২। গুপ্তভাবে অন্য স্ত্রীর সহিত গুহ্যভাষণ না করা।

১৩৩। স্ত্রীকণ্ঠের গীত শ্রবণ না করা।

১৩৪। স্ত্রীলোকের নৃত্য দর্শন না করা।

১৩৫। স্ত্রীর রূপের বিষয় মনে মনে চিন্তা না করা।

১৩৬। স্ত্রীজাতিকে অধিক বিশ্বাস না করা।

১৩৭। পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পূজা করা।

১৩৮। বিধবা স্ত্রীগণকে মাতার স্থায় মান্য করা।

১৩৯। কাহারও সহিত শত্রুতা না করা।

১৪০। শত্রুকে শত্রুবোধ না করা।

১৪১। কাহারও দোষ না দেখা।

১৪২। সর্ব্বদা নিজের দোষানুসন্ধান করা।

১৪৩। কাহারও গোপনীয় বিষয় চেষ্টা করিয়া না জানা।

১৪৪। যিনি পাপ কার্য্য করেন তাঁহার সঙ্গ না করা।

১৪৫। জীর্ণ যানে আরোহণ না করা।

১৪৬। পর্ব্বতের মস্তকদেশে বিষম স্থানে ভ্রমণ না করা।

১৪৭। বৃক্ষারোহণ না করা।

১৪৮। জলাশয়তীরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবেশন না করা।

১৪৯। অনংবত ভাবে হাই হাঁচি হাস্য প্রভৃতি না করা।

১৫০। শব্দবান্ বায়ু নিঃসারণ না করা।

১৫১। নখের দ্বারা নাসিকা না খোঁটা।

১৫২। দাঁতের দ্বারা নখ না কামড়ান।

১৫৩। দাঁত কিড়মিড় না করা।

১৫৪। নখের দ্বারা নখ না বাজান।

১৫৫। নখের দ্বারা ভূমি-খনন না করা।

১৫৬। উরু কম্পন না করা।

১৫৭। চুলের অগ্রভাগ না টানা।

১৫৮। অপবিত্র ও অমঙ্গল বস্তু সর্ব্বদা দর্শন না করা।

১৫৯। বন অটবী প্রভৃতি স্থানে গমন না করা।

১৬০। পাপাসিক্ত, স্ত্রীমিত্র, ভৃত্য ইহাদের ভজনা না করা।

১৬১। উত্তমের সহিত বিরোধ না করা।

১৬২। নীচের উপাসনা না করা।

১৬৩। নিজে সরল হইবার চেষ্টা করা।

১৬৪। কপটতা ত্যাগ করা।

১৬৫। কাহারও সহিত কপট বা কুটিল ব্যবহার না করা।

১৬৬। অমান্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করা।

১৬৭। ভণ্ডবেশধারী লোভী সাধুর আশ্রয় গ্রহণ না করা।

১৬৮। অতি নিদ্রা না যাওয়া।

১৬৯। অতি জাগরণ না করা।

১৭০। দীর্ঘজাঘু হইয়া দীর্ঘকাল না থাকা।

১৭১। সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন না করা।

১৭২। দংষ্ট্রী বা শৃঙ্গধারীর নিকট গমন বা তাহাদের অনুগমন না করা।

১৭৩। জলে বা অগ্নির উপরে প্রস্রাব ত্যাগ না করা।

১৭৪। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা।

১৭৫। প্রাতঃকালে নিদ্রা বা স্ত্রীসম্ভোগ না করা।

১৭৬। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা বা স্ত্রীসম্ভোগ না করা।

১৭৭। কোন কর্ম্মকে অগ্রাহ্য না করা।

১৭৮। দীর্ঘসূত্রতা না করা।

১৭৯। কর্ম্মে আলস্য না করা।

১৮০। কর্ম্ম থাকিতে কুড়েমি না করা।

১৮১। কর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত বাজে বা বৃথা আমোদের কথায় সময় নষ্ট না করা।

১৮২। সময়কে বেশী মূল্যবান্ মনে করা।

১৮৩। সর্ব্বদা সময়ের উপর লক্ষ্য করা।

১৮৪। বৃথা সময় নষ্ট না হয় তাহার চেষ্টা করা।

১৮৫। জীবনের মধ্যে কি কি সৎ বা অসৎ কার্য্য করিয়াছি তাহার বিচার করা।

১৮৬। মনের গতির উপর লক্ষ্য করা।

১৮৭। কিছুতেই মুগ্ধ না হওয়া।

১৮৮। সর্ব্বদা মনকে কুকার্য্য হইতে ফিরাইয়া আনিয়া

আত্মকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য গুরূপদেশ মত চেষ্টা করা।

১৮৯। সাংসারিক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ না করিয়া আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম করা।

১৯০। কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করা।

১৯১। মনের বেগ ধারণ করা।

১৯২। যে কার্য্যে মনে সর্ব্বদা অক্ষয় সুখ ও আনন্দ থাকে তাহাই করা।

১৯৩। মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখা।

১৯৪। মনে আসক্তির সহিত বিষয় চিন্তা না করা।

১৯৫। মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে না যাইতে দিয়া আত্মাতে রাখিবার চেষ্টা করা।

১৯৬। অতিথির পূজা করা।

১৯৭। অতিথিকে গৃহাভ্যন্তরে শয়নের স্থান না দিয়া বাটীর বহির্ভাগে কোন গৃহে শয়নের স্থান দেওয়া।

১৯৮। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে স্থান না দেওয়া।

১৯৯। বৃক্ষের ন্যায় সহগুণের অভ্যাস করা।

২০০। যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা।

২০১। অসৎ বিষয়ের আশা না করা।

২০২। সৎ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ের আশা করা।

২০৩। অনাবশ্যক বিষয়ের ইচ্ছা না করা।

২০৪। প্রতিগ্রহ না করা।

২০৫। ভিক্ষা না করা।

২০৬। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অর্থাদি দান করা।

২০৭। প্রকাশ্য ভাবে অহংকারের সহিত দান না করা।

২০৮। গুপ্তভাবে অর্থাদি দান করা।

২০৯। যশঃপ্রত্যাশায় দান না করা।

২১০। সম্মান প্রাপ্তির জন্য দান না করা।

২১১। যে কয় দিন আয়ু আছে সৎকার্য্যে রত থাকা।

২১২। নিজের এবং পরিবারবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করা।

২১৩। দেশের উপকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অর্থের সদ্ব্যয় করা।

২১৪। দেশীয় লোকের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা।

২১৫। প্রতিবাসীর সহিত বিরোধ না করা।

২১৬। খলের সহবাস না করা।

২১৭। অধার্ম্মিকের ও রাজশত্রুর সঙ্গ না করা।

২১৮। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহত্যাকারী এবং নীচ কুলোদ্ভব বা দুষ্টব্যক্তির সহবাস না করা।

২১৯। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করা।

২২০। সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গ না করা।

২২১। জীবের প্রতি দয়া করা।

২২২। জীবকে সদুপদেশ দান করা।

২২৩। পিতা মাতাকে ভক্তি করা।

২২৪। পিতা মাতার ছায়া উল্লঙ্ঘন না করা।

২২৫। পিতা মাতার আদেশ পালন করা।

২২৬। পিতা মাতার বাক্যের উপর বিতণ্ডা না করা।

২২৭। পিতা মাতার সেবা করা।

২২৮। পিতা মাতার নিকট মনোভাব [illegible]পন না করিয়া উহা প্রকাশ করা।

২২৯। প্রাতে উঠিয়া পিতা মাতাকে দেবতার ন্যায় প্রণাম করা।

২৩০। পুত্র কন্যা বিক্রয় না করা।

২৩১। পুত্রকন্যার বিবাহে অর্থগ্রহণ না করা।

২৩২। পুত্রকন্যাকে সদুপদেশ প্রদান করা।

২৩৩। পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা।

২৩৪। পুত্রের প্রতি স্বার্থ না রাখা।

২৩৫। পুত্রের প্রতি আসক্তি রহিত হইয়া তাহার মঙ্গল-চেষ্টা করা।

২৩৬। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করা।

২৩৭। পুত্র ধর্ম্মকর্ম্মে রত হইলে তাহাতে বাধা না দেওয়া।

২৩৮। পুত্র যাহাতে আত্মকর্ম্মে রত হয় তাহার চেষ্টা করা।

২৩৯। পুত্রকে অশ্লীল কটু কাটব্য প্রয়োগ না করা।

২৪০। পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা না বলা এবং ক্রীড়াদি না করা।

২৪১। পুত্র গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাহার [illegible] দেওয়া।

২৪২। [illegible] কন্যা দান করা অর্থাৎ সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কন্যা দান করা।

২৪৩। বিধবা কন্যাকে আত্মকর্ম্মে নিযুক্ত করা।

২৪৪। বিধবা কন্যাকে দাসীর ন্যায় মনে না করা।

২৪৫। দাস দাসীকে কটু কথা না বলা।

২৪৬। কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকে স্নেহ করা।

২৪৭। পরান্ন ভোজন না করা।

২৪৮। রাজার প্রতি ভক্তি করা।

২৪৯। রাজাজ্ঞা পালন করা।

২৫০। রাজার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলা।

২৫১। রাজার গুপ্তবিষয় জানিলেও প্রকাশ না করা।

উপদেশমালা।

১। ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিলেই সদ্‌গুরুলাভ হয়।

২। গুরুসেবা পরম ধর্ম্ম।

৩। ধর্ম্মই প্রকৃত বন্ধু।

৪। জীবহিংসা মহাপাপ।

৫। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

৬। হিংসকের সকলেই হিংসা করে।

৭। হিংসা না থাকিলে কোন প্রাণীই তোমার হিংসা করিবে না।

৮। সাধন ব্যতীত হিংসাবৃত্তি একেবারে যায় না।

৯। যাহাতে নিজের চিত্তশুদ্ধি হয় এমত পবিত্র এবং শুদ্ধাচারে থাকিয়া আত্মকর্ম্ম করিবে।

১০। যাঁহার অন্তরে লক্ষ্য বাহিরে দৃষ্টিমাত্র তিনিই সাধু।

১১। ঋষিরা যেরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুমিও তদ্রূপ হও।

১২। তুমি কালের অধীন, কাল তোমার অধীন নহে।

১৩। কালকে ধর, বৃথা যাইতে দিও না।

১৪। সময় গেলে ফিরে না।

১৫। উপস্থিত সময়কে ধরিলে ভবিষ্যৎ তোমার আয়ত্ত হইবে।

১৬। উপস্থিত কাল তোমার, ভবিষ্যাত কি হয় জান না।

১৭। মনের অসুখে শরীরক্ষয় ও আয়ুঃক্ষয় হয়।

১৮। মনে সুখ না থাকিলে বাহিরের কিছুই ভাল লাগে না।

১৯। জন্ম মৃত্যু জরা অপেক্ষা মহাদুঃখ আর নাই।

২০। তুমি যাকে যেমন দেখিবে সেও তোমাকে তেমনি দেখিবে।

২১। কর্ম্মের ফলাফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়।

২২। শুভ কর্ম্মের শুভ ফল, অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল।

২৩। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাই সৎকার্য্য।

২৪। চিত্তশুদ্ধি হইলে ঈশ্বরনিষ্ঠা হয়।

২৫। চিত্তশুদ্ধি হইলে সকল ভূতে সমান জ্ঞান হয়।

২৬। আসক্তিই বন্ধের কারণ, অনাসক্তি মুক্তির হেতু।

২৭। সাধনের দ্বারা কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ হয়।

২৮। ধার্ম্মিকের অন্তরে সুখ।

২৯। অধার্ম্মিকের বাহিরে সুখ, অন্তরে দাহ।

৩০। যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায়?

৩১। সুখ মনে, ধনে বা অন্য কিছুতে নহে।

৩২। অন্তরের সুখই প্রকৃত সুখ।

৩৩। সাধন বিনা লোভ জয় হয় না।

৩৪। লোভ পরম শত্রু।

৩৫। লোভীর শান্তি নাই।

৩৬। লোভীর ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই।

৩৭। লোভীর অকার্য্য কিছুই নাই।

৩৮। লোভান্ধ আপনাকেও হত্যা করিতে পারে।

৩৯। লোভান্ধের ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।

৪০। লোভ না থাকিলে পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান হয়।

৪১। নির্লোভের পরশ্রীকাতরতা নাই।

৪২। সন্তুষ্টের লোভও নাই ক্ষোভও নাই, সদা শান্তি।

৪৩। সন্তোষ অমূল্য ধন।

৪৪। ধার্ম্মিকের সকল অবস্থায় সন্তোষ।

৪৫। লক্ষ্যস্থির না হইলে বুদ্ধি স্থির হয় না।

৪৬। রিপুর বশে থাকিলে স্বভাব নষ্ট হয়।

৪৭। যত দিন রিপুর অধীন, তত দিন কেহই "স্বাধীন" নহে।

৪৮। সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা রিপুজয় হয় না।

৪৯। ছয় রিপুর মধ্যে কামরিপু প্রধান।

৫০। রিপু দমন হইলে মন পবিত্র ও নির্ম্মল হয়।

৫১। মহাসমুদ্রে কোন মল নাই।

৫২। মন নির্ম্মল হইলে জ্ঞানও নির্ম্মল হয়।

৫৩। যাঁহার মন বশীভূত তিনিই সুখী।

৫৪। তোমার "আমি" মরিলে ভাল হইবে।

৫৫। যখন যে অবস্থায় থাকিবে, তখন সেই অবস্থায় আনন্দে থাকিবে।

৫৬। জ্ঞানই মনুষ্যের ভূষণ।

৫৭। জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্যজন্ম সফল হয়।

৫৮। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান।

৫৯। পশুর সহিত অজ্ঞানীর ভেদ নাই।

৬০। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান।

৬১। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

৬২। আত্মজ্ঞানলাভ মানবদেহ ব্যতীত অন্যদেহে হয় না।

৬৩। কেবল আহার নিদ্রা পশুবৎ কার্য্যের জন্য মানব দেহ পাও নাই।

৬৪। ধর্ম্মজীবনের তুল্য জীবন নাই।

৬৫। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইলে জগতের পূজ্য হইবে।

৬৬। যাহা আপাততঃ চিত্তমুগ্ধকর, তাহা পরিণামে ক্লেশদায়ক।

৬৭। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনিই বীর।

৬৮। ধর্ম্মে স্বর্গলাভ হয়।

৬৯। অধর্ম্মে নরকভোগ হয়।

৭০। পাপ করিলেই ভুগিতে হয়।

৭১। পিতামাতার তুল্য বন্ধু নাই।

৭২। মনের অগোচর পাপ নাই।

৭৩। 'ভাব' না থাকিলে অভাব বোধ হয়।

৭৪। সাধুর সম্মান সর্ব্বত্র।

৭৫। দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা।

৭৬। ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই অক্ষয় সুখ হয় না।

৭৭। না মরিলে কর্ম্মত্যাগ হয় না।

৭৮। সত্ত্বগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭৯। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

৮০। ইচ্ছারহিত না হইলে ত্যাগ হয় না।

৮১। যাহার যেমন মন তাঁহার তেমনি ধন।

৮২। আপন কাজে মন দাও, ভবিষ্যতে ভাল হইবে।

৮৩। শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে ভববন্ধন থাকে না।

৮৪। ভগবান্ আমাতেও আছেন তোমাতেও আছেন।

৮৫। বিদ্যাধন চোরে অপহরণ করিতে পারে না।

৮৬। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে আপনিই কষ্ট পাইবে।

৮৭। বিদ্বান নির্ধন হইলেও সর্ব্বত্র পুজিত।

৮৮। অপব্যয় করিও না, অভাব হইবে না।

আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের গ্রন্থাবলী—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।—মূল, অন্বয়মুখে অতি সরল ব্যাখ্যা, সরল বঙ্গানুবাদ, আধ্যাত্মিক টিপ্পনী ও সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য সমেত, ৪র্থ সংস্করণ। বিলাতি কাপড়ে অতি সুন্দররূপে বাঁধা, সুপার রয়াল ৩২ পেজি ৪৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা, ডাঃ মাঃ /০ এক আনা।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা।—কিরূপ স্বাধীনতা ও শিক্ষা দিলে দেশের বালক বালিকাগণের যথার্থ উপকার হইতে পারে এই পুস্তিকায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ অর্দ্ধ আনা ডাঃ মাঃ ৵০ অর্দ্ধ আনা।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।—সটীক সানুবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। [যন্ত্রস্থ]

অষ্টাবক্র সংহিতা।—সটীক সানুবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। [যন্ত্রস্থ]

কবির।—সুপ্রসিদ্ধ কবিরপন্থী সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মুক্তাত্মা কবিরের ৫৫৪টী দোহা বঙ্গানুবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। দোহাগুলি হিন্দী ভাষায় বড় বড় বঙ্গাক্ষরে এবং তাহার নীচে বঙ্গানুবাদ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। আকার রয়াল ৮ পেজি ৩০ ফর্ম্মা। মূল্য ২৲ দুই টাকা ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

এইসকল পুস্তক কলিকাতা ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্‌ আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্‌ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।